২৫টি সেরা রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

https://boierhut.com/fb

সূ চি

কাকাবাবু বনাম মূর্তিচোর
সেই অদ্ভুত লোকটা
ডাকাতের দল আর গুরুদেব
মহাকালের লিখন
হিরে উধাও রহস্য
দুর্গের মতো সেই বাড়িটা
বটুকদাদার গল্প
জলের তলায় রাজপুরী
ভরত ডাক্তারের ঘোড়া
পার্বতীপুরের রাজকুমার
আমাদের জিপসি
মাঝরাত্তিরের ভয়
ডাকাতের পাল্লায়
রাজপুত্তুরের অসুখ
বেণী লস্করের মুন্ডু
কঠিন শাস্তি
পানিমুড়ার কবলে
ডাকাতরাও ভূতের ভয় পায়
জোড়া সাপ
বুকের ওপরে বাঘ

https://boierhut.com/fb

ভরত দাশের গন্ডার

একটা অন্যরকম দিন

বিশুর কান্ড

দীন কুটির

একটা রহস্যময় ক্রিকেট বল

https://boierhut.com/fb

২৫টি সেরা রহস্য

https://boierhut.com/fb

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু একটা রাস্তা। দু-পাশের গাছের ডালপালা ঝুঁকে ঝুঁকে আছে, হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে এগোতে হয়। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এখনও একটু আলো আছে আকাশে। আকাশের এক দিকের রং লাল আর অন্য দিকটা ধূসর। জঙ্গলের মধ্যে যেন আলোছায়ার জাফরি কাটা।

কত রকম পাখির ডাক শোনা যায় এখন। সব পাখি বাসায় ফিরছে। পাখিদের কিচির-মিচির শোনা যায়, তাদের দেখা যায় না। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক বক।

বনমালি নামের লোকটি আর সন্তু যাচ্ছে আগে আগে। বনমালির রোগা লম্বা চেহারা, ধুতির ওপর ফতুয়া পরা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে গোঁফদাড়ি নেই। চোখ দুটি সরু মতন, সে বারবার এদিক-ওদিক তাকায়। সন্তু পরে আছে প্যান্ট-শার্ট আর একটা নীল সোয়েটার। বাতাসে শীত শীত ভাব আছে। ফতুয়াপরা বনমালির কী শীত লাগে না?

কাকাবাবু পরে আছেন প্যান্টের ওপর একটা লম্বা কোট। দু-বগলে ক্রাচ নিয়ে তাঁর হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে এই জঙ্গলের মধ্যে। লতাপাতায় ক্রাচ জড়িয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

এক জায়গায় সন্তু থমকে দাঁড়িয়ে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই থোকা থোকা লাল ফুলগুলো কী ফুল?'

বনমালি সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কী জানি!'

সে ফুলের নাম জানে না, ফুল দেখার উৎসাহও তার নেই।

পেছন থেকে কাকাবাবু বললেন, 'রঙ্গন।'

তারপরই কাকাবাবু খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সন্তু, মাথা নীচু কর। বসে পড়, বসে পড়!'

সন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। কাকাবাবু কেন ওই কথা বলছেন, তাও সে বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু তাঁর হাতের ক্রাচটা তুলে খুব জোরে মারলেন একটা গাছের সরু ডালে।

তখনই বোঝা গেল, সেটা গাছের ডাল নয়। সবুজ ডালের মতনই সোজা হয়েছিল। এখন মাটিতে পড়ে কিলবিল করছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাকাবাবু তাঁর হাতের ক্রাচটা তুলে খুব জোরে মারলেন একটা গাছের সরু ডালে।

সন্তু এবার ভয় পেয়ে এক লাফে সরে গিয়ে বলল, ওরে বাপরে, সাপ! ঠিক আমার মাথার ওপরে ছিল।

বনমালি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'লাউডগা সাপ, কামড়ালে আর রক্ষা ছিল না। নির্ঘাত মৃত্যু।'

কাকাবাবু কিন্তু সাপটাকে আর মারলেন না। ক্রাচটা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন এক পাশে। আপন মনে বললেন, 'শীত শেষ হয়নি, এর মধ্যে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। খিদের জ্বালায় আর থাকতে পারেনি।'

তারপর বনমালির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লাউডগা সাপের বেশি বিষ নেই। কামড়ালে মানুষ মরবে কেন? অবশ্য অনেকে ভয়েই মরে যায়।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'সাপ কামড়ালে মানুষ মরে না?'

কাকাবাবু বললেন, 'সব সাপের কি আর বিষ থাকে? বেশির ভাগ সাপের বিষ থাকে না। কিন্তু ভয় পেতে নেই। ভয় না-পেলে খুব বিষাক্ত সাপ কামড়ালেও চিকিৎসা করে বাঁচা যায়। ওহে বনমালি, আর কত দূর?'

বনমালি বলল, 'এই তো আর একটুখানি মোটে।'

কাকাবাবু বললেন, 'তখন থেকেই তো একটুখানি একটুখানি বলছ। ভালো জিনিস পাওয়া যাবে তো?'

https://boierhut.com/fb

বনমালি জোর দিয়ে বলল, 'খুব ভালো ভালো জিনিস পাবেন স্যার। আমি কী আর শুধু শুধু আপনাদের এতদূর টেনে আনছি? তবে দাম কিন্তু বেশি পড়বে।'

কাকাবাবু বললেন, 'যতই দাম পড়ুক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জিনিস পছন্দ হওয়া চাই। পছন্দ না-হলে তুমিও পয়সা পাবে না!'

আবার পথ চলা শুরু হল। এবার ঝুপ ঝুপ করে নেমে এল অন্ধকার। পাখিদের ডাক থেমে এসেছে।

কাকাবাবু পকেট থেকে টর্চ বার করে সন্তুর হাতে দিলেন। সাপটা দেখার পর সেই যে সন্তুর বুক কেঁপে উঠেছিল, এখনও থামেনি। সে টর্চের আলো ফেলে চারদিক ভালো করে দেখছে।

একটু বাদে পাতলা হয়ে এল জঙ্গল। খানিকদূরে দেখা গেল একটা আলো জ্বলছে মিটমিট করে।

আর একটু কাছে এগোতে দেখা গেল, ফাঁকা জায়গার মধ্যে রয়েছে একটা একতলা ছোটো বাড়ি।

বনমালি বলল, 'এই তো এসে গেছি।'

সন্তু বলল, 'এরকম জঙ্গলের মধ্যে শুধু একটা বাড়ি রয়েছে। আমার এরকম বাড়িতে খুব থাকতে ইচ্ছে করে।'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশিদিন ভালো লাগবে না। বড়োজোর সাতদিন। তারপরই হাঁপিয়ে উঠবি। বন্ধুদের জন্য প্রাণ ছটফট করবে!'

বাড়িটার বাইরে দরজার পাশে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন আর ভেতরে একটা ঘরে রয়েছে আর একটা জোর আলো। অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, বাড়িটা আসলে একটা মন্দিরের আড়ালে। সেই মন্দিরের চূড়া অনেকখানি ভাঙা।

বনমালি চেঁচিয়ে ডাকল, 'ভবেনদা, ও ভবেনদা!'

একটা কুকুর ভেতর থেকে ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে খুব জোরে।

দরজা খোলা। সেখানে এসে দাঁড়াল একটা বড়ো কুকুর। ডাক শুনলেই হিংস্র মনে হয়।

বনমালি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসে আবার চেঁচিয়ে বলল, 'ও ভবেনদা, কুকুর সামলাও।'

এবারে ভেতর থেকে কেউ একজন হাঁক দিল, 'কে?'

বনমালি বলল, 'ভবেনদা, আমি বনমালি গো। মালদার বনমালি নস্কর। তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে।'

ভেতর থেকে কেউ একজন 'ভোলা, ভোলা' বলে দু-বার ডাকতেই কুকুরটা থেমে গেল। তারপর বেরিয়ে এল একজন লম্বা লোক, গেরুয়া রঙের লুঙ্গি পরা, আর গায়ে একটা চাদর জড়ানো, হাতে একটা সিগারেট।

https://boierhut.com/fb

সে প্রথমে সন্তু আর কাকাবাবুকে দেখতে পায়নি। বনমালির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে, হঠাৎ এসময় এলি যে? আমার তো আজ এখানে থাকার কথা ছিল না। ভালো কিছু জিনিসের খবর এনেছিস?'

বনমালি আমতা আমতা করে বলল, 'এই একজন সাহেবকে এনেছি।'

ভবেন চমকে উঠে বলল, 'কে? কাকে এনেছিস?'

কাকাবাবু সামনে এগিয়ে এসে বললেন, 'নমস্কার। আমি সাহেব-টাহেব নই। আমি একজন বাঙালি। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আর এই আমার ভাইপো সন্তু। আমি পাথরের মূর্তি জমাতে ভালোবাসি। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে মূর্তি জোগাড় করি। শুনেছি, আপনার কাছে কিছু মূর্তি পাওয়া যেতে পারে।'

ভবেন ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, 'আমার কাছে? আমি মূর্তি কোথায় পাব? কীরে, বনমালি, তুই কী বলেছিস?'

বনমালি বলল, 'ইনি ভালো দাম দেবেন বলেছেন।'

কুকুরটা কাকাবাবুর কাছে এসে ঘুরে ঘুরে গোঁ গোঁ গর্জন করছে। কাকাবাবুর কাছে ক্রাচ থাকে বলে সব জায়গায় কুকুররা তাঁকে অপছন্দ করে।

কাকাবাবু বললেন, 'ভবেনবাবু, আপনার কুকুরটা আগে বাঁধুন, না-হলে ভালো করে কথা বলা যাবে না। এত দূর থেকে এলাম, বাড়ির মধ্যে বসতে বলবেন না?'

ভবেন বলল, 'আর তো কোনো কথা নেই। আপনারা কেন এসেছেন জানি না। আমার কাছে মূর্তিটুর্তি নেই।'

সন্তু বলল, 'আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। এক গেলাস জল পেতে পারি?'

ভবেন বলল, 'ঠিক আছে। ভেতরে আসুন। আমি ভোলাকে সরাচ্ছি। আয় ভোলা, আয়-আয়-আয়!'

ঘরের ভেতরটা বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার। একটা খাট পাতা। বসবার জন্য রয়েছে কয়েকটি মোড়া। দেওয়ালে ঝুলছে একটি বাঘের ছাল। ভবেন গেরুয়া পরে থাকলেও তার ভাবভঙ্গি মোটেই সাধুর মতো নয়।

কুকুরটাকে অন্য জায়গায় বেঁধে এসে সে সন্তুকে এক গেলাস জল এনে দিল।

সন্তু চুমুক দিতে দিতে বলল, 'সেই সাপটাকে দেখার পর থেকেই আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল।'

কাকাবাবু বলেন, 'আপনি তো বেশ নিরিবিলিতে থাকেন, ভবেনবাবু। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেকটা আসতে হয়। পায়ে হেঁটে ছাড়া এখানে আসার আর অন্য উপায় নেই, তাই না?'

ভবেন শুকনো গলায় বলল, 'আগে কাজের কথা হোক। দেখুন মশাই, আমি মূর্তি বিক্রি করি ঠিকই, কিন্তু আমার কাছে দু-শো-পাঁচ-শো টাকার কমদামি জিনিস পাবেন না। সবচেয়ে কম

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দামেরটা দশ হাজার। আরও দামি আছে, পঞ্চাশ হাজার, দু-লাখ, পাঁচ লাখ। যদি কমদামি জিনিসের খোঁজে এসে থাকেন, তাহলে আমার সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'সে কী, জিনিস দেখাবার আগেই দামের কথা? আমাদের দেখে বুঝি মনে হয় আমরা সস্তার খদ্দের? আমার একটা তেলের কল আছে, ভগবানের আশীর্বাদে টাকাপয়সার অভাব নেই। ভালো মূর্তি পেলে যত দাম লাগে দেব।'

ভবেন বলল, 'ক্যাশ টাকা এনেছেন? আমি চেকটেক নিই না।'

কাকাবাবু কোটের পকেটে থাবড়া মেরে বললেন, 'আছে, টাকাও সঙ্গে আছে। আমিও নগদ কারবারে বিশ্বাস করি।'

সন্তু আবদারের সুরে বলল, 'আমার একটা সরস্বতীর মূর্তি চাই। আর একটা গণেশ।'

ভবেন এঘর থেকে একটা হ্যাজাক বাতি নিয়ে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ঘরের পিছন দিকে একটা চাতাল। তার ওপাশে ভাঙা মন্দির। ওরা এল সেই মন্দিরের মধ্যে। ছাদটা একেবারেই ভেঙে গেছে, সেখানে গজিয়েছে বটগাছের চারা। শিবলিঙ্গটি কিন্তু অক্ষতই রয়েছে। কিছু শুকনো ফুল বেলপাতাও ছড়ানো। মনে হয় মাঝে মাঝে এখনও পুজো হয়।

ভবেন শিবলিঙ্গের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে প্রণাম করল। তারপর সেই শিবলিঙ্গ ধরে খুব জোরে ঠেলা দিতেই সেটা সরে গেল খানিকটা সেখানে দেখা গেল একটা অন্ধকার গর্ত।

সেই গর্তে হাত ঢুকিয়ে ভবেন একটা মূর্তি তুলে আনল।

কাকাবাবু সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রায় এক হাত লম্বা একটা বিষ্ণুমূর্তি কালো পাথরের তৈরি।

ভবেন বলল, 'এটার বয়েস সাড়ে পাঁচ-শো বছর। দাম পড়বে আঠারো হাজার।'

কাকাবাবু বললেন, 'বা: বা:, খুব সুন্দর। খুব চমৎকার। দেখি আর কী আছে?'

ভবেন আর একটা মূর্তি তুলল। এটা একটা গণেশ, পাথরের নয়, মনে হয় পেতলের।

ভবেন বলল, 'এটা পঞ্চ ধাতুর তৈরি বিষ্ণুপুরের গণেশ। তিন-শো বছরের পুরোনো। এটার দাম পড়বে বারো হাজার।'

সন্তু বলল, 'ওটা আমি নেব। ওটা আমার চাই!'

কাকাবাবু বললেন, 'নিবি, নিবি, আগে দরদাম ঠিক হোক। আর কী আছে দেখি?'

ভবেন এরপর আরও সাতটা মূর্তি বার করে দেখাল, বেশির ভাগই নারায়ণের, একটা রাধাকৃষ্ণর, একটা দুর্গার।

কাকাবাবু সব ক-টা খুঁটিয়ে দেখে 'বা: বা:, কী সুন্দর, কী চমৎকার' বলতে লাগলেন। সব ক-টা দেখা হয়ে গেলে বললেন, 'আর নেই? মদনমোহনের মূর্তি নেই?'

ভবেন একটা নারায়ণের মূর্তি দেখিয়ে বলল, 'এইটাই তো মদনমোহন!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাকাবাবু বললেন, 'এটা তো বিষ্ণুপুরের। কুচবিহারের মদনমোহন নেই?'

ভবেন বলল, 'আমার কাছে আর কিছু নেই।'

কাকাবাবু হতাশভাবে বললেন, 'যা:, তাহলে কী হবে? এর একটাও যে আমার পছন্দ হল না।'

ভবেন বলল, 'এতগুলো দেখালাম, একটাও পছন্দ হল না?'

কাকাবাবু দু-দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না:, একটাও না, কী করে পছন্দ হবে? গণেশের মূর্তিটা পঞ্চ ধাতুর বললেন, ওটা আসলে পেতলের। পুরোনোও নয়। নকল। পাথরের মূর্তিগুলো বড়োজোর পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরোনো। আর ওই যে বিষ্ণুমূর্তিটা, এটা একেবারে আসল আর পুরোনো, এটা বিষ্ণুপুর মন্দির থেকে চোরাই জিনিস। ওটাও আমার চাই না। কুচবিহারের মদনমোহনের মূর্তিটা পেলে যত দাম লাগে তাতেই রাজি। সেই মূর্তিটা কোথায়?'

ভবেন এবারে চোখ সরু করে কাকাবাবুর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হিংস্র গলায় বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে এসেছ? তুমি পুলিশের লোক।'

কাকাবাবু নিরীহভাবে বললেন, 'না না, আমি পুলিশের লোক নই। মদনমোহনের মূর্তিটা বার করো, তার জন্য যত টাকা চাও দেব।'

বনমালি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে চেঁচিয়ে বলল, 'ভবেনদা, আমি এখানে আসতে চাইনি! এই লোকটা আমাকে ভয় দেখিয়ে জোর করে এনেছে। বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছে করে আনিনি!'

ভবেন বলল, 'তুই ওই খোকাটাকে জাপটে ধর তো। আমি এই বুড়োটাকে ধরছি। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছে!'

বনমালি সন্তুকে দু-হাতে জড়িয়ে চেপে ধরল। কিন্তু সে সন্তুকে চেনে না। সন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসুর প্যাঁচে তাকে উলটে দিয়ে দড়াম করে ফেলে দিল মাটিতে। দেওয়ালে বনমালির মাথা ঠুকে গেল খুব জোরে। সন্তু দু-হাতের ধুলো ঝেড়ে বলল, 'একটুও গায়ের জোর নেই!'

ভবেন তার পেছনের দেওয়ালে ঝোলানো একটা মস্তবড়ো খাঁড়া তুলে নিয়ে কাকাবাবুকে বলল, 'দেব শেষ করে!'

কাকাবাবু বললেন, 'বা:, খাঁড়াটা তো বেশ পুরোনো মনে হচ্ছে। দেখি দেখি দাও তো, ওটার কত দাম পড়বে?'

ভবেন বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না। এক কোপে মুন্ডু উড়িয়ে দেব। সঙ্গে টাকাপয়সা কী আছে বার করো তো বুড়ো।'

কাকাবাবু বলেন, 'আমাকে বুড়ো বুড়ো বলবে না। আমি খোঁড়া হতে পারি, কিন্তু বুড়ো নই। তোমার থেকে আমার গায়ে জোর বেশি। খালি হাতে লড়াই করার সাহস আছে তোমার?'

ভবেন এবার খাঁড়া দিয়ে কাকাবাবুর মাথায় একটা কোপ মারতে যেতেই কাকাবাবু পকেট থেকে রিভলবারটা বার করলেন। বকুনির সুরে বললেন, 'তুমি এত বোকা কেন, ভবেন? আমাকে মারতে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আসছিলে? জানো না। মানুষ খুন করলে ফাঁসি হয়? আমার হাতে এটা কী দেখছ? খাঁড়া দিয়ে কী আর বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে লড়াই করা যায়? খাঁড়াটা নামিয়ে রেখে আমার কথা মন দিয়ে শোনো!'

ভবেন এবার ভয় পেয়ে কাঁচুমাচু করে বলল, 'পুলিশ?'

কাকাবাবু বললেন, 'না, আমি পুলিশ নই। খোঁড়া পুলিশ তুমি দেখেছ কখনো? পুলিশ কী কখনো তার ভাইপোকে নিয়ে ঘোরে? মদনমোহনের মূর্তিটা কোথায়? কুচবিহার মন্দির থেকে যেটা চুরি গেছে? বড়ো জাগ্রত দেবতা। সেটা ওই মন্দিরে আবার ফেরত দিতে হবে!'

ভবেন বলল, 'সে মূর্তি আমার কাছে নেই। সেই মূর্তি সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না!'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ চোরাই মূর্তির ব্যাবসা ফেঁদে বসেছ, অ্যাঁ? ভাঙা মন্দিরে সাধু সেজে থাকো। পুলিশ এতখানি জঙ্গলের মধ্যে সচরাচর আসে না। এলেও শিবলিঙ্গ সরিয়ে দেখবে না। শিবলিঙ্গের গায়ে হাতই দেবে না। পুলিশও তো ঠাকুর-দেবতাদের ভয় পায়। শোনো, তোমার সামনে দুটো পথ আছে। হয় তোমাকে আমি এখনই পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দেব। তুমি চোরাই মাল রাখো, আর আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে। দুটোই বড়ো অপরাধ। তবে তুমি যদি কুচবিহারের মদনমোহনের মূর্তিটা আমাকে ফেরত দাও, তাহলে তোমাকে আমি আপাতত ছেড়ে দিতে পারি।'

ভবেন আড়ষ্ট গলায় বলল, 'সে মূর্তি আমার কাছে নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'ফের মিথ্যে কথা?'

ভবেন বলল, 'আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, স্যার। মিথ্যে নয়। আমার কাছে নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'কার কাছে আছে?'

ভবেন বলল 'আমি জানি না!'

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে চলো থানায়! দশটি বছর জেলের ঘানি ঘোরাবে! ওহে বনমালি, তোমাকেও ছাড়ব না। তুমিও জেল খাটবে!'

বনমালি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আমি কিছু করিনি স্যার! আপনাদের পথ দেখিয়ে এনেছি!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুমি সন্তুকে জাপটে ধরেছিলে। আমাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা কেড়ে নেবার মতলব করেছিলে। এখন চলো—'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ভবেনের গালে এত জোরে একটা চড় মারলেন যে সে ঘুরে পড়ে গেল। কাকাবাবু বললেন, 'আমার দিকে যে অস্ত্র তোলে তাকে আমি নিজের হাতে কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। আমাকে বুড়ো বলছিলে, এখন দেখলে আমার হাতের জোর?'

ভবেন গোল গোল চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে। সে এত অবাক হয়ে গেছে যে কথাই বলতে পারছে না। একটু পরে ফিসফিস করে বলল, 'স্যার, যদি আমি আপনাকে ভগলুর ডেরা চিনিয়ে দিই, তাহলে আমাকে ছেড়ে দেবেন?'

বনমালি ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'ওরে সর্বনাশ!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ভগলু বুঝি মদনমোহনের মূর্তি চুরি করেছে?'

ভবেন বলল, সে চুরি করেনি। ভালো ভালো মূর্তি ভগলুর কাছে জমা হয়। সেগুলো সে চোরাপথে বিলেতে পাঠায়। অনেক টাকা দাম পায়। ভগলু অতি সাংঘাতিক লোক, সে যদি টের পায় যে আমরা তার নাম বলে দিয়েছি, তাহলে সে আমাদের খুন করে ফেলবে। তার হাতে অনেক গুণ্ডা আছে। আমি দূর থেকে তার বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারি। তারপর আমি আর সেখানে থাকব না।'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'তোমায় আমি বিশ্বাস করব কী করে? তুমি দূর থেকে কার-না কার বাড়ি দেখিয়ে সরে পড়বে আর আমি তাই মেনে নেব! তোমার মতন লোকদের তো মিথ্যে কথা বলতে বাধে না। এই সন্তু, ক্যামেরা বার কর।'

সন্তু অমনি পকেট থেকে একটা ছোট্ট ক্যামেরা বার করে ফটাফট ছবি তুলতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'ভবেন, তোমার আর তোমার এই চোরাই মালের আস্তানার ছবি তোলা রইল আমাদের কাছে। এই ছবি পুলিশের কাছে দিলে ধরা পড়ে যাবেই। বনমালিও পালাতে পারবে না। এবার চলো দেখি, কোথায় থাকে ভগলু!'

সেখান থেকে বেরিয়ে একবারে সামনে সামনে চলল সন্তু। তারপর বনমালি, তারপর ভবেন। কাকাবাবু পেছনে। তিনি রিভলবারটা রেখে দিলেন পকেটে। শুধু একবার বললেন, 'ভবেন, মাঝপথে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু তোমার একটা পা জন্মের মতন খোঁড়া হয়ে যাবে। তখন আমায় দোষ দিয়ো না। আমার হাতের টিপ খুব ভালো। এক-একটা গুলিতে তোমার এক-একটা পা খোঁড়া হবে।'

জঙ্গলের বাইরে রয়েছে একটা জিপ গাড়ি। ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল। সবাই সেই জিপ গাড়িতেই উঠল। সন্তু আর বনমালি পেছনে। ভবেন আর কাকাবাবু সামনে ড্রাইভারের পাশে। ভবেনের নির্দেশে গাড়িটা ছুটে চলল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ভগলুর আসল নাম কী?'

ভবেন বলল, 'তা তো জানি না স্যার। সবাই ভগলু ভগলু বলেই ডাকে। ওর একটা থালা-বাসনের দোকান আছে। কিন্তু ওর আসল ব্যাবসা মূর্তি পাচার করা।'

'ও কি নিজের লোক দিয়ে নানান মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করিয়ে আনায়?'

'না, স্যার। এ লাইনে অনেক লোক আছে। কুচবিহারের ওই মদনমোহন মূর্তি প্রথমে চুরি করে বিষ্টু দাস। সে পরের দিনই পাঁচ হাজার টাকায় সেটা বিক্রি করে দেয় শিলিগুড়ির অজিত সিংকে। অজিত সিং সেটা পনেরো হাজার টাকায় বিক্রি করেছে শেঠ সুরজমলকে।'

পেছন থেকে সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'প্রথম চোরটার নাম বিষ্টু দাস। সে কাকে বিক্রি করেছিল?'

সন্তু একটা ছোট খাতা খুলে নামগুলো লিখে নিচ্ছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভবেন বলল, 'শেঠ সুরজমল মূর্তিটা আমার কাছে এনেছিল। কিন্তু দাম চাইল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। অত টাকা আমি দিতে পারিনি। তাই ভগলু নিয়ে নিয়েছে। ও বিলেত আমেরিকায় পাঠিয়ে লাখ-লাখ টাকা রোজগার করবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, একেই বলে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। তোমরা সবাই সবাইকে চেনো!'

প্রায় এক ঘণ্টা গাড়িটা চলার পর সে থামল শ্রীপুর নামে একটা ছোট্ট শহরে। রেল- স্টেশনের পাশেই বাজার আর কিছু দোকানপাট ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। বেশ রাত হয়ে গেছে, তবু কয়েকটা দোকান খোলা আছে। একটা থালা-বাসনের দোকানের পাশ দিয়ে যখন জিপ গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে, তখন ভবেন বলল, 'ওই দেখুন স্যার, কাউন্টারে ভগলু বসে আছে। খুব বড়ো গোঁফ।'

ভগলুর চেহারাটা দেখবার মতন। মাথায় একটা ও চুল নেই, চকচকে টাক। কিন্তু নাকের নীচে শেয়ালের লেজের মতন মোটা গোঁফ। মুখখানা গোল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। দোকানে আরও তিন-চারজন লোক রয়েছে, মনে হয় তারা খদ্দের নয়, ভগলুরই দলের লোক।

গাড়িটা বাজার পেরিয়ে যাওয়ার পর দু-খানি পাকা দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। ভবেন বলল, 'এই প্রথম বাড়িটা ভাগলুর, আর দ্বিতীয়টা ওর ভাইয়ের। দুটোই ভগলুর বাড়ি বলতে পারেন।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'চোরাই মূর্তিগুলো ও কোথায় রাখে?'

ভবেন বলল, 'তা আমি বলতে পারব না স্যার। তবে আপনাকে আমি আর একটা খবর দিচ্ছি। কাছেই বাংলাদেশের বর্ডার। প্রত্যেক শনিবার সেখানে একটা বড়ো হাট হয়। সেই হাটের দিনে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ভগলু ভালো ভালো মূর্তি বাংলাদেশে পাচার করে দেয়। ওখান থেকেও কিছু জিনিস এদিকে আসে। এই শনিবার যদি নজর রাখেন, তাহলে মূর্তিটা হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারেন।'

কাকাবাবু বললেন, 'মূর্তিটা এর মধ্যেই যদি পাচার করে দিয়ে থাকে?'

ভবেন বলল, 'না, দেয়নি। আমাদের কানে তো সব খবর আসে। আরও বেশি দাম বাড়াবার জন্য ভগলু এখন সেটা আটকে রেখেছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ! ঠিক আছে, দেখা যাক! এখানে কোনো হোটেল আছে? রাতটা কাটাতে হবে তো!'

ভবেন বলল, 'একটা ছোটো হোটেল আছে। কিন্তু সেখানে কি আপনারা থাকতে পারবেন? হাট-বাজারের লোকেরা এসে থাকে।'

কাকাবাবু বললেন, 'খুব থাকতে পারব। একটা ঘর পেলেই হল।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভবেন এবার হাত জোড় করে বলল, 'আপনার কাছে দয়া চাইছি স্যার, এবার আমাকে ছেড়ে দিন। ভগলুর লোকজন আমাকে চিনতে পারবে, এখানে দেখলেই সন্দেহ করবে। যখন তখন খুন করতেও ওদের আটকায় না।'

বনমালি কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'আমাকেও মুক্তি দিন স্যার। নইলে ভগলু মেরে ফেলবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তোমাদেরও এই চোরাই মূর্তির কারবার ছাড়তে হবে। তিন-মাস পরে এসে আমি আবার খোঁজ নেব। তখনও যদি দেখি, তোমরা একই রকম চালিয়ে যাচ্ছ, তাহলে তোমাদের ছবি দিয়ে দেব পুলিশকে। এখন যাও, ভাগো!'

ভবেন আর বনমালি লাফিয়ে জিপ থেকে নেমে দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে!

হোটেলটা খুবই সাধারণ, কিন্তু সেটার নাম তাজমহল হোটেল। ঘরভাড়া সতেরো টাকা। ভাত-ডাল, বেগুনভাজা আর বাটামাছের ঝোল ন-টাকা। সেই খাবারই খেতে বসে কাকাবাবু ম্যানেজারের সঙ্গে ভাব জমালেন। তিনি বললেন যে সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করে তিনি নিরিবিলিতে থাকতে চান। এই শ্রীপুরে তিনি জমি খুঁজতে এসেছেন। পছন্দ হলে এখানেই বাড়ি বানিয়ে এসে থাকবেন।

রাত্তিরে আর কিছু করার নেই, দোতলার ঘরটিতে এসে ওরা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, এখানকার থানায় তো কোনো খবর দেওয়া হল না? ভগলুর তো অনেক লোকজন। পুলিশের সাহায্য নিতে হবে নিশ্চয়ই।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখনই থানায় যাব না। কেন জানিস? থানাতেও নিশ্চয়ই ভগলুর লোক আছে। ছোটো জায়গায় সব জানাজানি হয়ে যায়। আমরা থানায় গেলেই লোকে আমাদের সন্দেহ করবে। ভগলুও খবর পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে। আগে দেখা যাক না আমরা নিজেরা কী করতে পারি।'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কথাটা কাল থেকে আমার মনের মধ্যে খচখচ করছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'কী কথা, বলে ফ্যাল।'

সন্তু বলল, 'ছোটোবেলায় একবার মামার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে শিবঠাকুরের একটা মন্দির ছিল। একদিন মন্দিরের মধ্যে প্রসাদ নিতে গেছি, পুরুতমশাই বললেন, এই দেখো দেখো, যেন মূর্তি ছুঁয়ে দিয়ো না। ঠাকুরের মূর্তি ছুঁলে পাপ হয়।'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, সেই কথাই তো সবাই বলে।'

সন্তু জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে এই যে লোকগুলো মূর্তি চুরি করছে, ওরাও তো ছুঁচ্ছে। ওদের পাপ হচ্ছে না?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'পাপ হওয়া তো মনের ব্যাপার। এইসব চোর-ডাকাতগুলোর কী আর সেরকম মন আছে? ওরা পাপ-পুণ্য মানে না। চুরি করা, মানুষ খুন করাও তো মহাপাপ। চোর-ডাকাতরা সে কথাও ভাবে না।'

সন্তু বলল, 'আর একটা কথা। অনেক ঠাকুরই তো শুনেছি খুব জাগ্রত। এই যে চোর-ডাকাতরা ঠাকুরের মূর্তি চুরি করছে, যেখানে-সেখানে ফেলে রাখছে, জাগ্রত ঠাকুর নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না? ঠাকুর নিজেই চোরদের শাস্তি দিতে পারেন না?'

কাকাবাবু বললেন, 'এটাও মনের ব্যাপার, বিশ্বাসের ব্যাপার! এইসব পাথরের বা কাঠের বা মাটির মূর্তি তো শিল্পীরা বানায়। যেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল হয়। তারপর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার পর আমরা সেগুলোকে ঠাকুর মনে করি। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, গণেশ এঁদের সকলেরই গল্প আমরা জানি। তাই মূর্তিগুলো দেখলেই আমাদের সেইসব মনে পড়ে। কিন্তু যারা ওসব কাহিনি জানে না? যেমন ধর, কোনো বিদেশি এসে যদি এই রকম মূর্তি দেখে, তার কাছে পুতুলই মনে হবে। আর আমাদের মধ্যেও যারা পূজা করে, তারা কেউ শুধু নিয়মরক্ষার জন্য মাথা ঠুকে প্রণাম করে যায়। কেউ বেশি ভক্তি নিয়ে পুজো করে। কেউ ভয়ে ভয়ে পুজো করে। যার যেমন বিশ্বাস। যার বেশি বিশ্বাস, সে মনে করে এই দেবতার মূর্তি মানুষের উপকার করতে পারে, অসুখ সারিয়ে দিতে পারে। ঠাকুরের পুজো ঠিকমতন না করলে মহাবিপদ হতে পারে। সবই বিশ্বাসের ব্যাপার। আসলে কিন্তু মানুষের উপকার করা কিংবা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাই কোনো মূর্তির থাকে না। নিজেকেই বাঁচাতে পারে না। চোর-ডাকাতদের ভক্তিও নেই, বিশ্বাসও নেই, তাই মূর্তিগুলোকে মনে করে পুতুল।'

সন্তু বলল, 'শুনেছি, অনেক চোর-ডাকাতও পুজো করে?'

কাকাবাবু বললেন, 'সেটাও একটা মজার ব্যাপার। আগেকার ডাকাতরা কালীপুজো করে তবে বেরুত। ডাকাতি করতে গিয়ে মানুষ খুন করত। যারা মানুষ মারে, অন্যের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়, কোনো দেবতা কী তাদের সমর্থন করতে পারেন? আজকালও দেখবি, যারা খাদ্যে ভেজাল দেয়, জোচ্চুরি করে, গরিবদের ঠকায়, তারাই আবার বড়ো বড়ো মন্দির বানায়, ঢাকঢোল বাজিয়ে পুজো দেয়। এ সবই মিথ্যে! মানুষকে ভালোবাসাই সবচেয়ে বড়ো পুণ্যের কাজ।'

পরদিন সকালে উঠে কাকাবাবু আর সন্তু হোটেলের একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বেরুল। ছেলেটির নাম পরান। সে-ই সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিল যে এই খোঁড়াবাবুটি এখানে জমি খুঁজতে এসেছেন। জমি দেখার নাম করে পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখা হল।

শ্রীপুর জয়াগাটা বেশ ছিমছাম, সুন্দর। একটা পাতলা মতন নদীও আছে। পাতলা হলেও নদীটির বেশ তেজ, বেশ স্রোত আছে। খানিকদূরে একটা বড়ো নদীর সঙ্গে মিশেছে। ভগলুর বাড়ি এই নদীর ধারেই। বাড়ির পেছন দিকে একটা ঘর রয়েছে, সেটা একেবারে নদীর ওপরেই বলা যায়।

https://boierhut.com/fb

পরানের কাছ থেকে ভগলু সম্পর্কেও কিছু খবর পাওয়া গেল। তাকে এখানে সবাই ভয় পায়। সে স্থানীয় লোক নয়, বাইরের কোনো জায়গা থেকে এখানে এসে ব্যাবসা শুরু করেছে। একটা থালা-বাসনের দোকান করেই কী করে সে বড়োলোক হয়ে গেল, তা কেউ জানে না। চার-পাঁচজন গুণ্ডা মতন লোক সবসময় থাকে তার পাশে। থানার লোকজনের সঙ্গে তার ভাব আছে, পুলিশরা প্রায়ই তার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে যায়।

ভগলু নিজেও নাকি দারুণ পেটুক। সে একাই দুটো মুরগি খেয়ে ফেলতে পারে। দু-কিলো পাঁঠার মাংস খায়। গোটা একটা রুই মাছ না-হলে তার চলে না। দুপুরবেলা প্রায় রোজই সে একা একা নদীর ধারে ছোটো ঘরটায় বসে খায়। খাবার সময় অন্য লোক কাছে থাকা সে পছন্দ করে না। রাত্তিরে সে ওই ছোটো ঘরটাতে থাকে। সকালে নদীতে স্নান সেরে পুজো করে। পুজোর সময় সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়ে, গান গায়। তারপর ওই ঘরেই তাকে খাবার দেওয়া হয়। প্রচুর খেয়ে, খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে তারপর বিকেলের দিকে সে দোকানে এসে বসে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সব দেখে-বুঝে নিলেন কাকাবাবু। ভগলুর ধারেকাছেও গেলেন না।

রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে সন্তুকে বললেন, 'একটা সমস্যা আছে রে, সন্তু। মদনমোহনের মূর্তিটা কোথায় লুকোনো আছে, সেটা খুঁজে বার করব কী করে?'

সন্তু বলল, 'ওই নদীর ধারের ছোটো ঘরটায় ভগলু ঘুমোয় রাত্তিরে। মনে হয়, ওখানেই কোথাও আছে। অত দামি জিনিস নিশ্চয়ই সে চোখে চোখে রাখবে!'

কাকাবাবু বললেন, 'অবশ্য ঠিক। ছোটো ঘরটা একবার ভেতরে ঢুকে দেখা দরকার। কিন্তু মাটির তলায় রেখেছে না কোথায় রেখেছে তা দেখতে অনেকটা সময় লাগবে। রাত্তিরে নিশ্চয়ই ওখানে কেউ পাহারা দেয়।'

সন্তু বলল, 'একটা কাজ করব। সকালবেলা যখন ভগলু নদীতে স্নান করতে যায়, তখন এক ফাঁকে আমি ওই ঘরে ঢুকে পড়ব? তারপর দুপুরবেলা ও বেরিয়ে গেলে খুঁজে দেখব ঘরটা।'

কাকাবাবু বললেন, 'খাটের নীচে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবি? একটু নড়াচড়া করলে, কিংবা তোর যদি হাঁচি পেয়ে যায় হঠাৎ? গলা খুসখুস করে যদি? তাহলেই ধরা পড়ে যাবি। ভগলুর কীরকম গাঁটাগোট্টা চেহারা দেখেছিস তো!'

সন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'ধরা পড়ব না আমি। ধরা পড়লেও ও আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

কাকাবাবু বললেন, 'উঁহু, তা হয় না। এতে ঝুঁকি খুব বেশি। অন্য কোনো উপায় ভেবে দেখতে হবে। এখন ঘুমো।'

ভোরবেলা কীসের যেন শব্দে কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে দেখলেন, সন্তু জামা-প্যান্ট পরে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হয়ে গেছে প্রায়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন। 'এ কী সন্তু, কোথায় যাচ্ছিস?'

সন্তু বলল, 'তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, কাকাবাবু। আমি ভগুলর ওপর নজর রাখতে যাচ্ছি। নদীর ধারে বসে থাকব!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুই তো শুধু বসে থাকার ছেলে না! ভগলুর ঘরে ঢোকার চেষ্টা করবি ঠিক। ভগলু দুপুরের আগে ও-ঘর থেকে বেরোয় না। পুজো করে অনেকক্ষণ ধরে খাবার খায়। তুই এত সকাল সকাল গিয়ে কোথায় বসে থাকবি?'

সন্তু বলল, 'আমার আর শুয়ে থাকতে একদম ইচ্ছে করছে না। আমি কাল একবার ও-ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি। পাশে একটা ভাঁড়ার মতন ছোট্ট ঘর আছে। যদি ভেতরে ঢুকতে পারি, তাহলে ওই ঘরটাতে থাকবার চেষ্টা করব। ভগলু বেরিয়ে যাবার পর খোঁজাখুজি শুরু করব।'

কাকাবাবু বললেন, 'তখন নিশ্চয়ই বাইরে পাহারা থাকবে। ঠিক আছে, তুই যখন জেদ ধরেছিস, আমার রিভলবারটা নিয়ে যা। কারুকে মারবি না, শুধু আত্মরক্ষার দরকার হলে ভয় দেখাবি।'

রিভলবারটা পেয়ে সন্তু খুশিতে ছটফট করতে লাগল। কাকাবাবু সহজে সন্তুকে রিভলবারে হাত দিতে দেন না। সে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না, আমি বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসছি। তুমি ঠিক খবর পেয়ে যাবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'শোন, তুই মদনমোহনের মূর্তিটার সন্ধান পেয়ে গেলেও নিয়ে আসার চেষ্টা করিস না। চোরের ওপর বাটপাড়ি করা ঠিক নয়। ভগলুকে হাতে হাতে ধরতে হবে!'

সন্তু প্রায় ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

কাকাবাবু বিছনায় শুয়েই রইলেন। খানিক পরে একজন চা নিয়ে এল। কাকাবাবু চা খেতে খেতে একটা বই পড়তে লাগলেন।

বেলা গড়িয়ে গেল। এগারোটা বেজে যাওয়ার পর আর ঘরের মধ্যে থাকতে তাঁর ইচ্ছে হল না। বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে। প্রথমে ভাবলেন, জিপ গাড়িটা নিয়েই বেরোবেন। তারপর ঠিক করলেন, হেঁটেই যাবেন। আকাশ মেঘলা আজ, রোদ নেই, গরম নেই, হাঁটতে ভালোই লাগবে।

একটা চিঠি লিখে গাড়ির ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিলেন থানায়। তিনি যে এখানে এসেছেন তা পুলিশকে জানিয়ে রাখা দরকার। কীজন্য এসেছেন তা জানাবার দরকার নেই।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি চলে এলেন নদীর ধারে। এইটুকু নদী কিন্তু হেঁটে পার হওয়া যায় না। এক জায়গায় খেয়া পারের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এখন লোকজন বিশেষ নেই।

ভগলুর বাড়ির পেছনে বাগান। তারপর একেবারে শেষের দিকে নদীর ধার ঘেঁষে একখানা ঘর। ঠিক ঘর নয়, সেটা একটা ছোটো বাড়ির মতন। ঘরের সঙ্গে বাথরুম আর একটা ছোটো ঘর, বারান্দাও রয়েছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সন্তুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেই ভোর থেকে সে কোথায় রয়েছে? ভগলুর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নাকি?

কাছাকাছি গিয়ে শুনলেন, একজন লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। একঘেয়ে সুর। এই কী ভগলুর পুজো নাকি? কোন দেবতা পুজো করে ভগলু? এরা বিচিত্র লোক। রোজ সকালে ভক্তিভরে পুজো করে নানান ঠাকুরদেবতার মূর্তির ব্যাবসা করে।

সন্তু নিশ্চয়ই ধরা পড়েনি। তাহলে ভগলু এমন নিশ্চিন্তে পুজো করতে পারত না। সন্তুকে ধরে ফেললে ভগলু নিশ্চয়ই খোঁজখবর করত। সন্তুর সঙ্গে কে আছে সে সন্ধানও পেয়ে যেত।

আরও কিছুক্ষণ পর একজন লোক কয়েকটা খাবারের পাত্র নিয়ে ঢুকল ভগলুর ঘরে। কাকাবাবু ভাবলেন, সন্তু সকাল থেকে কিছু খায়নি বোধ হয়। বিকেল পর্যন্ত না খেয়ে থাকবে?

সেই লোকটি বেরিয়ে এসে ভেতরের বাড়ি থেকে আবার দু-তিনটে ডেকচি ভরতি কীসব নিয়ে ফিরে এল। এইরকম আরও একবার। খাবার আসছে তো আসছেই।

কাকাবাবু একটা তেঁতুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। এত খাবার ভগলুর জন্য? একটা লোক কত খেতে পারে?

হঠাৎ তাঁর মাথার মধ্যে একটা ঝিলিক খেলে গেল।

সেই লোকটা যখন আর একবার কয়েকটা খাবারের ডেকচি নিয়ে ফিরে আসছে, কাকাবাবু তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। লোকটির পিঠে তাঁর একটা ক্রাচ ঠেকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এটা বন্দুকের নল। চেঁচালেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। যেমন যাচ্ছ, তেমনই যাও।'

লোকটা কাঠের পুতুলের মতন এক পা এক পা করে হেঁটে ঘরে ঢুকল।

কাকাবাবু ভেবেছিলেন, তিনি ঘরের মধ্যে আরও দু-তিন জনকে দেখতে পাবেন। কিন্তু ঘরে ভগলু ছাড়া আর কেউ নেই। টেবিলের ওপর মস্ত বড়ো একটা থালা, ভগলু একা একা বসে খাচ্ছে। ঠিক যেন একটা রাক্ষস। তার থালার পাশে মাছের কাঁটা আর মাংসের হাড়ের পাহাড় জমে আছে। সে একটা মস্ত বড়ো মাছের মুড়ো ধরে চিবুচ্ছে। ঝোল গড়াচ্ছে মুখের দু-পাশ দিয়ে। সে বোধ হয় দু-হাত দিয়ে খায়। দু-হাতেই লেগে আছে ঝোল।

কাকাবাবুকে দেখে সে ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ কে? এই মংলু, এ কাকে নিয়ে এলি?'

মংলু নামে সেই লোকটি বলল, 'কী জানি। আমার পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে রেখেছে।'

ভগলু দেখতে পাচ্ছে কাকাবাবুর হাতে বন্দুক-টন্দুক কিছু নেই। সে গর্জন করে বলে উঠল 'হাঁদারাম। পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখতে পারলি না? ধর ওই লোকটাকে।'

মংলুও বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান। সে ডেকচি দুটো টেবিলের ওপর রেখেই ঘুরে দাঁড়াল।

কাকাবাবু একটা ক্রাচ তুলে বললেন, 'মারামারি করার দরকার নেই। আগে আমার কথা শোনো। ভগলু, তুমি কুচবিহারের মদনমোহন মূর্তিটা রেখে দিয়েছ কেন? এই নিয়ে যে কুচবিহারে দাঙ্গা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাধার উপক্রম। তুমি নিজে একজন ভক্ত হয়ে ঠাকুরদেবতার মূর্তির ব্যাবসা কর? ছি:! ওটা ফেরত দিয়ে দাও!'

ভগলু বলল, 'কে বললো, ঐ মূর্তি আমার কাছে আছে?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি ঠিক খবর নিয়েই এসেছি। মূর্তিটা আমায় দিয়ে দাও!'

ভগলু বলল, 'এই মংলু, লোকটাকে ধরতে পারছিস না?'

সেই মুহূর্তে আর একটা লোক ঢুকল ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে। মংলুও ঝাঁপিয়ে পড়ে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো কেড়ে নিল।

ভগলু খুশি হয়ে বলল, 'বা-বা-বা-বা! বেচু-তুই ঠিক সময়ে এসে পড়েছিস! লোকটাকে বাঁধ। পকেটে দেখ বন্দুক-পিস্তল কিছু আছে কিনা!'

কাকাবাবু দু-হাত তুলে বললেন, 'বাঁধতে হবে না। আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। ভগলু, তুমি খাওয়া শেষ করে নাও। এই তোমার শেষ মাছের মুড়ো খাওয়া। এরপর তোমায় দশ বছর জেলে থাকতে হবে!'

ভগলু বলল, 'তুমি একটা খোঁড়া, আমাকে জেলে পাঠাবে; হা-হা-হা-হা!'

কাকাবাবু বললেন, 'কানাকে কানা বলতে নেই, খোড়াকে খোঁড়া বলতে নেই জানো না! জেলে তোমায় যেতেই হবে। তুমি কী ভাবছ, আমি একা তোমার এই বাঘের গুহায় ঢুকেছি? পুলিশ তোমার বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এখানকার পুলিশ নয়, কলকাতার পুলিশ। দশখানা রাইফেল আছে। তোমার বাড়ির সব খুঁজে তারপর এই ঘরে আসবে। শুধু মদনমোহনের মূর্তিটা পেলেই তোমায় অন্তত দশ বছর জেলে থাকতে হবে!'

ভগলু উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'মদনমোহনের মূর্তি আমি নদীতে ফেলে দেব। কেউ খুঁজে পাবে না। তারপর আমায় কে ধরবে? কোনো প্রমাণ থাকবে না!'

একদিকের দেওয়ালে একটা বড়ো কুলুঙ্গি। তাতে এক জোড়া খুব ছোটো রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। আর প্রচুর ফুল। ভগলু এই মূর্তির পুজো করে মনে হল।

সেই কুলঙ্গির ঠিক নীচে ধাক্কা দিতেই দেওয়ালের খানিকটা অংশ সরে গেল। ভগলু তার মধ্যে হাত গলিয়ে বার করে আনল একটা কালো পাথরের মূর্তি।, সেটা সে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য ছুটে গেল জানালার দিকে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ভগলু, ভগলু, তুমি এঁটো হাতে ওই মূর্তি ধরলে। জাগ্রত ঠাকুর। জানো না, অপবিত্র হাতে ছুঁলে সেই হাতে কুষ্ঠ হয়।'

ভগলু বলে উঠল, 'অ্যাঁ?'

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে সেই মূর্তিটা খসে পড়ে গেল মাটিতে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুলির শব্দ হল। পাশের ঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সন্তু, তার হাতে রিভলবার। সিনেমার নায়কের কায়দায় সে রিভলবারের নলে ফুঁ দিতে দিতে বলল, 'প্রথমবার কারুকে মারিনি। শুধু ভয় দেখিয়েছি। এরপর কেউ নড়লেই তার মাথায় গুলি করব!'

কাকাবাবু এগিয়ে মূর্তিটা তুলে নিলেন। টেবিলের ওপর থেকে জলের গেলাস নিয়ে এঁটো জায়গাটা ধুলেন ভালো করে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছে নিয়ে বললেন, 'বা:, এবারে ঠিক আছে। ভগলু, এবার বেরিয়ে পড়ো। সন্তুকে সাবধান। ও কিন্তু খুব ভালো গুলি চালাতে পারে।'

রাস্তার লোকেরা অবাক হয়ে দেখল, সন্তুর মতন একটা বাচ্চা ছেলের হাতে রিভলবার, আর তার সামনে সামনে মাথার ওপর হাত তুলে চলেছে ভগলু আর তার দুই চ্যালা। একটু পেছনে ক্রাচে ভর দিয়ে একজন প্রৌঢ় মানুষ। হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌঁছে গেল থানায়।

কাকাবাবুর জিপটা চলে এল খবর পেয়ে। খানিক বাদে থানা থেকে বেরিয়ে সেই জিপে উঠতে উঠতে কাকাবাবু বললেন, 'যখন দেখলাম, অত খাবার যাচ্ছে ভগলুর ঘরে, তখন মনে হল, নিশ্চয়ই ওখানে আরও দু-তিনজন লোক আছে। অত খাবার কী একজন মানুষ খেতে পারে? তাহলে তুই নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছিস। তোকে আটকে রেখে ভগলু তার সঙ্গীদের নিয়ে কিছু পরামর্শ করছে খেতে খেতে।'

সন্তু বলল, 'আমি তো ভোর থেকে ওর পাশের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে বসে আছি। ভগলু টেরও পায়নি। কিন্তু মূর্তিটা কোথায় রেখেছে বুঝতে পারিনি। অন্য একটা মূর্তির পুজো করছিল!'

কাকাবাবু বললেন, 'পুলিশের কথা বলতেই কাজ হল। কিন্তু মূর্তিটা জলে ফেলে দিলে মুশকিল হত। তবে, হাতে কুষ্ঠ হবে বলামাত্র কীরকম ভয় পেয়ে গেল দেখলি!'

সন্তু বললো, 'এরা ঠাকুরের মূর্তি ভয় পায়, আবার বিক্রিও করে।'

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'সেই তো! কী বিচিত্র মানুষ এরা সব! ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস আছে। আবার টাকার লোভে সেই বিশ্বাসও চাপা পড়ে যায়!'

দুজনেই হাসতে লাগল প্রাণভরে।

https://boierhut.com/fb

এক-একটা মানুষের কিছুতেই বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। ঠিক এইরকমই একটা লোক বসে থাকে পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রত্যেক শনিবার। লোকটি পরে থাকে একটা সরু পাজামা আর একটা রংচঙে জোব্বা। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে কালো চশমা। মাথায় একটা চ্যাপটা টুপি।

গনগনে রোদের মধ্যেও লোকটি পার্কের বেঞ্চে দুপুরবেলা বসে থাকে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ঘাসের দিকে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দীপু মাঝে মাঝে পার্ক সার্কাস ময়দানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে। লোকটিকে দেখে দীপুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। একইরকম পোশাক, প্রত্যেক শনিবার ঠিক একই জায়গায় বসে থাকে কেন এই মানুষটা? সবসময় ও একলা থাকে, কেউ ওর পাশে বসে না।

একদিন ছুটির পর বৃষ্টির মধ্যে স্কুল থেকে বেরিয়েছে দীপু। পার্কের রেলিং টপকে দৌড় লাগাতে গিয়েই আছাড় খেয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে ছড়িয়ে-পড়া বইপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় দেখল, একটু দূরের বেঞ্চে সেই দাড়িওয়ালা, কালো চশমা-পরা লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দীপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল। দীপুর এখন মোটেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লোকটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই লোকটাই-বা শুধু শুধু এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে কেন?

দীপুর কৌতূহল হল। সে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। লোকটি বলল, 'ইসটুম, কিসটুম, দ্রুখ দ্রুখ!'

এ আবার কীরকম ভাষা? এই লোকটা কী কাবুলিওয়ালা নাকি? চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। লোকটির রোগা পাতলা চেহারা। দীপু কখনো রোগা কাবুলিওয়ালা দেখেনি। দীপু বলল, 'কেয়া? হাম নেই জানতা।'

লোকটা এবারে দুটো আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল, 'হিন্দি? বাংলা?'

দীপু বলল, 'বাংলা।'

এবারে লোকটা ভাঙাভাঙা উচ্চারণে বলল, 'বেশ কথা। হামি বাংলা জানে! এই লিজিয়ে খোকাবাবু, চকলেট খাও।'

https://boierhut.com/fb

লোকটা জোব্বার পকেট থেকে একটা আধভাঙা চকলেটের টুকরো বার করে দীপুর দিকে এগিয়ে দিল।

দীপুর হাসি পেল। লোকটা কী তাকে ক্লাস সিক্স-সেভেনের ছেলেদের মতন বাচ্চা ছেলে পেয়েছে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুমের ওষুধ-মেশানো চকলেট খাইয়ে তারপর চুরি করে নিয়ে যাবে? দীপু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। সে ইচ্ছে করলে এই রোগা লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে।

দীপু বলল, 'আমি চকলেট খাব না। আপনি আমায় ডাকলেন কেন?'

লোকটি চকলেটটা নিজের মুখে ভরে দিয়ে বলল, 'তুমহার নাম তো দীপক মিত্রা আছে, তাই না?'

দীপু একটু অবাক হল। লোকটা তার নাম জানল কী করে? লোকটা তার সঙ্গে ভাব জমাতেই বা চাইছে কেন?

তবু সে বলল, 'মিত্রা নয়, মিত্র। আমি আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারছি না। কী বলতে চান চটপট বলুন।'

লোকটা হঠাৎ সারামুখে হাসি ছড়িয়ে ফেলল। তারপর বলল, 'তুমহাকে আমার খুব ভালো লাগল। তুমি হামার বাড়িতে যাবে? বেশি দেরি হবে না। স্রেফ আধা ঘণ্টা থাকবে।'

দীপুর মনে হল এ লোকটা তো তাহলে সত্যিই ছেলেধরা।

দীপুদের স্কুলের কাছে বসে থাকে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদের নিয়ে যেতে চায়।

দীপুদের স্কুলের ক্লাস এইটের ছেলে অর্ণব সরকার গত মাসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকেও কী এই লোকটা ধরে নিয়ে গেছে নাকি?

দীপুর কিন্তু একটুও ভয় হল না। সে বলল, 'আমাকে আপনার বাড়ি নিয়ে যাবেন? কেন? আমি মাছ খাই না, শুধু মাংস খাই। আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ একসঙ্গে মেখে খাই। দুধ আর কোকো মিশিয়ে খাই। এসব খাওয়াতে পারবেন?'

লোকটা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'বেশ তো, হামি তুমাকে মুরগমোসল্লম খাওয়াব। ঠাণ্ডা লস্যি খাওয়াব, যদি তুমি একঠো কাম করতে পারো।'

'ধ্যাত।' বলে দীপু আবার চলতে শুরু করল। লোকটা তখন হাসতে লাগল জোরে জোরে।

দীপু আর পেছন ফিরে তাকাল না।

একটুখানি যেতে-না-যেতেই কোথা থেকে একটা মস্তবড়ো কুকুর তেড়ে এল দীপুর দিকে। গলায় বেল্টবাঁধা একটা অ্যালসেশিয়ান। কারোর বাড়ির পোষা কুকুর হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে।

দীপু এমনিতে কুকুর দেখে ভয় পায় না। কিন্তু এই কুকুরটা তেড়ে আসছে তার দিকেই। পার্কে আর কোনো লোকজন নেই। কুকুরের সঙ্গে ছুটেও পারা যাবে না। দীপু তাড়াতাড়ি আর একটা বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কুকুরটাও সেখানে এসে যেই দীপুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি একটা লাল রঙের দড়ির ফাঁস এসে পড়ল কুকুরটার গলায়।

দীপু দেখল সেই কালো চশমাপরা লোকটাই দড়ি ছুড়ে কুকুরটাকে বেঁধে ফেলেছে...

দীপু দেখল সেই কালো চশমাপরা লোকটাই দড়ি ছুড়ে কুকুরটাকে বেঁধে ফেলেছে। তারপর কুকুরটাকে টানতে টানতে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে লোকটা তার গলা থেকে ফাঁস খুলে দিল, তারপর কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মেরে বলল, 'যা, ভাগ!'

অত বড়ো কুকুরটা এখন দারুণ ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটা আবার দীপুর দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, 'ইধারে এসো দীপকবাবু।'

দীপু বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ! আমার বাড়ি ফেরার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভয় নেই, দীপকবাবু। এক মিনিট ঠারো, একঠো কথা বলি। তোমাকে একঠো চিজ দিতে চাই--বহুত দামি চিজ।'

'দামি চিজ, মানে দামি জিনিস? সেটা আমাকে দেবেন কেন?'

'দেব তুমাকে হামার পছন্দ হয়েছে সেইজন্য। তার বদলে তুমাকেও একঠো কাম করতে হোবে। যাবে, হামার বাড়িতে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'না, স্কুল থেকে ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে আমার মা চিন্তা করবেন। তা ছাড়া আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। সামনেই আমার পরীক্ষা--'

'ঠিক আছে, বৃষ্টি হামি থামিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, এক, দো, তিন.....'

হাতের সেই লাল দড়িটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লোকটা পাঁচ পর্যন্ত গুনে বলল, 'এই দেখো বৃষ্টি বেঁধে ফেলেছি হামি, এবারে রোদ উঠবে।'

বৃষ্টি সত্যিই থেমে গেল, যদিও আগে থেকেই একটু কমে আসছিল।

দীপু হেসে বলল, 'আপনি বুঝি কুকুরের মতো বৃষ্টির গলাতেও দড়ি বাঁধতে পারেন? হে-হে-হে! আপনি আপনিই বৃষ্টি কমে গেছে।'

লোকটি বলল, 'তুমাকে হামি আর একঠো চিজ দেখাচ্ছি। তুমি এই দড়িটাতে হাত দাও।'

দীপু সাবধান হয়ে গিয়ে বলল, 'না, আমি দড়িতে হাত দেব না!'

'ঠিক আছে। ওই গাছটায় হাত দাও।'

'কেন? ততে কী হবে?'

'দিয়ে দেখো না।'

লোকটা তার হাতের দড়িটা দিয়ে গাছটার গায় একবার মারল। তারপর দীপু সেই গাছটার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই দারুণ চমকে উঠল। দীপুর সারা শরীরটা ঝনঝন করে উঠেছে, ঠিক কারেন্ট লাগলে যেমন হয়।

গাছের গায়ে তো কখনো কারেন্ট থাকতে পারে না। এই লোকটা তাহলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে দীপুকে।

দীপুর মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেই লোকটা বলল, 'এসব ম্যাজিক নেহি, ম্যাজিক নেহি, আসলি জিনিস আছে। আর একঠো দেখবে? ওই দেখো, আসমান দিয়ে একঠো এরোপ্লেন যাচ্ছে। যাচ্ছে তো?'

দীপু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রায় তাদের মাথার ওপর দিয়েই একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

সেই লোকটা লাল দড়িটা ছুড়ে দিল শূন্যের দিকে, তারপর বলল, 'যা:!'

প্লেনটা অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবারে গা ছমছম করে উঠল দীপুর। এ কার পাল্লায় পড়ল সে! এই সময় পার্কটা এত ফাঁকাই বা কেন? লোকটা যদি দীপুকেও ওই দড়িতে বেঁধে ফেলে!

দীপু শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হল প্লেনটার? ধ্বংস হয়ে গেল?'

'না, না, ধ্বংস হবে কেন? তাহলে তো ভেতরের আদমিগুলোও মরে যাবে। হামি তো কোনো মানুষ মারি না। হামি শুধু তোমার আঁখ থেকে মুছে দিলাম এরোপ্লেনটাকে। শোনো দীপকবাবু, হামি তুমাকে যে চিজ দেব বলছিলাম, তা কোনো আনসান চিজ নয়। তুমাকে দেব আসলি চিজ, তা হল

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জ্ঞান। তুমি হামার কাছ থেকে এই জ্ঞান যদি নাও, তবে তুমি আন্ধারেও দেখতে পাবে, আগুন লাগলে হাত পুড়বে না, তিন দিন কিছু না-খেলেও ভুখ লাগবে না, আরও অনেক-কিছু পারবে।'

'ঠিক আছে, শিখিয়ে দিন!'

'আভি তো হবে না! দু-এক ঘণ্টা টাইম লেগে যাবে। তার আগে যে তুমাকে একঠো কাম করতে হবে।'

'কী কাজ বলুন।'

'তুমি হামাকে একটা দাওয়াই খাওয়াবে।'

'দাওয়াই, মানে ওষুধ?'

'হাঁ, হাঁ। হামার বাড়িতে সেই ওষুধ আছে। খুব দামি হেকিমি ওষুধ। পাঁচ ফোঁটা তাজা রক্ত মিশিয়ে সেই ওষুধ তৈয়ার করতে হয়। চোদ্দো-পনেরো বছরের বুকের রক্ত। তুমি সেইটুকু রক্ত হামাকে দেবে?'

'রক্ত!'

'হাঁ, মাত্র পাঁচ ফোঁটা। আসলে হয়েছে কী জানো, হামি তো শুধু রোদ্দুর খাই। রোদ্দুর না-থাকলেই হামি দুবলা হয়ে যাই। তখন ওই দাওয়াই খেতে হয়।'

'আপনি রোদ্দুর খান?'

'হাঁ, দীপকবাবু! হামি কিছু খাবার খাই না। রোদ্দুর খেয়েই হামার শরীর খুব তাজা থাকে। মুশকিল হয় এই বর্ষাকালে। এক-একদিন রোদ্দুরই থাকে না, শুধু মেঘ! শুধু বৃষ্টি! তখন হামি দুবলা হয়ে যাই।'

'আপনি তো ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন। বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়ে রোদ খাবেন!'

'আরে বাপরে বাপ, সে কী কখনো হয়! বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কত ক্ষতি হবে। চাষবাস হবে না। ধান-গম হবে না। কত লোক না-খেয়ে মরবে। হামার একেলার সুখের জন্য কী হামি বৃষ্টি বন্ধ করতে পারি? তুমি হামায় একটু দাওয়াই খাইয়ে দাও! স্রেফ পাঁচ ফোঁটা রক্ত।'

দীপু খানিকক্ষণ হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এখন আপনার বাড়ি যাব, অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমার মা খুব চিন্তা করবেন। আমি কাল যদি আপনার বাড়ি যাই? কাল মাকে বলে আসব যে একটু দেরি হবে।'

'কাল? ঠিক আসবে?'

'হ্যাঁ, আসব। আপনি ভাববেন না যে আমি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দিতে ভয় পাই। আমি আজকে এখন বাড়ি যাব।'

'তাহলে এসো কালকে।'

https://boierhut.com/fb

দীপু বারবার পেছনে তাকাতে তাকাতে চলে গেল পার্কটা পেরিয়ে। লোকটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি নেমে গেল আবার।

দীপু অবশ্য এই ঘটনাটা বাড়িতে কাউকে বলল না। কিন্তু লোকটা তাকে দারুণ ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে ভেবে সে খুব উত্তেজিত হয়ে রইল। পাঁচ ফোঁটা রক্ত তো অতি সামান্য ব্যাপার।

সেদিন বিকেল থেকে সারারাত বৃষ্টি হল। পরের দিনও বিকেলের দিকে একরকম বৃষ্টি। সেদিন রবিবার। দীপুর স্কুল বন্ধ। তবু বিকেলের দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার নাম করে সে চলে এল সেই পার্কে। সেই লোকটা নেই। এত বৃষ্টির মধ্যে কেউই পার্কে আসেনি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এল দীপু।

এরপর পরপর কয়েকদিন চলল খুব বৃষ্টি। আকাশে রোদই ওঠে না। দীপুর খালি মনে হয়, সেই লোকটা কিছু না-খেয়ে আছে। আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওষুধ খাবে কী করে। অন্য কোনো ছেলে কী পাঁচ ফোঁটা রক্ত দেবে?

বৃষ্টির জন্য স্কুল বন্ধ রইল দু-দিন। তার পরের শনিবার দীপু ছুটির পরেই দৌড়ে এল পার্কে। লোকটা আজও বসে নেই তার সেই নিজের জায়গাটায়। কিন্তু সেই বেঞ্চটার ওপরে একটা লাল রঙের দড়ি পড়ে আছে।

এটা কী সেই ম্যাজিকের দড়ি? লোকটা দীপুর জন্যই রেখে গেছে? কিন্তু দীপু সেই দড়িটা ছুঁয়ে কিছুই বুঝতে পারল না। লোকটা তো তাকে তার সেই জ্ঞান কিংবা ম্যাজিক শিখিয়ে যায়নি।

লোকটাকে আর কোনোদিন দেখতে পায়নি দীপু।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বছর দশেক আগেও বেলঘরিয়ার একটা জায়গায় ছিল বড়ো বড়ো ডাকাতের আড্ডা। দিনের বেলা রাস্তার ওপর মানুষ খুন, ব্যাংক ডাকাতি কিংবা চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের সব টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে পড়া এই বেলঘরিয়ার ডাকাতদের পক্ষে ছিল অতি সহজ কাজ। কলকাতা কিংবা অন্য জায়গার নামকরা সব বড়ো বড়ো ডাকাতরাও লুকিয়ে থাকত বেলঘরিয়ার সেই গোপন জায়গাটায়।

পুলিশ অনেকবার সেখানে হানা দিয়েছে। বেশ কয়েকবার পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধও হয়েছে ডাকাতদের। দারুণ সাহস সেই ডাকাতদের, তাদের সঙ্গে থাকত স্টেনগান, মেশিনগান, আরও সব সাংঘাতিক অস্ত্র। দু-তিনবার পুলিশরাই হেরে গিয়ে ফিরে এসেছে। একবার ডাকাতদের গুলিতে তিনজন পুলিশ মারা যায়, তাদের মধ্যে একজন আবার বড়ো অফিসার। তার পরের দিন পুলিশের একটি বিরাট দল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ডাকাতদের গোপন আড্ডাখানাটা একেবারে ঘিরে ফেলে। সেবার পাঁচজন ডাকাত ধরা পড়েছিল আর দু-জন ডাকাত আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়ে মরে গিয়েছিল। কিন্তু তা বলে বেলঘরিয়ার ডাকাতরা দমে যায়নি। ওই ঘটনার ঠিক দশ দিন বাদেই দুপুরবেলা একদল ডাকাত বেলঘরিয়া রেলস্টেশনে ঢুকে সব টাকা লুট করে নেয়। যাবার সময় তারা সমস্ত রেল-কর্মচারীদের হাত-পা বেঁধে রেখে গিয়েছিল। ডাকাতরা যেন বুঝিয়ে দিতে এসেছিল যে পুলিশকে তারা ভয় পায় না।

তাদের অবশ্য ডাকাত বলা হত না, বলা হত গুণ্ডা। বেলঘরিয়ার গুণ্ডাদের নাম সবাই শুনেছে। কিন্তু যারা টাকা লুট করে কিংবা মানুষ খুন করে, তাদের গুণ্ডা না বলে ডাকাত বলাই তো ঠিক।

বেলঘরিয়ার ডাকাতদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ঘটনাও জানত অনেকে। ওই ডাকাতরা পুলিশকে ভয় পায় না বটে, কিন্তু একজন মানুষকে ভয় পায়। সেই মানুষটির নাম গুরুদেব। সেই গুরুদেবকে অবশ্য বেলঘরিয়ার অন্য কোনো লোক কিংবা পুলিশের লোকেরা চোখে দেখেনি কখনো।

যেসব ডাকাতরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল, তাদের অনেক জোর করা হয়েছিল এই গুরুদেব সম্পর্কে বলবার জন্য। তারা কিছুতেই মুখ খোলেনি। গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করলেই তারা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত।

পুলিশের অনেক বড়ো বড়ো অফিসার অবশ্য বলতেন, এই গুরুদেবের ব্যাপারটা একদম বাজে কথা। ওরকম কোনো লোক নেই। এত বাঘা বাঘা ডাকাতরা শুধু একজন লোককে ভয় পায়, তা কখনো হতে পারে? কোথায় সে থাকে, কী করে? অন্য কেউ তাকে দেখেনি কেন?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এই সময় ধনা হালদার নামে দারুণ কুখ্যাত একজন ডাকাত নিজে থেকে এসে পুলিশের কাছে ধরা দেয়। ধনা হালদার এমনই দুর্দান্ত যে পুলিশ তাকে কিছুতেই ধরতেই পারেনি, সে কত যে মানুষ খুন করেছে আর কতবার যে ট্রেন-ডাকাতি করেছে তার ঠিক নেই। সেই ধনা একদিন দুপুরবেলা নিজে থেকে লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের অফিসে এসে বলল, আমার নাম ধনা হালদার, আমায় গ্রেফতার করুন।

পুলিশের কাছে ধনার ছবি ছিল, তাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। সবাই অবাক।

ধনা কেন ধরা দিল? সে বলেছিল, গুরুদেবের আদেশ।

তখন ধনাকেও গুরুদেব সম্পর্কে অনেক জেরা করা হল। কিন্তু সে আর কোনো কিছু বলতে চায়নি। সে শুধু বারবার বলেছিল, আমায় ফাঁসি দিন কিংবা যা খুশি করুন, গুরুদেবের আদেশে আমি এখানে এসেছি।

সেবারেও পুলিশের অনেক বড়ো অফিসার বলেছিলেন, ওই গুরুদেবের কথাটা ধাপ্পা! ধনা হালদার ধরা দিয়েছে অন্য কারণে। গুণ্ডাদের মধ্যেও অনেক দল থাকে, আর এক দলের সঙ্গে অন্য দলের প্রায়ই দারুণ মারামারি হয়। ধনা হালদার একদিন রাগের মাথায় অন্য একটা দলের সর্দার মেঘা দাসের নলি কেটে ফেলে। মেঘা দাস রাস্তার ওপর পড়ে ছটফট করতে করতে মারা যায়। ধনা হালদারের দলের চেয়েও মেঘা দাসের দলে গুণ্ডা বেশি। তারা নাকি সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে মেঘা দাসের খুনের বদলা তারা নেবেই। যতদিন-না ধনা হালদারের গলার নলি ঠিক ওইভাবে তারা কেটে ফেলতে পারে, ততদিন তারা ভাতের সঙ্গে নুন খাবে না। ডাকাতরা কোথায় লুকোয় সে খবর পুলিশ ন-জানতে পারলেও অন্য ডাকাতরা ঠিক জেনে যায়। সেইজন্যই ধনা হালদারের আর বাঁচবার আশা ছিল না বলেই ভয় পেয়ে সে পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছিল। ফাঁসি হয়নি অবশ্য! ধনা হালদার এখন যাবজ্জীবন জেল খাটছে।

সে যাই হোক, ধনা হালদার ধরা দেবার পর থেকেই বেলঘরিয়ার ডাকাতদের উৎপাত আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অনেকে ধরা পড়ে যায়, অনেকে পালিয়ে যায়। যারা ধরা পড়েছিল, তাদের সবারই কেমন যেন মরা ভাব। তারা সবাই বলেছিল, আমরা ডাকতি করা ছেড়ে না দিলে গুরুদেব আমাদের মেরে ফেলতেন। গুরুদেবের জন্য ধরা পড়লাম।

বেলঘরিয়ায় আর এখন সেরকম ডাকাতের ভয় নেই। দু-চারটি নতুন গুণ্ডা মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তারা ধরা পড়ে কিংবা নিরুদ্দেশে চলে যায়। বেলঘরিয়াকে ডাকাতমুক্ত করার সব কৃতিত্ব পুলিশরাই নিতে চায় বটে কিন্তু সাধারণ লোকের ধারণা, সেই অদেখা গুরুদেবের জন্যই এসব হয়েছে।

এর মধ্যে মাত্র দু-বছর আগে আমার বন্ধু কৌশিকের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল বেলঘরিয়ায়। সেটা ঠিক একটা গল্পের মতন। কৌশিককে আমি খুব ছেলেবেলা থেকে চিনি, খুব ভালো ছেলে,

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অকারণে মিথ্যে কথা বলা তার স্বভাব নয়। সেই জন্যই তার কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

কৌশিক থাকে ব্যারাকপুরে, সেখানে একটি কলেজে পড়ায়। বেলঘরিয়ায় কৌশিকের বড়োমামার বাড়ি। যখন বেলঘরিয়ায় খুব ডাকাতের উৎপাত বেড়েছিল, সেই সময় কৌশিকের বড়োমামা ভয় পেয়ে বাড়িঘরে তালা দিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। সব ঝট মিটে যাবার পর তিনি আবার সেখানে ফিরে গেছেন। তাঁর কোনোদিন কোনো বিপদ হয়নি।

দু-বছর আগে কৌশিকের বড়োমামা খুব অসুখে পড়েছিলেন। তখন প্রত্যেক দিনই বিকেলবেলা কৌশিক ট্রেনে চেপে ব্যারাকপুর থেকে বেলঘরিয়ায় এসে বড়োমামাকে একবার করে দেখে যায়। সন্ধ্যেবেলা সে ট্রেনে করে আবার ফেরে।

তখন শীতকাল। জানুয়ারি মাসের শেষদিকে পরপর দু-দিন বৃষ্টি হওয়ায় আরও দারুণ কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। রাত্তিরবেলা ট্রেনে ফেরার সময় ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন হাত-পা জমে যায়।

পরপর আট ন-দিন আসার পর বড়োমামার অসুখটা অনেক কম মনে হল। সেদিন বড়োমামিমা বললেন, এই ঠাণ্ডার মধ্যে তুই আর রোজ রোজ আসিস না। এখন তো উনি অনেকটা ভালো হয়ে গেছেন। শুধু শুধু তুই শীতে কষ্ট পাচ্ছিস কেন?

বড়োমামা সেরে উঠছেন বলে মামিমার মনটা ভালো ছিল, তিনি খিচুড়ি রান্না করে কৌশিককে খেয়ে যেতে বললেন। সেইজন্য সন্ধ্যেবেলা কৌশিকের ফেরা হল না। তাতে অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই, রাত্তিরবেলা ব্যারাকপুরে ফেরার অনেক ট্রেন আছে।

সেদিন যেন শীতটা সবচেয়ে বেশি। কটসউলের শার্টের ওপর কৌশিক একটা মোটা ফুলহাতা, গলাবন্ধ সোয়েটার পরে এসেছে, তাও যেন ঠাণ্ডা লাগছে। বড়োমামিমা বললেন, তুই তাহলে তোর বড়োমামার শালটা গায়ে দিয়ে যা।

কৌশিক প্রথমে শালটা নিতে চায়নি। কিন্তু মামিমা বললেন, তুই তো আবার আসবি সামনের রবিবার, সেদিন শালটা ফেরত আনিস।

কৌশিকের বড়োমামার বাড়ি স্টেশনের উলটোদিকে বেশ খানিকটা দূরে। সাইকেল-রিকশা করে এসে, ওভারব্রিজ পেরিয়ে এদিকে এসে ট্রেন ধরতে হয়।

কৌশিক সাইকেল-রিকশা করে এসে যখন স্টেশনের ওপারে নামল, তখন রাত সাড়ে ন-টা বাজে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে ওভারব্রিজে উঠতে যাবে, এমন সময় পাশের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। ওভারব্রিজের ডান পাশে দুটি আট-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে, হাতে একটা টিনের থালা। ওরা ভিক্ষে চায়। রেলস্টেশনে এমন বাচ্চা ভিখারি তো কতই থাকে। কিন্তু ছেলে দুটির সম্পূর্ণ খালি গা, এই নিদারুণ শীতের মধ্যে ওই অবস্থায় দুটি বাচ্চা ছেলেকে দেখলে চমকে উঠতেই হয়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কৌশিক গেঞ্জির ওপর শার্ট, তার ওপর সোয়েটার, তার ওপর আবার শাল জড়িয়েছে, আর এই দুটি বাচ্চা খালি গায়ে বসে আছে। ওরা এই অবস্থায় বাঁচবে?

কৌশিক ভাবল, তার উচিত তার গায়ের শালটা খুলে ওদের দিয়ে দেওয়া। তাতে তার তো এমন কিছু অসুবিধে হবে না। কিন্তু শালটা তার নিজের নয়, বড়োমামার। সে কী এটা কারুকে দান করে দিতে পারে! বড়োমামার নিশ্চয়ই আরও শাল আছে, একটা দিলে কী আর হবে। তবে বড়োমামা-বড়োমামিমা হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে কৌশিক শালটা কারুকে দান করেছে। ওঁরা ভাববেন, সে ওটা হারিয়ে ফেলেছে।

শালটা আর দিল না কৌশিক, ওদের থালায় আধুলি ফেলে দিয়ে উঠতে লাগল। কয়েক পা উঠে সে থমকে দাঁড়াল আবার। তার খুব খারাপ লাগছে। সে ফিরে এসে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ওদের দিয়ে বলল, এই, তোদের আর বসে থাকতে হবে না। এবার বাড়ি যা।

ছেলে দুটি দশ টাকার নোটটা নিয়ে উলটে-পালটে দেখতে লাগল। কৌশিক আর দাঁড়াল না, ওভারব্রিজ পেরিয়ে এল স্টেশনের দিকে।

এদিকটা একেবারে নিঝুম, একটাও মানুষ নেই। অথচ এই সময় তো প্ল্যাটফর্ম লোকের ভিড়ে গমগম করে।

কাউন্টারে টিকিট কিনতে গিয়ে কৌশিক কারণটা বুঝতে পারল। শিয়ালদায় কীসের যেন গোলমাল হয়েছে খুব, সন্ধে থেকে ট্রেন চলছে না। কখন যে ট্রেন চলবে তার ঠিক নেই, আজ রাতে নাও চলতে পারে।

কৌশিক দ্রুত চিন্তা করে নিল। ট্রেন না চললেও এমন কিছু বিপদ নেই। এখান থেকে বাসেও ব্যারাকপুর যাওয়া যায়। এখনও গেলে বাস পাওয়া যেতে পারে। কৌশিক প্রায় দৌড়ে চলে গেল বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে।

কিন্তু সেখানেও তাকে হতাশ হতে হল। ব্যারাকপুরে শেষ বাস এই একটু আগে চলে গেছে। আজ রাতে আর যাওয়ার উপায় নেই।

কৌশিক ঠিক করল, তাহলে বড়োমামার বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকালে যাবে ব্যারাকপুরে।

বিরক্তভাবে সে ফেরার পথে হাঁটতে লাগল। এবারে আর ওভারব্রিজে না-উঠে সে রেললাইনের ওপর দিয়েই হেঁটে চলে এল উলটোদিকে।

এপাশে এখন সাইকেল-রিকশাও নেই একটাও। ট্রেন চলছে না, যাত্রী নেই, তাই রিকশাওয়ালাও চলে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে বেশ খানিকটা রাস্তা কৌশিককে হেঁটে যেতে হবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কৌশিক খানিকটা পথ গেছে মাত্র, এমন সময় দু-তিনজন লোক হুড়মুড় করে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। তারপর সে কিছু বোঝবার আগেই তারা তাকে ঠেলে ফেলে দিল মাটিতে, দু-হাত ধরে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল মাটির ওপর দিয়ে। কৌশিক চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কেউ তার সাহায্যের জন্য এল না। একজন লোক তাকে একটা লাথি মেরে বলল, একদম চুপ! জানে মেরে দেব একেবারে।

ডাকাত-গুণ্ডার কথাটা কৌশিকের মনেই ছিল না একেবারে। পরপর ক-দিন ধরেই সে বেলঘরিয়ায় আসছে, কোনোদিন কিছু হয়নি। ভয়ের চোটে কৌশিক কিছু চিন্তা করতেও পারল না।

ওরা কৌশিককে একটা ঝোপের মধ্যে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, কী আছে, শিগগির দে!

বড়োমামার অসুখের জন্য যদি হঠাৎ কোনো দরকার লাগে, এইজন্য কৌশিক রোজ দেড়-শো দু-শো টাকা সঙ্গে নিয়ে আসে। ট্রেনে পকেটমারের ভয়ে টাকাটা সে রাখে গেঞ্জির মধ্যে, প্যান্টের পকেটে এমনি দশ-পনেরো টাকা থাকে।

সে বলল, আমার কাছে তো বিশেষ কিছু নেই।

একজন ডাকাত ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, ঘড়ি খোল! কী আছে শিগগির বার কর।

অন্য একজনের হাতে লম্বা একটা ছুরি সামান্য চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল। আর একজন বলল, গায়ের শালটা দামি, খুলে নে।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে কৌশিক ডাকাতদের কারুর মুখ দেখতে পায়নি; কিন্তু একজনের গলার আওয়াজ তার খুব চেনা মনে হল। সে অমনি বলে উঠল, তুমি বিশ্বেশ্বর না? আমি কৌশিক বোস! চিনতে পারছ না? আমায় বাঁচাও!

এই কথাটা বলেই কৌশিক সবচেয়ে বড়ো ভুল করল। কৌশিকদের কলেজের ল্যাবরেটরির একজন বেয়ারা ছিল বিশ্বেশ্বর। সে ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র ভীষণ চুরি করত। দু-তিনবার ধরা পড়েও তার স্বভাব বদলায়নি। তাই তার চাকরি যায়। সে-ই এখন গুণ্ডা হয়েছে।

কৌশিকের কথা শুনেই একজন ডাকাত বলল, এই, তোকে চিনে ফেলেছে। এই বিশে, ওকে খতম করে দে।

আর একজন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খতম করে দে। নইলে পুলিশের কাছে নাম বলে দেবে।

সব ক-টা ডাকাত মিলে কৌশিকের ওপর পড়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। কৌশিক লড়াই করার চেষ্টা করেই বুঝল সে একলা কিছুতেই পারবে না ওদের সঙ্গে। সে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, আমায় বাঁচাও, আমায় প্রাণে মেরো না, আমি কারুকে বলব না, আমি সব টাকা বার করে দিচ্ছি, মেরো না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যে ডাকাতটার হাতে ছুরি ধরা ছিল, সে হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল।

একজন ডাকাত ছুরি তুলে বলল, চোপ।

ঠিক তক্ষুনি যেন বজ্রপাতের মতন আর কেউ বিকট গলায় বলে উঠল, এই।

যে ডাকাতটার হাতে ছুরি ধরা ছিল, সে হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল।

কৌশিক তাকিয়ে দেখল, অন্ধকারের মধ্যে প্রকান্ড চেহারার একজন মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে। বেড়াল যেমন ইঁদুরকে ধরে সেইরকমভাবে সেই লম্বা মানুষটি এক হাতে সেই ছুরিওয়ালা ডাকাতটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। তারপর কমলালেবুর খোসা ছোড়ার মতন সেই মানুষটি ডাকাতটিকে অনেক দূরে ছুড়ে দিল।

অন্য ডাকাত দুটো চেঁচিয়ে উঠল, বাপরে! গুরুদেব!

তারা পালানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার আগেই সেই দৈত্যের মতন লম্বা লোকটি দু-হাতে তুলে নিল ডাকাত দুটোকে, ঠকাস করে ঠুকে দিল তাদের দু'জনের মাথা। তারপর তাদের দুজনকেও ছুড়ে ফেলে দিল অনেক দূরে।

কৌশিক এমনই অবাক হয়ে গেছে যে কথা বলতে পারছে না। সে আস্তে আস্তে উঠে বসে হাঁ করে চেয়ে রইল। গুরুদেবের কথা কৌশিকও শুনেছে আগে! ইনিই সেই গুরুদেব?

https://boierhut.com/fb

লোকটি অন্তত সাত ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া, মাথায় চুল জট পাকানো, খালি গা। শুধু একটা গেরুয়া রঙের লুঙ্গি পরে আছেন।

কৌশিককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সেই গুরুদেব বাজখাঁই গলায় বললেন, যা বাড়ি যা। আর ভয় নেই।

একটু আগেই কৌশিক ভেবেছিল, সে বুঝি মরেই যাবে। হঠাৎ বেঁচে গেল এই গুরুদেবের জন্য। দারুণ কৃতজ্ঞতায় সে গুরুদেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল।

গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে পা সরিয়ে নিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, ছুঁবি না। আমায় ছুঁবি না।

কৌশিক থতোমতো খেয়ে গেল। গুরুদেব আবার বললেন, ভিখিরি ছেলে দুটোকে তোর শালটা দিতে পারলি না? তোরা চোর-ডাকাতের হাতে জিনিস খোয়াবি, তবু প্রাণে ধরে কারুকে কিছু দান করতে পারিস না?

আর কিছু না বলে গুরুদেব পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলেন।

কৌশিক উঠে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল তাঁর পিছু পিছু। সে ভাবল, গুরুদেব বুঝি তাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সে এতই অভিভূত হয়ে গেছে যে আর কোনো কথাও বলতে পারছে না।

গুরুদেব আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার পিছু পিছু আসছিস কেন, যা, বাড়ি যা।

কৌশিক থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কাছেই একটা পুকুর, গুরুদেব সেই পুকুরের জলে নেমে পড়লেন। তারপর বুকজলে গিয়ে গুরুদেব ডুব দিলেন, আর উঠলেন না।

কৌশিক আমাকে ঘটনাটা বলার পর জিজ্ঞেস করলাম, আর উঠলেন না? তুই নিশ্চয়ই চোখের ভুল দেখেছিস?

কৌশিক উত্তেজিতভাবে আমার হাত ধরে বলল, না, আমি ভুল দেখিনি। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তিনি আর উঠলেন না। সত্যি বলছি। বিশ্বাস করো।

https://boierhut.com/fb

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, এ কী! এগুলো কীসের ডিম?

সন্তুও বেশ অবাক হয়েছিল। ডাকবাংলোর কুক তাদের দু-জনের জন্য একটা প্লেটে চারটে ডিমসেদ্ধ দিয়ে গেছে। ওরকম ডিম সন্তু কখনো আগে দেখেনি। মুরগির ডিমের চেয়েও একটু ছোটো, পুরোপুরি গোল। ঠিক পিং-পং বলের মতন। প্লেটে সাজানো যেন অবিকল চারটি বল, এক্ষুনি ওগুলো নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা যায়।

বিমান আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছে। সে শুধু এক কাপ চা নিয়ে বসেছে খানিকটা দূরে।

বিমান হাসতে হাসতে বলল, কাকাবাবু, আপনি চিনতে পারলেন না?

বাংলোর কুকটি বাঙালি। সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, স্যার, এখানে হাঁসের ডিম তো পাওয়াই যায় না। মুরগির ডিম চালান আসে, তাও মাঝে মাঝে কম পড়ে যায়। কিন্তু কচ্ছপের ডিম পাওয়া যায় যথেষ্ট।

কাকাবাবু বললেন, ছি ছি ছি ছি!

বিমান বলল, খেতে কিন্তু খারাপ নয়। আপনারা খেয়ে দেখুন! আমি বলছি ভালো লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি আমাকে কচ্ছপের ডিম চেনাচ্ছ? একসময় কত কচ্ছপের ডিম খেয়েছি। কচ্ছপের মাংস খেয়েছি। এক-একটা কচ্ছপ মারলে তার পেটের মধ্যে চোদ্দো-পনেরোটা ডিমও পাওয়া যেত। এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও। আমরা খাব না।

বিমান বলল, একসময় খেতেন, এখন খাবেন না কেন? আপনার আর সহ্য হয় না? তাহলে সন্তু খেয়ে নিক।

কাকাবাবু বললেন, না, সন্তুও খাবে না। তোমরা জানো না, কচ্ছপ মারা নিষেধ? সারা পৃথিবীতেই কচ্ছপের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পর কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। শুধু শুধু এইভাবে কচ্ছপের ডিম...!

বিমান বলল, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এগুলো তো সেদ্ধই হয়ে গেছে। এগুলো খেয়ে নিন। এগুলো থেকে তো বাচ্চা বেরুবে না!

কাকাবাবু বললেন, তবু খাওয়া উচিত নয়। তুমি যদি ভাব এই ডিমগুলো তো আমি নিয়ে আসিনি, আমি সেদ্ধও করিনি, সুতরাং আমার খেতে দোষ কী? তাহলে অন্য লোক আরও বেশি করে এই ডিম ধরবে, বাজারে এনে বিক্রি করবে। সেইজন্য একদম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। ডিম নিয়ে যাও, আমরা শুধু টোস্ট আর চা খাব। বাংলোর কুকটি বলল, আপনি বললেন, স্যার, কচ্ছপ কমে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু অনেক কচ্ছপ পাওয়া যায়। সমুদ্রে থাকে, কিন্তু ডিম পাড়বার সময় ওপরে উঠে আসে। মাটি খুঁড়ে সামান্য একটু গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে, তারপর আবার মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। লোকেরা সেই মাটি খোঁড়া দেখলেই চিনতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, লোকেরা অমনি সেই ডিমগুলো চুরি করে আনে, তাই তো! এখন যতই কচ্ছপ থাক, এইভাবে নষ্ট হলে একদিন কচ্ছপের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে না? পৃথিবীর কত প্রাণী এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বিমান বলল, কচ্ছপ মারাও যে খুব সোজা। একবার ধরে উলটে দিতে পারলেই হল। ওরা নিজে থেকে সোজা হতে পারে না।

কাকাবাবু বললেন, নিরীহ প্রাণী বলেই একসময় সাহেবরা হাজার হাজার কচ্ছপ মেরে ফেলেছে। ভারত মহাসাগরে অনেক অনেক দ্বীপ ছিল, যেখানে লক্ষ লক্ষ কচ্ছপের বাসা ছিল। এক-একটা দ্বীপে যখন সাহেবদের জাহাজ নেমেছে, তখন খেলার ছলে তারা যত ইচ্ছে কচ্ছপ মেরেছে।

বিমান বলল, সাহেবরা তো সর্বভুক। কচ্ছপের মাংসও নিশ্চয়ই ওরা খায়।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, টারটল সুপ তো অনেকের প্রিয়। কিন্তু শুধু খাবার জন্য নয়। বললাম না, খেলার জন্যও মেরেছে। একদিনে কী হাজার হাজার কচ্ছপ খাওয়া যায়? মজা করার জন্য জাহাজের খালাসিরা কচ্ছপগুলোকে ধরে ধরে উলটে দিত। কে ক-টা পারে তার প্রতিযোগিতা হত। তারপর ওরা জাহাজ নিয়ে চলে যেত। দিনের পর দিন হাজার হাজার কচ্ছপ অসহায়ভাবে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত। দৃশ্যটা ভাব তো! তারপর তারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারা যেত!

সন্তু বলল, ইস!

বিমান বলল, চলুন কাকাবাবু, এবার আমাদের বেরুতে হবে।

কাকাবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং রুম ছেড়ে সবাই চলে এল বাইরে। একটা ঝকঝকে নতুন জিপসি গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। উর্দিপরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

কাকাবাবু জোরে একবার শ্বাস টেনে বললেন, আঃ, এখানকার বাতাস কী পরিষ্কার! চমৎকার টাটকা গন্ধ। এইটুকু রাস্তা আর গাড়িতে গিয়ে কী করব। চলো, হেঁটেই যাই!

বিমান বলল, হাঁটতে অসুবিধে হবে না আপনার?

কাকাবাবু হেসে বললেন, না হে, এই ক্রাচ নিয়ে আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। চলো, চলো! রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। একেবারে লেখার কালির মতন ঘন নীল জল। রয়্যাল ব্লু! খুব কাছেই একটা দ্বীপ। সবুজ গাছপালায় এমন ভর্তি যে এখান থেকে মনে হল এক ইঞ্চিও জায়গা খালি নেই। এমন নিবিড় জঙ্গল কিন্তু সন্তু আর কোথাও দেখেনি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সন্তু এই দ্বিতীয়বার এসেছে আন্দামানে। পোর্টব্লেয়ার শহরটা তার বেশ চেনা লাগছে। মনটা খুব খুশি খুশি লাগছে তার। এখানকার সমুদ্রের জলের সঙ্গে দিঘা কিংবা পুরীর কোনো মিল নেই। তীরের কাছে জল একটুও ঘোলা নয়।

মোটর লঞ্চটাও রেডি হয়ে আছে। ওপরের ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এর মালিক রূপেন মিত্র। কাকাবাবুদের দেখে দু-হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন, মি: রায়চৌধুরি। আমরা ঠিক ন-টার সময় স্টার্ট করব।

লঞ্চটা মাঝারি আকারের। নীচে চারখানা কেবিন, অনায়াসে আটজন লোক শুতে পারে। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও আছে। একসঙ্গে বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানো যায়। রূপেনবাবুদের ঝিনুক আর মাদার অফ পার্ল-এর ব্যাবসা। আন্দমান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি সমুদ্রে ঝিনুকের অন্ত নেই। কতরকম ঝিনুক, মাঝে মাঝে শঙ্খও উঠে আসে। মাদার অফ পার্ল দিয়ে মেয়েদের গয়নার লকেট হয়।

এবার অবশ্য এই লঞ্চে ঝিনুক তুলতে যাওয়া হচ্ছে না।

বিমান একজন বিমান চালক। তার নামের সঙ্গে কাজের খুব মিল। সে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের পাইলট, মাঝে মাঝেই তাকে আন্দামানে আসতে হয়। রূপেন মিত্তিরদের সঙ্গে তার খুব ভাব। বিমানই কাকাবাবুদের এখানে বেড়াতে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওপরের ডেকে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে, সবাই বসল সেখানে। লঞ্চটা বন্দর ছেড়ে ছুটে চলল গভীর সমুদ্রে। পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই অন্য লঞ্চ যাচ্ছে, সেগুলোতে যাত্রী ভর্তি। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলে লঞ্চ ছাড়া উপায় নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন দিকে যাব?

রূপেনবাবু বললেন, আমরা যাব রঙ্গত আইল্যাণ্ডের দিকে। পথে অবশ্য আরও অনেক দ্বীপ পড়বে।

বিমান বলল, এখানে কত যে দ্বীপ! অনেক দ্বীপের কোনো নামই নেই। কাকাবাবু, আপনি তো জানেন, আপনি এদিকটা ভালো করে ঘুরেছেন?

কাকাবাবু দু-দিকে মাথা নাড়লেন।

বিমান আবার বলল, জানেন রূপেনবাবু, একবার কাকাবাবু আর সন্তু একেবারে হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন।

রূপেনবাবু বললেন, তাই নাকি? যে দ্বীপটায় জারোয়া উপজাতি থাকে, আমরা তো সেটা এড়িয়ে চলি। কাছেই যাই না। আপনি গেলেন কী করে? ওরা আপনাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেনি?

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে এক লম্বা গল্প। এখন সেকথা থাক। আচ্ছা রপেনবাবু, আপনি কি নিজের চোখে মারমেড দেখেছেন?

https://boierhut.com/fb

রূপেনবাবু বললেন, না, আমি দেখিনি। আমি লঞ্চে করে এখানকার সমুদ্রে অনেক ঘুরেছি। বড়ো বড়ো তিমি দেখেছি। হাঙরের ঝাঁক তো যখন-তখন দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লাইং ফিশ দেখেছি। ডলফিনও দেখেছি। কিন্তু মারমেড জাতীয় কিছু কখনো আমার চোখে পড়েনি।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিমান যে বলল, আপনি দেখেছেন? মারমেড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো বিমান আমাদের এখানে টেনে আনল।

বিমান বলল, রূপেনবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, সেকথা বলিনি। আমি বলেছি যে রূপেনবাবুর লোকজনেরা দেখেছে!

রূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার লঞ্চের দুজন খালাসি নাকি দেখেছে। মাসখানেক ধরে এখানে একটা গুজব রটেছে যে একটা মারমেড বা জলকন্যাকে নাকি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কোনো নির্জন দ্বীপের ধারে বালির ওপরে মায়া বন্দরের বেশ কয়েকজন লোকই নাকি দেখতে পেয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা বিশ্বাস করেন?

রূপেনবাবু বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। নিজের চোখে তো দেখিনি।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, যারা দেখেছে, তারা মারামেডটিকে কেমন দেখতে বলেছে?

রূপেনবাবু বললেন, ওপরের দিকটা একটা সুন্দরী মেয়ে, লম্বা চুল, ফর্সা রং, টানা-টানা চোখ ; তার তলার দিকটা মাছের মতন। দুটো পা নেই, তার বদলে লেজ যেমন হয়।

কাকাবাবু বললেন, সবাই এইরকমই বলে। কোপেনহ্যাগেন শহরে এইরকম একটি মারমেডের মূর্তিও আছে।

বিমান বলল, সেটা তো বিখ্যাত। আমি দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মূর্তিটা তুমি দেখেছ। কিন্তু আসল মারমেডের এ পর্যন্ত কোনো মানুষ চোখে দেখেনি!

বিমান বলল, অ্যাঁ? কেউ দেখেনি? তবে যে বহুকাল ধরে এত গল্প।

কাকাবাবু বললেন, সবই গল্প, মানুষের কল্পনা, কোনো প্রমাণ নেই। মাঝে মাঝে গুজব ওঠে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ছবি তুলতে পারেনি।

সন্তু বলল, আমি ক্যামেরা এনেছি। সত্যি যদি একটা মারমেড দেখতে পাই, তাহলে পটাপট ছবি তুলব। তাহলে সেটা একটা বিরাট আবিষ্কার হবে, তাই না?

কাকাবাবু বললেন, তা হবে। কিন্তু বেশি আশা করিস না। বেশি আশা করলে বেশি নিরাশ হতে হয়। সমুদ্রে ওরকম কোনো প্রাণী থাকতে পারে না!

বিমান অবিশ্বাসের সুরে বলল, থাকতে পারে না? একথা কী করে বললেন? সমুদ্রে এখনও কতরকম রহস্যময় প্রাণী আছে, মানুষ কী সব জানে?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাকাবাবু বললেন, রহস্যময় প্রাণী থাকতে পারে। কিন্তু যে-প্রাণীর ওপরের দিকটা মানুষের মতন, তার হার্ট আর মাংসও তো মানুষের মতন হবে। সে বেশিক্ষণ জলে ডুবে থাকবে কী করে? তবে, অন্য দুটি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের দেখে অনেকে মানুষ বলে ভুল করে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, মানুষের মতন প্রাণী?

কাকাবাবু বললেন, মোটেই মানুষের মতন নয়। একেবারে জলজন্তু, একটির নাম মানাটি, আর একটির নাম ডুগং! এরা বিরাট বিরাট প্রাণী। এক-একটির ওজন প্রায় এক টন। তিমি মাছ যেমন জলের ওপর মুখ ভাসিয়ে নি:শ্বাস নেয়, তেমনি মানাটি আর ডুগংরাও প্রায়ই জলের ওপর মুখখানা ভাসিয়ে থাকে। বহুকাল ধরেই গভীর সমুদ্রে নাবিকরা এদের দেখেছে। এদের মুখের সঙ্গে মানুষের কিছুটা মিল আছে!

একটু থেমে অনেকখানি চওড়া করে হেসে কাকাবাবু আবার বললেন, মেয়েরা তো জাহাজের নাবিক হয় না। নাবিকরা সবাই পুরুষ। সেই জন্য মানুষের মুখের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন প্রাণী দেখেই নাবিকরা তাকে কোনো মেয়ে বলে মনে করে। সেই থেকেই জলকন্যার কাহিনি চালু হয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ওই মানাটি আর ডুগংদের কেমন দেখতে?

কাকাবাবু বললেন, আমি নিজের চোখে দেখিনি, ছবি দেখেছি। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখে লিখেছেন যে ওদের মুখ বিচ্ছিরি, রাগী বুড়োর মতন। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে অনেকটা বড়ো! এদের তলার দিকটা মাছের মতন। কিন্তু এরা মাছ নয়। ম্যামাল। অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী, শিরদাঁড়া আছে।

বিমান বলল, দুর ছাই!

কাকাবাবু বললেন, আমি মারমেড দেখার আশা করিনি। তবে একটা মানাটি কিংবা ডুগং যদি দেখতে পাই, সেটাই যথেষ্ট। এদিককার সমুদ্রে সাধারণত ওদের দেখা পাওয়া যায় না।

রূপেনবাবু বললেন, আমার খালাসি দুজন কিন্তু জোর দিয়ে বলেছে, ওরা একটা মেয়ের মতন প্রাণীকেই দেখেছে। আমাদের আজ ঠিক দেখাবে।

কাকাবাবু বললেন, ভালো কথা।

এরপর কফি এল। কফি খেতে খেতে ওরা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। নির্জন, সুন্দর সুন্দর দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটা। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ঢেউতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। জল ছিটকে আসছে ওপরের ডেক পর্যন্ত। কাকাবাবু, সন্তু, বিমান তিনজনেই প্যান্ট শার্ট পরা। কিন্তু রূপেনবাবু বনেদি বাঙালিদের মতন পরে আছেন কুঁচোনো ধুতি আর ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি। একবার জলের ছিটেয় তার পাঞ্জাবি অনেকটা ভিজে গেল।

কাকাবাবু একটা বায়নোকুলার এনেছেন। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্যরাও দেখছে।

https://boierhut.com/fb

একসময় সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে, ওই যে!

সবাই চমকে ঘুরে তাকাল।

না, জলকন্যাও নয়, মানাটি কিংবা ডুগং-ও নয়, একঝাঁক উড়ুক্কু মাছ। ফ্লাইং ফিশ। পার্শের মতন সাইজ, দু-পাশে ডানা, মাছগুলো জল থেকে লাফিয়ে উঠে ফর ফর ফর ফর করে বেশ খানিকটা উড়ে আবার জলে ডুব দিল।

কাকাবাবু বললেন, এও তো একটা বেশ ভালো জিনিস দেখলিরে সন্তু!

এরপর আরও তিন ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু দেখা গেল না।

সমুদ্র যতই সুন্দর হোক, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে। লঞ্চের ভট ভট ভট ভট শব্দটাও বিরক্তিকর। যদিও বেশ হাওয়া দিচ্ছে, কিন্তু মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। গরম না-লাগলেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন।

একসময় লঞ্চটা হঠাৎ থেমে গেল।

রূপেনবাবু নীচের একটা কেবিনে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবিটা পালটাতে। ওপরে এসে বললেন, আমার খালাসিরা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কাছেই ওই যে দ্বীপটা দেখছেন, ওর ধারেই নাকি দু-বার দেখা গেছে মারমেডকে। এখানে অপেক্ষা করলে তার দেখা মিলতেও পারে। কিন্তু লঞ্চের শব্দ শুনলেই সে পালাবে। একটা নৌকো করে আমরা ওই দ্বীপটায় যাব।

কাকাবাবু বললেন, চমৎকার আইডিয়া! জলকন্যা কিংবা বিরাট কোনো জলজন্তু দেখা যাক বা না-যাক, নতুন একটা দ্বীপে পিকনিক তো হবে! সেটাই হোক!

বিমান সভয়ে বলল, এই দ্বীপে আবার জারোয়ারা থাকে না তো?

রূপেনবাবু বললেন, না, না। দেখছ না, ছোট্ট দ্বীপ। চারপাশটাই তো দেখা যাচ্ছে। আন্দামানের জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক থাকে না। নির্ভয়ে ঘোরা যায়।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এই দ্বীপটার নাম কী?

রূপেনবাবু বললেন, তা তো জানি না। বোধ হয় কোনো নাম নেই। এখানকার অনেক দ্বীপ শুধু নম্বর দিয়ে চেনানো হয়।

সন্তু বলল, আমি এই দ্বীপটার নাম দিলাম মারমেড আইল্যাণ্ড!

লঞ্চের গায়েই বাঁধা রয়েছে একটা ডিঙি নৌকো। সেটা ভাসানো হল জলে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ছোটো দ্বীপটায়।

দ্বীপটা একেবারে সুন্দর আঁকা একটা ছবির মতন। তীরের কাছে মিহি, সাদা বালি ছড়ানো। তারপর নানান রঙের নুড়ি পাথর। তারপর গাছপালা। তবে এখানকার জঙ্গল খুব ঘন নয়। বোধ হয় কখনো কখনো সমুদ্র ফুলে উঠে পুরো দ্বীপটা ডুবিয়ে দেয়। ঘাস কিংবা ঝোপঝাড় কিছুই নেই। বড়ো বড়ো গাছ আর মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তীর থেকে খানিকটা ভেতরে চলে এসে সন্তু দেখতে পেল গোল মতন পাথরের ঢিবি। জুতো খুলে সন্তু তরতর করে সেটার ওপরে উঠে গেল।

তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, এই জায়গাটায় সবাই মিলে বসলে খুব ভালো হয়। এখান থেকে সবদিকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে!

কাকাবাবু পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বেশ পেছল! আমি আর খোঁড়া পা নিয়ে ওপরে উঠব না।

বিমানও জুতো খুলে উঠে গেল ওপরে। ঢিবিটা একতলা সমান উঁচু। এখানে খুব বড়ো গাছ নেই বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিমান বলল, বা:, এরকম জায়গায় একটা বাড়ি বানাতে পারলে গ্র্যাণ্ড হত। বেশ নিজের একটা জায়গা। তাতে একটাই বাড়ি থাকবে।

কাকাবাবু বললেন, আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে দ্বীপের চারপাশটা একবার ঘুরে আসি!

কাকাবাবু আড়ালে চলে যেতেই বিমান একটা সিগারেট ধরাল। কাকাবাবুর সামনে সে সিগারেট খায় না কক্ষনো।

ছোটো নৌকোটা লঞ্চের দিকে ফিরে যাচ্ছে খাবার-দাবার আনতে। লঞ্চটা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে, এখন ভাসতে ভাসতে এদিকেই যেন সরে আসছে।

সন্তু আর বিমান গল্প করছে, হঠাৎ চমকে উঠল দুজনেই। পাথরটা একবার কেঁপে উঠল না? মাটি কাঁপছে?

ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোনো কথা বলবার আগেই আবার পাথরটা কেঁপে উঠল বেশ জোরে।

এবার বিমান চিৎকার করে উঠল, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

সন্তুও সড়াৎ করে পাথরটা থেকে গড়িয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু, সাবধান! ভূমিকম্প হচ্ছে!

সন্তুর ধারণা হল, ভূমিকম্পে দ্বীপটার মাঝখানটা ফেটে দু-ভাগ হয়ে যাবে, তারপর সবসুদ্ধ ডুবে যাবে সমুদ্রে।

ওদের কাছে এসে বললেন, কী হয়েছে? কোথায় ভূমিকম্প? আমি তো কিছু টের পেলাম না।

রূপেনবাবু এসে বললেন, আমিও তো বুঝতে পারিনি।

বিমান বলল, পাথরটা দু-বার জোরে কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে সন্তু চোখ বড়ো বড়ো করে সাংঘাতিক বিস্ময়ে বলল, এ-কী! এ-কী!

ওদের চোখের সামনে পাথরের ঢিবিটা দুলতে শুরু করেছে। আর একটু একটু এগোচ্ছে। ঠিক জীবন্ত কোনো প্রাণীর মতন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাথরের ঢিবির মতন প্রাণীটা কিন্তু একটু একটু নড়তে লাগল শুধু...

ভয় পেয়ে সবাই ছিটকে দূরে সরে গেল।

বিমান বলল, ওরে বাপরে, এটা কোনো বিরাট জন্তু?

রূপেনবাবু এক দৌড় মেরে জলের ধারে গিয়ে তাঁর খালাসিদের ডেকে বলতে লাগলেন, ওরে রঘু, ওরে রতন, মানসিং, শিগগির লঞ্চটা নিয়ে আয়। প্রকান্ড জানোয়ার! মেরে ফেলবে।

পাথরের ঢিবির মতন প্রাণীটা কিন্তু একটু একটু নড়তে লাগল শুধু। ওদের দিকে তেড়ে এল না।

কাকাবাবু সাহস করে একটু এগিয়ে এসে একটি ক্রাচ দিয়ে পাথরটার গায়ে একটু ঘষে দিলেন। সেটার ওপরে শ্যাওলা জমে আছে, একটুখানি খসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এটা তো মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ!

কাকাবাবু প্রাণীটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। বেশি খুঁজতে হল না। একটা গাছের আড়াল থেকে ঝটাং করে বেরিয়ে এল তার গলা আর মুখ। হাতির শুঁড়ের মতন মোটা। ক্রিকেট বলের সাইজের দুটো চোখ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

https://boierhut.com/fb

কাকাবাবু তবু ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, মুখটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা কচ্ছপ। সমুদ্রে অনেক বড়ো বড়ো কচ্ছপ থাকে বটে, কিন্তু এত বড়ো কচ্ছপ যে হতে পারে, তা কখনো শুনিনি!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আর এগোবেন না!

কাকাবাবু বললেন, কচ্ছপ যখন, তখন ভয়ের কিছু নেই। এরা নিরীহ প্রাণী, মানুষের দিকে তেড়ে এসে কামড়ায় না।

এর মধ্যে রূপেনবাবুর চেঁচামেচি শুনে লঞ্চটা হুইসল দিতে দিতে চলে এল এদিকে। লাঠি, লোহার রড নিয়ে নেমে এল ছ-সাতজন খালাসি। হই-হই করে কাছে এসে বলল, কোনো জানোয়ার? কোথায়? কোথায়?

এত বড়ো একটা কচ্ছপ দেখে তাদেরও চক্ষু ছানাবড়া। একজন বলল, একটা পাহাড়ের মতন কচ্ছপ? স্বপ্ন দেখছি না তো?

আর একজন বলল, এটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে!

রূপেনবাবুও এখন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি এবার খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাকে পোর্টব্লেয়ার নিয়ে যাব। তারপর কলকাতায় নিয়ে যাব। এরকম কচ্ছপ কেউ কখনো দেখেনি। তারপর বিলেত-আমেরিকায় পাঠাব। এটাকে উলটে দাও। উলটে পাগুলো বাঁধো।

কিন্তু এত বিরাট কচ্ছপকে উলটে দেওয়া সহজ নাকি? কচ্ছপটা তার মুন্ডুটা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে।

একজন বলল, সাবধান। কচ্ছপের মুখের কাছে গেলে কামড়ে দেবে। হাত কিংবা পা কামড়ে ধরলে মেঘ না-ডাকলে ছাড়ে না। ওর মুখটাকে আগে আটকাতে হবে!

একজন একটা লোহার রড বাড়িয়ে দিল কচ্ছপটার মুখের কাছে। কচ্ছপটা সেটা সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরে দুটো ঝটকা মারতেই রডটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল।

রূপেনবাবু দূর থেকেই এক লাফ দিয়ে বললেন, বাপরে! দাঁতের কী জোর!

রঘু নামের একজন খালাসি বলল, স্যার, আমি কচ্ছপ ধরার কায়দা জানি। একটা শক্ত নাইলনের দড়ি চাই।

একজন দড়ি আনতে ছুটে গেল। অন্য সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত বড়ো চেহারা নিয়েও কচ্ছপটা বোধ হয় বেশ ভীতু প্রাণী। সে দৌড়ে পালাবারও চেষ্টা করল না, কারুকে তেড়ে কামড়াতেও এল না।

রঘু নাইলনের দড়িটা পেয়ে একটা ফাঁসি তৈরি করল। তারপর সেটা ছুড়ে দিল কচ্ছপটার মুখের দিকে। দু-তিন বারের চেষ্টায় ফাঁসটা জড়িয়ে গেল তার গলায়। দুজন খালাসি দু-দিক থেকে টান মারতেই সেটা আঁট হয়ে গেল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ দুটো দিয়ে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সন্তু বলল, কচ্ছপটা বোধ হয় খুব বড়ো।

কাকাবাবু বললেন, শুনেছি ওরা বহুদিন বাঁচে। এর বয়েস কয়েক-শো বছর হলেও আশ্চর্য কিছু নেই।

রঘু বলল, এবার সবাই মিলে হাত লাগিয়ে ওকে উলটে দিতে হবে।

সবাই কাছে এসে হাত লাগাবার আগেই কচ্ছপটার পিঠটা কেঁপে উঠল কয়েকবার। ওর পিঠে কিছু কিছু মাটির চাপড়া ছিল, তা খসে গেল। তখন দেখা গেল, তার পিঠে অনেক হিজিবিজি দাগ।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, দেখুন দেখুন এই দাগগুলো। মনে হচ্ছে এক জায়গায় বাংলা অ লেখা আছে।

বিমান, রূপেনবাবুরাও ঝুঁকে এসেছেন দেখতে। বিমান বলল, তার পাশেই তো র। কেউ যেন লিখেছে 'আর'।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে কচ্ছপটার পিঠটা খুব ভালো করে ঘষলেন! অনেক ময়লা সরে গেল। এবার ফুটে উঠল আরও অক্ষর। 'আর'-এর একটু পরেই 'মা'।

সন্তু বলল, তারপর এটা কী? এ? মা এ?

কাকাবাবু বললেন, এ নয়, ত-য়ে র-ফলা। মাত্র। তাহলে হল, 'আর মাত্র'।

কাকাবাবু গভীর বিস্ময়ে কচ্ছপের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর অভিভূতভাবে বললেন, প্রকৃতি লিখে দিয়েছে! কিংবা মহাকালও বলতে পারেন। প্রবাদ আছে, 'মহাকূর্ম অর্থাৎ বড়ো কোনো কচ্ছপের পিঠে মহাকাল তার ইতিহাস লিখে রাখে!

সন্তু বলল, আরও কিছু লেখা আছে!

কাকাবাবু বললেন, আমি সবটা পড়তে পেরেছি। এই দ্যাখ ভালো করে। 'আর মাত্র দু-টি। মেরো না, মেরো না, মেরো না!'

সন্তু বলল, হ্যাঁ, স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রকৃতি লিখে দিয়েছে যে পৃথিবীতে এরকম কচ্ছপ মাত্র দুটো বেঁচে আছে।

বিমান বলল, কী বলছিস! প্রকৃতি কিংবা মহাকাল বাংলায় লিখবে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, মহাকাল কখন কোন ভাষায় লেখেন, তার তুমি-আমি কী জানি! কথাগুলো যে লেখা রয়েছে, তা তো সত্যি। কচ্ছপটা নিজেই পিঠ ঝাঁকিয়ে তা আমাদের দেখাল।

তারপর হঠাৎ কাকাবাবু হাত জোড় করে আবেগের সঙ্গে খালাসিদের বললেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, ওকে ছেড়ে দিন। বন্দি অবস্থায় যদি ও মরে যায়, তাহলে পৃথিবী থেকে এই কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের ধ্বংস করার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

খালাসিরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

https://boierhut.com/fb

রূপেনবাবু বললেন, ওরে বাপরে বাপ! জন্মে কখনো এমন দেখিনি। ভগবান নিজে লিখে দিয়েছেন 'ওকে মেরো না'! ওকে বন্দি করলে আমাদের মহাপাপ হবে! ইনি সাক্ষাৎ কূর্ম অবতার। ওকে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, শিগগির ছেড়ে দে!

খালাসিরা এবার ফাঁস খুলে নিল ওর গলা থেকে। কাকাবাবু দূরে সরে যেতে বললেন। সকলে সার বেঁধে কচ্ছপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

কচ্ছপ এবার থপথপ করে এগোতে লাগল জলের দিকে।

রূপেনবাবু হাত জোড় করে বললেন, জয় বাবা কূর্ম অবতার! আমাদের দোষ নিয়ো না!

তাঁর দেখাদেখি অন্য খালাসিরাও নমস্কার করল।

কচ্ছপটা জলের কাছাকাছি গিয়ে একবার মুখটা ফিরিয়ে ওদের দেখল। তারপর প্রবল আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেল নীল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে।

https://boierhut.com/fb

ছোটোমাসির বাড়ির ছাদে দারুণ এক পিকনিক হল লক্ষ্মীপুজোর রাত্তিরে। প্রত্যেক বছরই হয় এরকম, তবে এবছর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের ছোটোমামা আসায় আরও জমে গিয়েছিল। ছোটোমামা গল্প করতে পারেন।

ছোটোমাসির বাড়ির ছাদটা প্রকান্ড। তার একটা কোণ তেরপল দিয়ে একটুখানি ঘিরে দিয়ে সেখানে পাতা হয় ইটের উনুন। আর ছাদের অন্যদিকে শতরঞ্চি পেতে হারমোনিয়াম নিয়ে গান-বাজনা আর আড্ডা। সে-রাতে কিন্তু কোনো আলো জ্বালা হয় না। কোজাগরী পূর্ণিমার এমন জ্যোৎস্না থাকে যে তখন অন্য কোনো আলো জ্বাললেই বিচ্ছিরি দেখায়। আর সেইজন্যই তো ছাদে পিকনিক। প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ জন এসেছিল সেই পিকনিকে। ছোটোমাসির দুই মেয়ে হাসি আর খুশির সাত-আট জন বন্ধু। ওদের ভাই বাবলুর চার-পাঁচ জন বন্ধু। বড়োমাসি আর সেজোমাসির ছেলেমেয়েরা। অর্থাৎ ছোটোরাই বেশি। ছোটোমাসি আর ছোটোমামার চেনাশুনো কয়েকজন এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে আমি চিনতাম না আগে।

দু-তিন জন কাজের লোকের সাহায্য নিয়ে রান্নার দিকটা সামলাচ্ছেন আমাদের বড়োমাসি। তাঁর হাতের রান্না চিংড়িমাছের মালাইকারি যে একবার খেয়েছে সে আর জীবনে ভুলবে না।

ওদিক থেকে রান্নার চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে, আর এপাশে জমে উঠেছে আনন্দেরআড্ডা।

প্রথমে হাসি আর খুশি আর তার বন্ধুরা কয়েকখানা গান শোনাল কোরাসে। ছোটোমামার এক বন্ধু সুজিতবাবু ম্যাজিক দেখালেন কয়েকটা। অদ্ভুত ম্যাজিক জানেন তিনি। একেবারে খালি হাত, কেনো যন্ত্রপাতি নেই, এক জায়গায় বসে বসে তিনি অত্যাশ্চর্য কান্ড দেখাতে লাগলেন। রান্নার জায়গা থেকে দুটো ডিম আনতে বলে তিনি সেই ডিম দুটো তার সামনে রেখে রুমালে ঢেকে দিলেন। একটু বাদেই রুমাল তুলে নিতেই দেখা গেল ডিমের বদলে সেখানে রয়েছে একদম বাচ্চা দুটো মুরগির ছানা। আবার সে দুটোকে রুমাল ঢেকে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন এখানে কী আছে?'

আমরা সবাই বললাম, 'মুরগির ছানা।'

উনি বললেন, 'ঠিক? আচ্ছা, তোমদের মধ্যে যেকোনো একজন রুমালটা তোলো।'

খুশি রুমালটা তুলেই বলে উঠল, 'ওমা!'

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম মুরগির ছানা নেই, সেখানে ডিম দুটো আবার ফিরে এসেছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আরও কত সব চমকানো খেলা। তার মধ্যে আর একটা খেলাতে আমি খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম।

একটা দশ টাকার নোট অনেকগুলো ভাঁজ করে সুজিতবাবু ওপর দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'যা:!'

নোটটা আর নীচে পড়ল না। কী যে হল আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'টাকাটা কোথায় গেল? একেবারে উড়িয়ে দিলেন।'

সুজিতবাবু আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? তুমি তো টাকাটা নিলে! ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখো—'

সত্যিই আমার পকেটে সেই ভাঁজ-করা দশ টাকার নোটটা। সবাই হাসতে লাগল আমার দিকে চেয়ে।

আমি সুজিতবাবুর থেকে অনেকটা দূরে বসেছিলাম। তবু ওই টাকাটা আমার পকেটে গেল কী করে? ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি?

ম্যাজিকের পর হল ধাঁধা, তারপর মেমারি গেম, তারপর আবার গান। শেষকালে ছোটোমামা যেই অস্ট্রেলিয়ার গল্প শুরু করেছেন, অমনি বড়োমাসিমা এসে তাড়া দিলেন, এবার খেতে বসো সবাই, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খাবার! তা ছাড়া একটু বাদে মাথায় হিম পড়বে!

খবরের কাগজ পেতে বসা আর কলাপাতায় খাওয়া। এক ব্যাচে হল না, দু-ব্যাচে। ভাত, নারকেল দিয়ে রান্না মটর ডাল, বেগুনভাজা, ডিমভাজা, আর চিংড়িমাছের মালাইকারি। কী অপূর্ব যে খেতে লাগল কী বলব! খেতে খেতে সিদ্ধার্থ নামের একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল থ্রি চিয়ার্স ফর বড়োমাসি...হিপ...হিপ...। সবাই বলল হুররে! তারপর ছেটোমাসির নামেও থ্রি চিয়ার্স দেওয়া হল।

প্রথম ব্যাচ খাওয়া শেষ হবার পর দ্বিতীয় ব্যাচ সবেমাত্র বসেছে, আমার ওপর পড়েছে পরিবেশন করার ভার, এই সময় একটা কান্ড হল।

কোথা থেকে ছাদে উঠে এল একটা কুকুর।

রাস্তার নেড়িকুত্তা নয়, বড়ো বড়ো লোমওয়ালা একটা সাদা কুকুর, অনেকটা জার্মান স্পিতস ধরনের। কুকুরটা ছাদে এসেই দারুণ জোরে দৌড়োতে লাগল, এদিক-ওদিক। সবাই 'একী একী' বলে উঠে দাঁড়াল।

ছোটোমাসির সাংঘাতিক কুকুরের ভয়। যত ছোটো কুকুরই হোক না। ছোটোমাসি একদম কুকুর সহ্য করতে পারেন না। ছোটোমাসি উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় নাচের মতন তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওমা, একী! একী! এটা কোথা থেকে এলরে!'

ছোটোমাসির মেয়েরা কিন্তু কুকুরকে ভয় করে না। হাসিই ধরে ফেলল কুকুরটাকে। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বলল, 'বা:, কী সুন্দর কুকুরটা! কাদের এটা?'

এ বাড়িতে কুকুর নেই। সত্যি, কোথা থেকে এল?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছাদের কার্নিশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখা গেল যে রাস্তায় একজন বুড়োমতন লোক একটা চেন হাতে নিয়ে এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। কুকুরটা নিশ্চয়ই ওঁরই। কোনোরকমে চেন ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে। একজন নীচে গিয়ে কুকুরটা ফেরত দিয়ে এল।

যাক, বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। কুকুরটা দুটো কলাপাতা মাড়িয়ে দিয়েছিল। সে দুটো বদলে দিয়ে আবার খেতে বসল দ্বিতীয় ব্যাচ।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ছোটোরা প্রায় সবাই চলে গেল। বড়োরাও গেছে অনেকে। আমরা সাত-আট জন তখনও বসে ছোটোমামার ক্যাঙারু ধরার গল্প শুনছি, এমন সময় হঠাৎ ছোটোমাসি বলে উঠলেন, 'একী, আমার নাকছাবি?'

ছোটোমাসি সেদিন নাকে একটা সুন্দর হিরের নাকছাবি পরেছিলেন, আমরা সবাই লক্ষ করেছি। এখন সেটা নাকে নেই।

ছোটোমামা বললেন, 'নিশ্চয়ই এখানে কোথাও খুলে পড়েছে, খুঁজে দেখ!'

বড়োমাসি বললেন, 'কুকুরটা দেখে তুই যেমন তিড়িংবিড়িং করে লাফালি তাতে নাকছাবি খুলে পড়বে, সেটা আর আশ্চর্য কী!'

এবার আর জ্যোৎস্নার আলোর ওপর ভরসা করা যায় না। খুশি দৌড়ে নীচ থেকে নিয়ে এল টর্চ। ছোটোমাসি যেখানে বসেছিলেন খুঁজে দেখা হল। হিরের নাকছাবি সেখানে নেই।

তখন আরও টর্চ আনা হল, জ্বেলে দেওয়া হল ছাদের আলো। সবাই মিলে আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু সেটা পাওয়া গেল না।

ছোটোমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই এর মধ্যে নীচে গিয়েছিলি? মনে করে দেখ তো!'

ছোটোমাসির স্বভাব খুব ছটফটে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না। আমি যতবারই এ বাড়িতে এসেছি, ততবারই দেখেছি যে ছোটোমাসি চটি পায়ে দিয়ে ফটফটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারাবাড়ি। ছোটোমাসির দারুণ স্বাস্থ্যবাতিক। কিছু একটাতে হাত দিলেই অমনি হাত ধোয়া চাই। তাঁর চটিও অনেকগুলো! রান্নাঘরের চটি, শোবার ঘরের চটি, ছাদের চটি—সব আলাদা আলাদা।

কিন্তু আজ ছোটোমাসি অন্তত দু-ঘন্টার মধ্যে নীচে যাননি, সবাই বলল। হাত ধুয়েছেন মোটে তিন বার। ছাদেই একটা কল আছে, সেখানে। তবে কী হাত ধোয়ার সময় নর্দমা দিয়ে জিনিসটা চলে গেল? সেখানটায় খোঁজা হল ভালো করে। নর্দমার ঝাঁঝরিতে শ্যাওলা জমে আছে, জল যাচ্ছে আস্তে আস্তে, সেখান দিয়ে একটা নাকছাবি চলে যাবে, এমন বিশ্বাস হয় না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...কিন্তু যখন কুকুরটাকে দেখে আপনি নাচলেন, তখন আপনার নাকে নাকছাবি ছিল না...

ম্যাজিশিয়ান সুজিতবাবু বললেন, 'কিন্তু যখন কুকুরটাকে দেখে আপনি নাচলেন, তখন আপনার নাকে নাকছাবি ছিল না। আমি লক্ষ করেছি। আমার একটু খটকা লেগেছিল, কিন্তু ভেবেছিলাম, আপনি নিজেই খুলে রেখেছেন।'

হাসি আর খুশি বলল, 'কিন্তু মা, মেমারি গেমের সময় যখন তুমি হেরে গিয়ে খুব হাসছিলে, তখন তোমার নাকে ওটা চকচক করছিল, আমরা দেখেছি। তারপর তো আর নীচে যাওনি।'

ছোটোমাসি হঠাৎ বড়ো বড়ো চোখ মেলে সুজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ওটা লুকিয়ে রেখেছেন, তাই না।'

সুজিতবাবু বললেন, 'আরে না, না! ওরকম প্র্যাকটিক্যাল জোক আমি করি না।'

সবাই মিলে সুজিতবাবুকে চেপে ধরা হল, তিনি বারবার ওই কথাই বলতে লাগলেন।

তখন ছোটোমাসি বললেন, 'আপনি ম্যাজিক জানেন, আপনি ওটা খুঁজে বার করে দিন। জিনিসটা আমার খুব প্রিয়...।'

সুজিতবাবু বললেন, 'সে ক্ষমতা আমার নেই। সবাই যেমন খুঁজছে, কিন্তু পেলাম না তো।'

এঁটো কলাপাতাগুলো বাইরে ফেলা হয়নি, ছাদের এককোণে জড়ো করা ছিল, তার প্রতেকটি আবার উলটে-পালটে ভালো করে দেখা হল। খবরের কাগজ, শতরঞ্চি—কিছুই দেখা বাদ রইল না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছাদের নর্দমাটার ঝাঁঝরি খুলে, সেখানে এক বালতি জল ঢেলে নীচে যেখানে জলটা পড়ে সেখানেও দেখা হল সবাই মিলে। নাকছাবিটা নেই।

রাত বারোটার সময় ছোটোমেসোমশাই বললেন, 'যাক, আর খোঁজবার দরকার নেই, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

পরদিন সকালেই আমি এলাম আবার ছোটোমাসির বাড়িতে, ছোটোমাসির মুখে একটা কান্না কান্না ভাব। নাকছাবির হিরেটার দাম দু-হাজার টাকার বেশি। শুধু সেজন্য নয়, ওটা ছোটোমাসিকে দিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি, সেইজন্যই ওটার একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাই ছোটোমাসি ওটার দুঃখ ভুলতে পারছেন না।

আমি বললাম, 'ছোটোমাসি, পুলিশে খবর দেবে নাকি?'

ছোটোমাসি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'না, থাক। সবাই চেনাশুনো...'

অর্থাৎ পিকনিকে যারা এসেছিল, তারা সবাই চেনাশুনো, তাদের মধ্যে যদি কেউ নিয়ে থাকে কিংবা ইচ্ছে করে লুকিয়েও রাখে, তাহলেও তাদের কাছে পুলিশ গিয়ে ঝামেলা করবে, এটা ঠিক নয়।

একটু বাদেই এসে হাজির হলেন ছোটোমামা।

তিনি বললেন, 'আমি কাল রাত্তিরে অনেক ভাবলাম, বুঝলি? কে নিতে পারে? ছোটোরা কেউ নেবে না, তারা বাদ!'

আমি বললাম, 'কেন? ছোটোরা কেউ নিতে পারে না কেন? ছোটোরা বুঝি সবাই সাধু?'

ছোটোমামা বললেন, 'ছোটোরা অন্য কোনো জিনিস হলেও নিতে পারত। কিন্তু একটা নাকছাবি নিয়ে কী করবে? কোনো বাচ্চা মেয়ে আজকাল নাকছাবি পরে না। আর ছোটো ছেলেরা কেউ পেলে তক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে কৃতিত্ব নিত। যাইহোক, বড়োদের মধ্যে রইলাম আমরা সাত-আট জন। তোর সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় কাকে বল তো?'

আমি বললাম, 'যাই বলো, ছোটোমামা, ম্যাজিশিয়ান সুজিতবাবুকেই আমার সন্দেহ হয়।'

ছোটোমামা হাসতে হাসতে বললেন, 'আর ওই সুজিত আমায় সকালে টেলিফোনে কী বলল? সুজিত বলল, তার সন্দেহ হয় তোকে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ!'

ছোটোমাসি বললেন, 'নীলুকে সন্দেহ? তুমি কী যা-তা বলছ ছোড়দা?'

ছোটোমামা বললেন, 'বা:, নীলুর পকেট থেকে সেই দশ টাকার নোটটা পাওয়া গিয়েছিল না।'

আমি বললাম, 'ছোটোমামা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। তোমার ওই বন্ধুকে সাবধান করে দিয়ো! ওসব ম্যাজিশিয়ান-ফ্যাজিশিয়ানদের আমি গ্রাহ্য করি না!'

https://boierhut.com/fb

ছোটোমামা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, 'তুই অত রাগছিস কেন? ও কী সত্যি তোর নামে দোষ দিয়েছে নাকি? আমি এমনি বানিয়ে বললাম! ওই সুজিত কিন্তু শুধু ম্যাজিশিয়ান নয়। ও একজন বড়ো ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিক দেখানো ওর শখ। ও কেন একটা হিরের নাকছাবি নিতে যাবে? সুজিত সত্যি সত্যি আমাকে আজ সকালে যা বলল টেলিফোনে, তা শুনবি?'

'শুনি।'

'তার আগে দেখা যাক, আর কে কে নিতে পারে। নীলু নেয়নি। বড়দি-মেজদিদির তো কথাই ওঠে না। তোর বরই বা নেবে কেন? রতন আর প্রিয়ব্রত আগে আগে খেয়ে চলে গেছে, তারপর মেমারি গেম হয়েছিল। সুতরাং ওরাও নিতে পারে না। তাহলে বাকি রইল ওই সাদা কুকুরটা!'

ছোটোমাসি বলল, 'একটি কুকুর নাকছাবি নিয়ে যাবে? যত সব পাগলের মতন কথা!'

ছোটোমামা বললেন, 'কুকুরটা নেবে না বলছিস? তাহলে আর বাকি রইলি তুই! সুজিতও সেই কথাই বলেছে। তোর নাকছাবি তুই চুরি করেছিস।'

ছোটোমাসি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আমি করব আমার নিজের জিনিস চুরি! ভদ্রলোক গাঁজা খান বুঝি?'

'তুই ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারিস!'

'আমার আর খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই? শোনো ছোড়দা, তোমার ওই ম্যাজিক-দেখানো বন্ধু যেন আর কোনোদিন আমাদের এ বাড়িতে না-ঢোকে! তাহলে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেব!'

'আহা, অত চটে যাচ্ছিস কেন? তুই লুকোসনি তাহলে, এই তো? তাহলে অন্য কেউ- না-কেউ লুকিয়েছে। দেখিস, দু-এক দিনের মধ্যেই ফেরত দিয়ে যাবে।'

এরপর সাত দিন কেটে গেল। কেউ সেই নাকছাবি ফেরত দিল না। দিনের আলোয় ছাদটা খুঁজে দেখা হল অনেকবার। সেটা যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তার পরের সাত দিনেও কেউ ফেরত দিল না। তার পরের সাত দিনেও না। অনেকে ব্যাপারটা ভুলেই গেল।

মাসখানেক বাদে একদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ছোটোমাসির হঠাৎ খুব রাগ হল। মনে পড়ে গেল সেই ম্যাজিশিয়ান সুজিতবাবুর কথা। লোকটা কেন বলল, আমার জিনিস আমি নিজেই লুকিয়ে রেখেছি? ও কী বলতে চায়? মনের ভুলে ওটা খুলে আমি কোথাও রাখব?

ধড়মড় করে উঠে পড়ে ছোটোমাসি আলমারি খুললেন। যেখানে গহনা থাকে সেখানটায় খুঁজে দেখলেন আবার। আগেও অনেকবার দেখেছেন। সেখানে থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া হাসি আর খুশি জোর দিয়ে বলেছে ওটা মেমারি গেমের সময় মায়ের নাকে দেখেছিল। তারপর ছোটোমাসি আর নীচে নামেননি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাহলে কী মনের ভুলে ছাদেই কোথাও ওটা রেখে দিয়েছেন? তা-ও তো অসম্ভব। সারাছাদ কতবার দেখা হয়েছে তার ঠিক নেই!

মনটা খারাপ হয়ে গেল ছোটোমাসির। তার ঘুম আসছে না। তিনি একা একা উঠে এলেন ছাদে।

আজ উঠেছে সুন্দর জ্যোৎস্না। এখন অনেক রাত। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একা একা ছাদে ঘুরতে ছোটোমাসির বেশ ভালোই লাগছে।

হঠাৎ এই সময় ভূতে ধাক্কা মারল তাঁকে।

'ওগো, মাগো' বলে চিৎকার করে দড়াম শব্দে পড়ে গেলেন ছোটোমাসি। ভাবলেন, বুঝি ভূতে তাঁর গলা টিপে মেরে ফেলবে।

কিন্তু আর কিছুই হল না। ছোটোমাসির চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি। পা থেকে একপাটি রবারের চটি ছিটকে গেছে দূরে। আস্তে আস্তে উঠে বসতেই একটা ঝকঝকে জিনিসে তাঁর চোখ আটকে গেল। জিনিসটা পড়ে আছে তাঁর পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতেই দেখলেন, সেই হিরের নাকছাবি!

তবে কী ভূত এসে এক মাস বাদে এই নাকছাবিটা উপহার দিয়ে গেল?

কী করে ছোটোমাসি ওইভাবে রাত্তিরবেলা হিরের নাকছাবিটা ফিরে পেলেন, সেটা যদি আমি না বলে দিই, তোমরা পাঠক-পাঠিকারা পারবে সেই রহস্যের সমাধান করতে?

একটু ভেবে দেখো।

ছোটোমাসির হিরের নাকছাবিটা কোনো একসময় খুলে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের রবারের চটিতে গেঁথে গিয়েছিল। সেইজন্য সবই খুঁজে দেখা হয়েছে, শুধু নিজের পায়ের চটি উলটে দেখা হয়নি। ছাদের চটি যেহেতু আলাদা, তাই ওটা ছাদেই সিঁড়ির পাশে রাখা থাকে, সব সময় ব্যবহার করা হয় না। একলা ছাদে এসে ঘুরবার সময় হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই চটির তলা থেকে হিরের নাকছাবিটা খুলে বেরিয়ে আসে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কেউ আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ আমি কী করে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব?

ব্যাপারটা একটা বাড়ি নিয়ে।

এই বাড়িটা আমি প্রথম যখন দেখি, তখন আমার বয়েস ছিল বারো। বয়েজ স্কাউট থেকে আমরা ক্যাম্প করতে গিয়েছিলাম গঙ্গানগরে। তিন দিন ধরে দারুণ হইচই হয়েছিল সেখানে।

তারই মধ্যে একদিন বিকেলবেলা ছিল আমাদের 'যে-দিকে খুশি যাও' প্রোগ্রাম। সবাইকে একা একা আলাদা যেকোনো দিকে চলে যেতে হবে, ফিরতে হবে ঠিক দু-ঘন্টা পরে। দু-ঘন্টা পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি হলেই শাস্তি। আর ফিরে এসে সেদিন রাত্তিরের ক্যাম্প ফায়ারে বলতে হবে সেদিনের অভিজ্ঞতা।

অনেকে বানিয়ে কতরকম গল্পই যে বলেছে। একজন নাকি গঙ্গানগরের কাছেই বাঘের পাল্লায় পড়েছিল। একজন দেখেছিল একটা পাইথন। দুজন পড়েছিল ডাকাতের পাল্লায়। গুলতাপ্পি মারার ব্যাপারে কোনো নিষেধ ছিল না। একজনের গল্প শুনতে শুনতে আমরা হাসতে হাসতে খুন।

আমার অবশ্য ওরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। বানাতেও হয়নি। আমি দেখেছিলাম একটা দারুণ বাড়ি। ওরকম জমকালো বাড়ি আমি আগে কখনো দেখিনি।

গঙ্গানগর ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আমি একলা হাঁটা দিলাম অনেকক্ষণ। সঙ্গে ঘড়ি নেই, ঠিক দু-ঘণ্টার মধ্যে ফিরতে হবে, সেই চিন্তা সবসময় মাথার মধ্যে।

হাঁটতে হাঁটতে মনে হল রাস্তার পাশে একটা জঙ্গল। ঢুকে পড়েছিলুম সেই জঙ্গলের মধ্যে।

সেটা আসলে একটা বাগান। খুব বড়ো বড়ো আম, জাম, কাঁঠালের গাছ। বাগানটার মধ্যে খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল সেই বাড়িটা।

সেই বারো বছর বয়েসে আমার মনে হয়েছিল ঠিক যেন একটা রূপকথার বাড়ি দেখছি। রূপকথা কিংবা ইতিহাসের। বাড়িটা ঠিক একটা দুর্গের মতন। তাও আমাদের দেশে ওরকম দুর্গ হয় না। ছবির বইতে কিংবা ইউরোপের অন্য দেশে ওরকম ছোটো ছোটো দুর্গের ছবি দেখেছি।

সামনে একটা দু-মানুষ উঁচু লোহার গেট। তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন বন্দুকধারী পাহারাদার। গেটের দু-পাশে দুটো আর লম্বা গম্বুজ, তাদের মাথায় একটা করে বড়ো ঘড়ি। ঘড়ি দুটো চলছে।

প্রথমেই ঘড়ি দুটো দেখে আমার খুব ভালো লাগল। এরকম জঙ্গলের মধ্যে এসে যে ঘড়ি দেখতে পাব, তা আশাই করিনি। তাহলে আমার ঠিক সময় ফেরার কোনো অসুবিধে হবে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গেটের সামনে দাঁড়াতেই একজন প্রহরী জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া-মাংতা'?

আমি বললুম, কুছ নেই, দেখতা হ্যায়।

প্রহরী দুজন খুব রাগী নয়। বেশ হাসিখুশি মুখ। আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য জিজ্ঞেস করল, নাম কেয়া? কাঁহাসে আতা হ্যায়?

সব উত্তর দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, ভেতরে একটু যেতে পারি?

—কাহে?

—ভিতর ঘুমকে দেখে গা।

প্রহরী দুজন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল একটু। তারপর একজন ঘাড় নেড়ে বলল, নেহি, হুকুম নেহি!

তাতে আমি খুব একটা দুঃখিত হইনি। হুকুম নেই যখন, তখন আর কী করা যাবে।

প্রহরীদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলুম কিছুক্ষণ। ভেতরে কী কী আছে জিজ্ঞেস করলুম। তাতে জানতে পারলুম যে, ওটা একটা জমিদারের বাড়ি। স্কটল্যাণ্ডের একটা দুর্গের অনুকরণে বাড়িটা বানানো হয়েছে, সাহেব মিস্তিরিরা বানিয়েছে।

বাড়িটার পেছনে একটা পুকুর আছে, সেটার চারপাশ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখানে নাকি এত মাছ আছে যে হাত দিলেই ধরা পড়ে। বাড়ির মধ্যে আছে অনেক ভালো ভালো মূর্তি। আর দু-খানা ঘরে ভর্তি আছে অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্র। জমিদারবাবুর অস্ত্রশস্ত্র জমাবার শখ খুব। দেশবিদেশ থেকে তিনি অনেকরকম বন্দুক তলোয়ার কিনে এনেছেন। এর মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক অস্ত্রও আছে।

গম্বুজের ঘড়ির দিকে বারবার চোখ রেখেছিলাম। এক ঘণ্টা পার হবার পর ফিরব ভাবছি, এমন সময় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন লোক সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন গেটের কাছে।

আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

আমার হয়ে প্রহরীরাই বলল, এই খোকাবাবু এই কোঠি দেখতে এসেছে।

ধুতি-পরা ভদ্রলোকটি বললেন, বেশ তো, ভেতরে এসো।

ভদ্রলোক আমাকে খুব যত্ন করে সারাবাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন। যা কিছু দেখি, তাতেই মুগ্ধ হয়ে যাই। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো পুকুর আমি আগে দেখিনি। তাতে সত্যিই কিলবিল করছে অনেক মাছ। বাড়ির উঠোনে আর দোতলার বারান্দায় অনেকগুলো শ্বেতপাথরের মূর্তি।

কিন্তু অস্ত্রের ঘরটা আমার দেখা হয়নি। সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, ও ঘরের চাবি তো থাকে না আমার কাছে। দাদা নেই। এসে যাবেন একটু পরেই। তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই, দাদা এলেই তোমায় দেখিয়ে দেব।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ধুতি-পরা ভদ্রলোকটি বললেন, বেশ তো, ভেতরে এসো।

কিন্তু তক্ষুনি গম্বুজের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। আর দেরি করার উপায় নেই। আমি ছুট দিয়েছিলাম ক্যাম্পের দিকে।

সে রাত্রে ক্যাম্প ফায়ারে আমি শুনিয়েছিলাম ওই বাড়িটির কথা।

তখন আমি ডাইরি লিখতাম, তাতেও ওই অভিজ্ঞতার কথা লিখব ভেবেছিলাম।

এরপর দশ বছর কেটে গেছে।

আমি কলকাতা থেকে বাসে যাচ্ছিলাম শিলিগুড়ি। হঠাৎ একসময় চমকে উঠেছিলুম।

তখন প্রায় সন্ধে। এদিকের রাস্তা ভেঙে নতুন করে সদ্য চওড়া করা হয়েছে। আমি বসেছিলাম জানলার ধারে।

একসময় চমকে উঠে দেখি, রাস্তার ঠিক পাশেই সেই দুর্গের মতন বাড়িটা। সেই দুটো গম্বুজের মাথায় ঘড়ি রয়েছে। গেটের পাশে অবশ্য বন্দুকধারী প্রহরী নেই।

এ বাড়ির এত কাছ দিয়ে তো রাস্তা ছিল না। এখানে ছিল বাগান। সেই বাগান কোথায় উধাও হয়ে গেছে, এখন সেখানে রাস্তা। গম্বুজ দুটোও অনেকটা ভাঙা ভাঙা। দূরে বাড়িটাকেও বেশ জরাজীর্ণ মনে হল।

চলন্ত বাস থেকে আর কতখানিই-বা দেখা যায়! একটু বাদেই বাড়িটা মিলিয়ে গেল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। মাত্র দশ বছর আগেও বাড়িটা কত টাটকা ছিল!

https://boierhut.com/fb

কিন্তু দুঃখ করেই বা কী হবে! এখন জমিদারের দিন চলে গেছে। ওইসব বড়ো বড়ো বাড়ি টিকিয়ে রাখাই শক্ত। ওইরকম কত বাড়ি এখন হাসপাতাল কিংবা কলেজ হয়েছে।

তারপর আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আমি গিয়েছিলাম কোচবিহারে। সেখান থেকে একটা বাসে এলাম নিউ জলপাইগুড়ি। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরব। হঠাৎ ঘোষণা শোনা গেল যে কিছুদূরে রেললাইনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সে রাতে আর দার্জিলিং মেল যাবে না।

মহামুশকিল! অথচ সে রাতে আমায় কলকাতায় ফিরতেই হবে।

তক্ষুনি চলে এলুম শিলিগুড়ি। সেখান থেকে রকেট বাস তক্ষুণি ছাড়বে, ঝট করে উঠে পড়লুম।

রকেট বাস চলে সারারাত ধরে। যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আসে। আমিও খানিকবাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

হঠাৎ একসময় ঘুম ভেঙে গেল। দেখি যে, বাসটা থেমে আছে রাস্তার পাশে।

কী ব্যাপার?

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর বাইরে নেমে ঘোরাঘুরি করছে। বাসটা খারাপ হয়ে গেছে।

আমিও নেমে পড়লুম। গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। সেই আড়ষ্টতা কাটাবার জন্য দু-এক পা এগিয়েছি। হঠাৎ দেখি সামনে একটা গম্বুজের মাথায় ঘড়ি।

আরে, এ তো সেই বাড়িটা!

পাশাপাশি দুটো গম্বুজই রয়েছে, ঘড়ি দুটোও চলছে। দূরে সেই বাড়িটা।

আমি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে প্রহরী নেই, কেউ নেই। একটু ঠেলা দিতেই গেটটা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকব কিনা ভাবছি, এমন সময় একটা হ্যারিকেন নিয়ে এগিয়ে এল একটা লোক। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা।

লোকটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

আমি বললুম, আমাদের বাস খারাপ হয়ে গেছে। তাই একটু ঘোরাঘুরি করছি।

লোকটি বললেন, ও, তাই আওয়াজ শুনলুম বটে। সেই আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আমার মনে হল, এই লোকটিকেই কী আমি পনেরো বছর আগে দেখেছিলুম? হতেও পারে। ভদ্রলোকের বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি।

ভদ্রলোক বললেন, এই শীতের রাতে আপনাদের বাস খারাপ হয়ে গেল, আপনাদের তো খুবই অসুবিধে হচ্ছে!

আমি বললুম, যা মনে হচ্ছে, সারারাতেও ঠিক হবে কিনা ঠিক নেই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা ভেতরে এসে বিশ্রাম নিন না। আমাদের অতিথিশালা আছে, সেখানে অনায়াসেই চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক থাকতে পারে।

আমি বললুম, তাই নাকি?

উনি বললেন, বাসের অন্য যাত্রীদের ডাকুন!

আমি ফিরে গিয়ে বাসের অন্য যাত্রীদের ডাকাডাকি করে ওই কথাটা বললুম। কেউ কোনো সাড়া দিল না। কেউ বাস থেকে নামল না। ড্রাইভার-কনডাক্টর কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকাল আমার দিকে।

তখন আমি একাই ফিরে গেলুম। ভদ্রলোক হ্যারিকেন নিয়ে তখন দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি বললুম, কেউ আসতে চাইল না।

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর বললেন, আমাদের এত বড়ো অতিথিশালা পড়ে আছে, আজকাল কেউ আসে না। আপনি একাই আসুন তাহলে!

আমি বললুম, একা যাব! যদি হঠাৎ বাসটা ছেড়ে যায়?

উনি বললেন, আপনাকে না-নিয়ে যাবে, তা কী হয়! আসুন, ভেতরে এসে এক কাপ চা খেয়ে যান।

ভদ্রলোক এমন আন্তরিকভাবে ডাকলেন যে আমি আর না বলতে পারলুম না। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলুম।

তারপর বললুম, জানেন, আমি ছোটোবেলায়, অনেক বছর আগে আপনাদের এই বাড়িটা দেখতে এসেছিলুম।

উনি বললেন, তাই নাকি? তখন জমজমাট ব্যাপার ছিল, এখন আর কিছুই নেই। এ বাড়িতে লোকই নেই তেমন। বলতে গেলে আমি একাই টিকে আছি।

আমি বললুম, আপনাদের একটা অস্ত্র-ঘর আছে শুনেছিলাম। সেটা সেবার দেখা হয়নি। সেই অস্ত্রগুলো এখনও আছে?

উনি বললেন, হ্যাঁ, কোনোক্রমে রেখে দিয়েছি আমি। আপনি দেখবেন?

—হ্যাঁ।

আসুন তাহলে।

ভদ্রলোক আমায় নিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় ঠেলা দিলেন। কোনো তলা ছিল না, দরজা আপনিই খুলে গেল।

হ্যারিকেনের আলোয় দেখলুম ভেতরে সাজানো রয়েছে অনেক তলোয়ার, বন্দুক, ছুরি, রিভলবার, ঢাল, বর্ম।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উনি বললেন, ওই যে বড়ো ফাঁকা তলোয়ারটা দেখছেন, ওইটা শিবাজির তলোয়ার। আমার ঠাকুরদা ওটা কিনে এনেছিলেন লণ্ডন থেকে।

আমি চমকে উঠে বললুম, তাই নাকি? তাহলে তো এটা অমূল্য জিনিস।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তলোয়ারটা ভালো করে দেখতে যাচ্ছি, এমন সময় বাইরের গম্বুজের ঘড়িতে পাঁচবার ঘণ্টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল খুব জোর বাসের হর্ন।

আমি বললুম, এইরে বাস ছেড়ে যাচ্ছে।

তখুনি দৌড় মারার জন্য তৈরি হয়ে বললুম, আজ ভালো করে দেখা হল না, আর একদিন আসব, অ্যাঁ?

ভদ্রলোক ফ্যাকাশেভাবে হেসে বললেন, আসবেন।

আমি প্রাণপণে দৌড়ে রাস্তায় এসে দেখলুম, বাসটা চলতে শুরু করেছে। উঠে পড়লুম এক লাফে। কনডাক্টর আমায় কিছুই বলল না।

একসময় পৌঁছে গেলুম কলকাতায়।

এর দু-দিন বাদে কফিহাউসে বন্ধুদের বললুম, জানিস, গঙ্গানগরের কাছে একটা জমিদার বাড়িতে দারুণ দামি জিনিস আছে। শিবাজির তলোয়ার, লর্ড ক্লাইভের পিস্তল—দেখতে যাবি?

বন্ধুদের মধ্যে একজন খবরের কাগজে কাজ করে।

সে হো-হো করে হেসে উঠে বলল, তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে? গঙ্গানগরের কাছে জমিদার সিংহদের বাড়িটার কথা বলছিস তো? সে বাড়ি তো গভর্নমেন্ট নিয়ে ভেঙে ফেলেছে গত মাসে। সেখানে অনেকগুলো ফ্ল্যাট বাড়ি হবে।

আমি রেগে উঠে বললুম, তোরা খবরের কাগজের লোকেরা যা শুনিস তাই বিশ্বাস করিস। মিলিয়ে দেখিস না। আমি নিজের চোখে পরশুদিন দেখে এলুম।

তারপর এমন তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল যে অন্য বন্ধুরা থামাতেই পারে না। শেষপর্যন্ত আর এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা গাড়ি জোগাড় করে আমরা তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম গঙ্গানগরের দিকে।

সেই ঘড়িওয়ালা গম্বুজ দুটোর পাশে বসে আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। গম্বুজ দুটো আর লোহার গেটটা ঠিকই আছে। কিন্তু দুর্গের মতো বাড়িটা নেই! সেখানটা একদম ফাঁকা!

সাংবাদিক বন্ধুটি বললেন, দেখলি, বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে কিনা?

আমি ক্ষীণভাবে বলতে চাইলুম, 'পরশুদিনও ছিল, বোধ হয় তারপর ভেঙেছে—'

বন্ধুটি বলল, ধ্যাৎ। অতবড়ো বাড়ি ভাঙতেই তো তিন চার মাস লাগে!

আমার সারা গা কাঁপতে লাগল, দরদর করে ঘাম বেরিয়ে এল।

সেদিন ভোর পাঁচটার সময় তাহলে আমি কী দেখলাম?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বটুকদাদা সম্পর্কে আমার ঠাকুরদা হতেন, তিনি ছিলেন আমার নিজের ঠাকুরদার আপন পিসতুতো ভাই। তবু কেন জানি না, আমরা বাড়িসুদ্ধু ছোটোরা সবাই তাঁকে বটুকদাদা বলেই ডাকতাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব ছিল।

বটুকদাদার নিজের বাড়ি কোথায় ছিল তা আমরা জানি না, তবে মাঝেমাঝে হঠাৎহঠাৎ তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। থেকে যেতেন কয়েকদিন। বেশ মজার মানুষ ছিলেন তিনি, বাড়িতে ঢুকতেন গান গাইতে গাইতে। একটা গান আমার এখনও মনে আছে: রয়েছে দুয়ার খোলা, এসেছে পাগলা ভোলা, আজ কোনো কাজ হবে না, হবে শুধু নাচনা গানা...।

সেই গান গাইতে গাইতে তিনি উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে ভিখিরির মতন হাত জোড় করে বলতেন, ওগো দাদা-দিদি, মাসি-পিসিরা, পাগলা ভোলা এসেছে, হাঁড়িতে চাল বেশি নিয়ো, আমি কিন্তু পেটভরে খাব, অনেকদিন কিছু খাইনি গো।

প্রত্যেকবার এই কথা শুনে আমার ঠাকুরদা রাগ করতেন। তিনি বলতেন, 'ছি: বটুক, কী পাগলামি করিস! ছোটো ছেলেমেয়েরা কী ভাববে? তুই কী ভিখিরি নাকি? এ বাড়িতে এসে তুই থাকবি, খাবি, সেটা আবার এমন কথা কী!'

ঠাকুমা ও কাকিমা-জেঠিমারা খুব হাসতেন বটুকদাদাকে দেখে। আমরাও বটুকদাদাকে দেখে খুব মজা পেতাম। বটুকদাদা এলেই পড়াশুনো ফেলে ছুটে যেতাম, তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসতাম। প্রত্যেকবার এসেই তিনি বলতেন, 'উঃ, রাস্তায় কী বিপদ, খুবজোর প্রাণে বেঁচে এসেছি। এবারে কী হয়েছিস জানিস?'

বটুকদাদা বাইরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেও, বাড়িতে এসেই সেসব ছেড়ে একখানা পায়জামার ওপর রঙিন আলখাল্লা চাপাতেন। সেটাতে লাল-নীল-হলুদ অনেক রকম রং। তাঁকে দেখাত বহুরূপীর মতন। একবার সেই আলখাল্লাটা পরলে তিনি আর কিছুতেই খুলতেন না। এমনকী, খুব গরমের সময় ছেলেরা সবাই খালি গায়ে থাকে, সেইসময়েও বটুকদাদার গায়ে আলখাল্লা, সেটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেলেও খোলার নাম নেই। বটুকদাদাকে খালি গায়ে কেউ দেখেনি।

বটুকদাদার কাঁধে থাকত একটা ঝোলা। সেই ঝোলায় ভরতি অনেক খুচরো পয়সা। বেশির ভাগই সিকি আর আধুলি, তাঁর হাঁটার সময় ঝনঝন শব্দ হত। বটুকদাদা দুষ্টুমি করে বলতেন, 'ওইসব খুচরো পয়সা তিনি ভিক্ষে করে পেয়েছেন।' পরে জেনেছি, আসলে তা মোটেই নয়। বটুকদাদাদের খেয়া-নৌকোর ব্যাবসা ছিল। অনেক জায়গায় নদীর ঘাটে তাদের খেয়ার নৌকো

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চলত, বটুকদাদা ঘুরে ঘুরে সেইসব খেয়াঘাট থেকে টাকা আদায় করে আনতেন। কোথাও খেয়ার মাঝির অসুখ-টসুখ হলে তিনি নিজেই নৌকো চালাতেন। খেয়া পার হবার সময় লোকে তো খুচরো পয়সাই দেয়, তাই তাঁর ঝুলিতে অত খুচরো।

তিনি আমাদের নানারকম ধাঁধা জিজ্ঞেস করতেন, উত্তর দিতে পারলেই তিনি দিতেন একটা সিকি। বাবা-মায়েরা ছোটো ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাতেন খুব, কিন্তু বটুকদাদা শুনতেন না। আমরা অবশ্য সেই পয়সা পেয়ে দারুণ খুশি হতাম। আমার সেজদা 'ধাঁধার বই' নামে হাট থেকে একখানা বই কিনে এনে লুকিয়ে একা-একা সব ধাঁধার উত্তর মুখস্থ করত বেশি পয়সা পাবার জন্য। কিন্তু বটুকদাদার ধাঁধা কোনো বইতে পাওয়া যাবে না। তাঁর ধাঁধাগুলো আসলে খুব সহজ, কিন্তু চট করে উত্তরটা মনে আসে না। যেমন একটা ধাঁধা ছিল এইরকম: গোরুতে ঘাস খায়, আর গোরুর গলার দড়িটা কী খায়?

আমাদের মধ্যে ছোড়দির বুদ্ধিই ছিল সবচেয়ে বেশি। আমরা কেউ উত্তর দিতে পারিনি, ছোড়দি টপ করে বলে দিয়েছিল, 'দড়ি পাক খায়।'

বটুকদাদার আর একটা খেলা ছিল, বাংলা-বাংলা খেলা। সারাদিন যদি কেউ বটুকদাদার সামনে একটাও ইংরেজি কথা না-বলে থাকতে পারে, তাহলে সে চারখানা সিকি পাবে। এ খেলাটা ছিল খুবই শক্ত। টেবিল, চেয়ার, শার্ট, প্যান্ট এসবও বলা চলবে না। অনেক কথার তো আমরা বাংলা জানিই না। বটুকদাদা অনেক কথার বাংলা জানতেন। যেমন বুকশেলফ-এর বাংলা বইদানি; যাতে ফুল রাখে সেটা যদি ফুলদানি হতে পারে তবে বই রাখার জায়গা বইদানি হবে না কেন? আর প্যান্টের বাংলা দু-চোঙা। চেয়ারের বাংলা কেদারা আর টেবিলের বাংলা মেঝ।

আমার ছোড়দি মুন্নি ছাড়া অবশ্য আর কেউই বাংলা বাংলা খেলায় জিততে পারত না। ছোড়দির কথাবার্তাগুলো ছিল চটাং চটাং ধরনের। ছোড়দি আবার খেতে খুব ভালোবাসত। পাকা তেঁতুলে নুন মাখিয়ে ছোড়দি নিজেই আচার বানিয়ে কোথায় লুকিয়ে রাখত, সেই আচার সে অন্য কাউকে দিতে চাইত না। এমনকী, বটুকদাদাকেও দিত না। বটুকদাদা চাইলে বলত, 'ছি:, বুড়োমানুষদের আচার খেতে নেই, দাঁত টকে যায়।'

বটুকদাদা দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন, 'মুন্নি, তুই আমাকে বুড়ো বললি? আর তো কেউ বলে না। এখনও তো আমার মাথায় টাক পড়েনি।'

ছোড়দি বলেছিল, 'ওমা, বুড়োমানুষকে বুড়ো বলেছি, তাতে দোষের কী হয়েছে? টাক না-পড়ুক, দাড়ি তো পেকেছে।'

বটুকদাদার ঝোলার মধ্যে বাঁশিও থাকত একটা। সন্ধেবেলা তিনি বাঁশি বাজিয়ে শোনাতেন। কিন্তু ছোড়দি এসে সামনে বসলেই বটুকদাদার বাঁশি বাজানো থেমে যেত। ছোড়দির হাতে তেঁতুলের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আচার, জিভ দিয়ে চাটে একটু একটু করে, তাই দেখলেই বটুকদাদার জিভে জল এসে যায়। আর জিভে জল এসে গেলে কী বাঁশি বাজানো যায়?

বটুকদাদা বললেন, 'ওলে, মুল্লি, তুই একটু পেছনে দিকে গিয়ে বোস না!'

ছোড়দি খিলখিল করে হেসে ওঠে।

...মুন্নি, তুই আমাকে বুড়ো বললি? আর তো কেউ বলে না...

বটুকদাদা আমাদের গুরুজন হলেও তাঁর সঙ্গে আমরা সবাই সমানে হাসি-ঠাট্টা করতে পারতাম। বটুকদাদা এলে আমরা কয়েকটা দিন পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে দিয়ে হইহই করে কাটাতাম।

একদিন ছোটোকাকা বলল, 'তোরা কেউ বটুকদাদাকে কোনোদিন খালি গায়ে দেখেছিস?'

আমরা সবাই মাথা নাড়লুম। সত্যিই তো বটুকদাদাকে তো কখনো খালি গায়ে দেখা যায়নি।

ছোটোকাকা বলল, 'যা:, তাহলে তো তোরা কেউ বটুকদাদার আসল গল্পই শুনিসনি। ওঃ, সে যা গল্প, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।'

আমরা বটুকদাদার কাছ থেকে অনেক গল্পই শুনেছি। এর মধ্যে কোনটা যে আসল গল্প আর কোনটা যে নকল গল্প, তা আমরা বুঝিনি। সবই ভালো লেগেছে। তবু আমরা ছুটে গিয়ে বটুকদাদাকে ঘিরে ধরলুম।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বটুকদাদা তখন একটা পেয়ারাগাছের ডাল কেটে আমার ছোটো ভাইয়ের জন্য গুলতি বানিয়ে দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, কী হয়েছে, তোরা এত চেঁচামেচি করছিস কেন?

আমরা বললুম, 'বটুকদাদা, তুমি এতদিন আমাদের আসল গল্পটা বলোনি কেন? তোমার খালি গায়ের গল্প।'

বটুকদাদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সে গল্প তোদের এখন শোনার দরকার নেই। বড়ো হলে শুনবি!'

কিন্তু আমাদের ধারণা আমরা তখনই বড়ো হয়ে গেছি, আমরা ওই কথা মানব কেন? ছোড়দি বলল, 'দাঁড়া না, আমি ব্যবস্থা করছি।'

বটুকদাদা দিনের বেলা চান করতেন না। তাঁকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হত, সেটা পুকুরের ধারে। রাত্তিরবেলা আটটা-ন-টার সময় উনি আলখাল্লাটা খুলে রেখে অন্ধকারের মধ্যে পুকুরে কয়েকটা ডুব দিয়ে আসতেন।

সেই রাত্তিরে ছোড়দি বটুকদাদার ঘর থেকে তাঁর জামাকাপড়ের পুঁটুলি সরিয়ে ফেলল। বটুকদাদা পুকুরে নামবার পর লুকিয়ে ফেলল আলখাল্লাটাও।

জল থেকে উঠে এসে বটুকদাদা বললেন, 'আরে, আমার জামাটা কোথায় গেল? কে নিলরে, অ্যাঁ।'

একটু দূর থেকে হেসে উঠল ছোড়দি।

বটুকদাদা কোমরে গামছা জড়িয়ে ছুটে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানেও জামাকাপড় না-পেয়ে অসহায়ভাবে বললেন, 'আরে, সবই নিয়ে নিয়েছে। বিচ্ছু ছেলেমেয়েদের কান্ড। ওরে ও মুন্নি, শিগগির দে, আমার শীত করছে।'

তখন আমরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লুম ঘরের মধ্যে। তারপরই চমকে গেলুম!

ইলেকট্রিকের আলো তো ছিল না, একটা লণ্ঠন জ্বলছিল সেই ঘরে। তাতে দেখা গেল, বটুকদাদার বুক-পিঠে অসংখ্য খোবলানো-খোবলানো দাগ। মশলা-বাটা শিল কিংবা খেজুরগাছ যেমন অক্ষত হয় না, বটুকদাদার গায়েও সেইরকম অনেক পুরোনো ক্ষত। বটুকদাদা সবসময় গায়ে জামা দিয়ে এই ক্ষতগুলো লুকিয়ে রাখে।

আমাদের অবাক দৃষ্টি দেখে বটুকদাদা বললেন, 'আগে মাথা মুছে জামাকাপড় পরে নিই, তোরা ঠাণ্ডা হয়ে বোস, তারপর গল্প বলছি। মুন্নি, আমার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসতে পারবি?'

খানিকবাদে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বটুকদাদা বললেন, 'আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন ভালো ফুটবল খেলতে পারতাম, বুঝলি। পড়াশুনোর চেয়ে খেলাধুলোর দিকেই বেশি মন ছিল। আমি যে বছর ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, ফার্স্ট ক্লাস কাকে বলে জানিস তো, আমাদের আমলে ক্লাস

https://boierhut.com/fb

টেনকে বলা হত ফার্স্ট ক্লাস, সেই সময়ে আমার এত নাম হয়েছিল যে, বিভিন্ন গ্রামের ফুটবল টিম আমাকে ভাড়া করে নিয়ে যেত! আমি খেলতাম সেন্টার ফরোয়ার্ডে। এক-একখানা গোল দিতে পারলে দু-টাকা করে পেতাম। কোনো কোনো খেলায় দশখানা পর্যন্ত গোল দিয়েছি, বুঝলি?'

ছোড়দি বলল, 'নিশ্চয়ই পচা পচা টিমের সঙ্গে খেলতে?'

বটুকদাদা বললেন, 'গ্রামের টিম আর কত ভালো হবে। খেলোয়াড়রাও সেইরকম। কিন্তু আমার মতন এত বেশি গোল দিতে আর কেউ পারত না। একবার এক ডজন গোল দিয়ে রেকর্ড করার ইচ্ছে ছিল, তা আর হল না অবশ্য।'

আমি ভাবলুম, ফুটবল খেলতে গেলে মাথা ফাটতে পারে কিংবা পা ভাঙতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে বটুকদাদার গায়ের ওই সোরস খোবলানোর কী সম্পর্ক?

বটুকদাদা বললেন, 'তখন তো আমাদের নিজেদের গ্রামে ইস্কুল ছিল না। তাই অন্য একটা গ্রামের স্কুলে পড়তাম, থাকতাম সেখানকারই বোর্ডিং-এ। এখন যাকে হস্টেল বলে, তখন তাকেই বলত বোর্ডিং। এই বোর্ডিং-এ আর একটা ছেলে থাকত, তার নাম প্রাণগোপাল, ডাকনাম ভূতো। সেই ভূতোও ভালো ফুটবল খেলত, সে ছিল গোলকিপার। ভূতো আমার চেয়ে বয়েসে কয়েক বছরের বড়ো ছিল, গায়ের রং টকটকে ফর্সা, সুন্দর চেহারা। অনেক সময় আমরা একই টিমে ভাড়া খাটতে যেতাম। আমি সেন্টার ফরোয়ার্ড, ভূতো গোলকিপার। আমাদের টিমই বেশিরভাগ খেলায় জিতে যেত। একবার গোবিন্দপুরে একটা খেলায় জিতে আমি আর ভূতো এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়েছিলাম!'

ছোড়দি বলল, 'আমরা খেলার গপ্প শুনতে চাই না!'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বটুকদাদা বললেন, 'এটা খেলারই গল্প রে, অন্য গল্প নয়। একবার হল কী জানিস, আমি আর ভূতো দুটো আলাদা টিমে খেলতে গেলুম। ওই গোবিন্দপুরেই খেলা হবে, কিন্তু ভূতো খেলবে ঘোড়াডাঙার টিমে। ওই টিমের ক্যাপটেন ওর মামাতো ভাই, ওকে ওখান খেলতেই হবে, এদিকে আমি গোবিন্দপুরের টিমকে কথা দিয়ে ফেলেছি! উপায় নেই। দুজনে দু-টিমের হয়ে খেলতে গেলুম। মাঠে নেমে ভূতো আমার কানেকানে বলল, বটুক, তুই বেশি গোল দিস না। খেলাটা ড্র করার চেষ্টা করিস।' শুনেই রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ওইসব গট-আপ খেলায় আমি বিশ্বাস করি না। যার যতটা সাধ্য খেলবে, তারপর হার-জিত তো আছেই। হাফ টাইমের মধ্যেই আমরা অনেকটা এগিয়ে গেলুম। ঘোড়াডাঙা গোল দিয়েছে মোটে পাঁচটা, আর আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আমি একাই আটখানা গোল দিয়েছি। ইচ্ছে আছে আরও অন্তত চারখানা দেবার। ভূতো আবার আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বলল, 'বটুক, তুই এবার চেপে খেল, খেলাটা ড্র করাতেই হবে। তুই আর গোল দিলে আমার মামাতো ভাই বলেছে তোর ঠ্যাং ভেঙে দেবে!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আবার খেলা শুরু হবার একটু পরেই আমি একটা বল পেয়ে ছুটে গেলুম অন্য সাইডের গোলের দিকে, আমার পা থেকে বল ছাড়াবার সাধ্য কারও ছিল না। গোলপোস্টের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল, অফ সাইড, অফ সাইড। কিন্তু সে চিৎকারে আমি কান দিলুম না। রেফারির বাঁশি আমার কানে আসেনি, আমি মারলুম প্রাণপণে শট। ভূতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা ধরতে গেল, কিন্তু পারল না, বলটা ঢুকে গেল গোলের মধ্যে। ভূতো কিন্তু মাটিতেই পড়ে রইল, আর উঠল না।'

আমি বললুম, 'মরে গেল?'

সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন আমার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, 'ধ্যাত বোকা! ফুটবল লাগলে কেউ মরে নাকি? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

বটুকদাদা বললেন, 'অজ্ঞানও হয়নি, ভূতোর পেটে খুব লেগেছিল, সে আর খেলতে পারল না। তাকে নিয়ে যাওয়া হল মাঠের বাইরে। সেই খেলা আর শেষই হল না। দর্শকরা হইহই করে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে, আমরা সব দৌড়ে পালালুম। খেলা ভন্ডুল।'

'বোর্ডিংয়ে কোনোক্রমে ফিরে আমি ভূতের খবর নিতে গেলুম, কিন্তু ভূতো আমার সঙ্গে কথা বলল না। তার অভিমান হয়েছে। সে ভেবেছে, আমি ইচ্ছে করে তার পেটে বল মেরেছি। আমি কতভাবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, সে কিছুতেই বুঝবে না।ক-দিন ভূতো জ্বরে ভুগল। তারপর একটু সুস্থ হতে-না-হতেই তার গায়ে স্মল পক্স বেরোল। স্মল পক্স।

'তখনকার দিনে স্মল পক্স-এর নামে মানুষ ভয়ে কাঁপত। বোর্ডিংয়ে বা হস্টেলে একজন ছাত্রের স্মল পক্স হলেই অন্য ছাত্ররা পালাত বাড়িতে। এবারেও তাই হল, অন্য ছাত্ররা পালিয়ে গেল, আমরা দু-তিনজন রয়ে গেলুম ভূতোর সেবা করার জন্য।

'পাঁচ দিন বাদে ভূতো মারা গেল। গ্রামে তো ডাক্তার ছিল না, ছিলেন এক কবিরাজ, তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাঁচানো গেল না কিছুতেই। শহর থেকে বড়ো কবিরাজ কিংবা অন্য ডাক্তার ডাকারও উপায় ছিল না, কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে পথঘাট সব ডুবে গিয়েছিল।

'ভূতোর বাবা-মা থাকতেন বিহারে, তাই খবর দেওয়া হল ঘোড়াডাঙায় তার মামার বাড়িতে। ভূতোর মামা খুব বুড়ো, তিনি আসতে পারলেন না। এল শুধু তার মামাতো দু-ভাই। তাদের মধ্যে একজনের আবার জ্বর, সে স্মল পক্সের মড়া ছুঁতে চায় না। বোর্ডিংয়ে তখন আমরা মাত্র তিনটি ছাত্র, তাদের মধ্যেও একজনের গায়ে দু-চারটে স্মল পক্সের গুটি বেরিয়েছে। সেও যেতে পারবে না। ওরকম ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আর কোনো লোক জোগাড় করা যাবে না। আমরা তিনজনে মিলেই ভূতোকে নিয়ে চললুম শ্মশানের দিকে।'

হঠাৎ থেমে গিয়ে বটুকদাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর শুনবি?'

আমরা সবাই বললুম, 'হ্যাঁ, শুনব। শুনব।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার জ্যাঠতুতো দাদা নিমাই বসেছিল দরজার ধারে, সে সরে এসে বসল ভেতরে। ছোড়দির আচার খাওয়া থেমে গেছে।

বটুকদাদা বললেন, 'স্মল পক্সের মড়া চব্বিশ ঘণ্টার বেশি ফেলে রাখতে নেই। আমাদের বেরোতে বেরোতে সন্ধে হয়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টি চলছে অবিরাম। সেই দুর্যোগের মধ্যে কুকুর-বিড়ালও বেরোয় না, আমাদের তো যেতেই হবে। আমাদের বোর্ডিং থেকে শ্মশান প্রায় তিন মাইল দূরে, নদীর ধারে। জল-কাদার মধ্যে আমরা হাঁটছি খুব আস্তে আস্তে। বিদ্যুৎ-চমকে আর বাজের গর্জনে চমকে চমকে উঠছি। যাইহোক, অতিকষ্টে তো শ্মশানে পৌঁছোলুম, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি খাঁ খাঁ। জনমনুষ্য নেই। মড়ার খাট নামিয়ে আমরা হাঁকাহাঁকি করতে লাগলুম, তবু ডোমের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন কী উপায়?'

বটুকদাদা তাকালেন আমাদের দিকে। ভুরু নাচিয়ে আবার বললেন, 'কী উপায়?'

কিন্ত আমরা কী কেউ মড়া পোড়াবারও বিষয় কিছু জানি না যে উত্তর দেব?

ছোড়দি বলল, 'একজন কেউ ডোমকে খুঁজে আনলেই পারত!'

বটুকদাদা বললেন, 'সেটাই তো হচ্ছে কথা। কে যাবে? নিয়ম হচ্ছে এই যে, মড়া কখনো একলা ফেলে যেতে নেই। একজনকে ছুঁয়ে থাকতে হয়। আমাদের সঙ্গে আর একজন যে গিয়েছিল, তার নাম বিষ্টু, আর ভূতোর মামাতো ভাইয়ের নামটা ভুলে গেছি। সেই জায়গাটা বিষ্টুর চেনা। আমি বিষ্টুকে বললুম, 'তুই যা।' বিষ্টু সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা গিয়ে বলল, 'এই শ্মশানের মধ্যে আমি একলা যেতে পারব না, আমার ভয় করছে!'

'তখন আমি ভূতোর মামাতো ভাইকে বললুম, 'তাহলে তুমি এখানে থাকো, আমি বিষ্টুর সঙ্গে যাই। সে বলল, 'ওরে বাবা, আমি একা মড়ার পাশে বসে থাকব? সে পারব না।' ভেবে দেখ তোরা, ওর নিজের মাসতুতো ভাই, তাকে সে ভয় পাচ্ছে। শেষপর্যন্ত বিষ্টু আর সে গেল ডোমকে ডাকতে, আমি একা বসে রইলুম ভূতোকে ছুঁয়ে।'

'ওদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ভূতো উঠে বসল!'

ছোড়দি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ভূতো মরেনি, ভূতো মরেনি, আমি আগে বুঝেছিলুম। ও মটকা মেরে পড়েছিল।'

বটুকদাদা ছোড়দির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'ভূতো উঠে বসল, সেই অন্ধকারেও তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, সে অদ্ভুত ভাঙা গলায় বলল, 'বটুক, এইবার তোকে পেয়েছি। তুই আমার পেটে বল মেরেছিস, তুই ইচ্ছে করে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলি!'

'আমি কাঁদতে কাঁদতে বললুম, 'ভূতো, তোকে মারার কথা আমি একবারও চিন্তা করিনি। খেলতে নামলে আমার গোল দেওয়ার কথা ছাড়া আর অন্য কিছু মনে থাকে না।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'ভূতো হাত বাড়িয়ে আমার বুকটা খিমচে ধরে একটা টান মারতেই আমার জামাটা ছিঁড়ে গেল। ভূতো মুখটা আরও কাছে এনে আমার বুকটা কামড়ে ধরতে গেল। তখন আমি দু-হাতে ভূতোর গলা চেপে ধরলুম। কিন্তু ভূতোর গায়ে তখন অসুরের মতন জোর। সে তার দু-হাতের আঙুলের নখ দিয়ে আমার বুক-পিঠ থেকে মাংস খুবলে খুবলে তুলতে লাগল।'

নিমাইদা বলল, 'ভূতো ভূত হয়ে গেছে!'

বটুকদাদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভূত নয়, নরদানব। আমি তার গলা টিপে ধরেছি। তবু সে আমার গা থেকে মাংস তুলে তুলে দিতে লাগল মুখে। গলা টিপে ধরলে কেউ কথা বলতে পারে? কিন্তু ভূতো সেই অবস্থাতেও হি হি হি হি করে হেসে উঠে বলল, 'তুই আমার সঙ্গে পারবি না বটুক, আজ তোকে আমি শেষ করে দেব। আমি চলে যাব, আর তুই মনের আনন্দে ফুটবল খেলে যাবি ভেবেছিস? আজই তোর শেষ দিন!'

নিমাইদা বলল, 'দরজা বন্ধ করে দে। দরজাটা বন্ধ করে দে!'

বটুকদাদা বললেন, 'সেই অবস্থায় আমি ভূতোর সঙ্গে লড়াই করে গেছি। তার গলাটা ছেড়ে দিলে সে আমাকে কামড়েই খেয়ে নিত। আমি কিছুতেই ছাড়িনি। এক-একসময় মনে হচ্ছিল, আর পারব না, আমার সব শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণার চোটে আমি চিৎকার করছিলুম, ওরে বাবা রে, মা রে! বিষ্টু কোথায় গেলি? কে কোথায় আছ...'

'একসময় দূর থেকে বিষ্টুর গলা শোনা গেল, 'বটুক, আমরা এসে গেছি! কী হয়েছে?'

'ওদের গলা শোনা যাওয়া মাত্র ভূতো আমাকে ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে গেল। আমি তার গলা থেকে হাত সরাতেই সে ধপাস করে পড়ে গেল। আবার আগের মতন।

'বিষ্টুরা এসে পড়ার পর যাতে আমার অবস্থা দেখতে না-পায় তাই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম নদীতে!'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার বটুকদাদা বললেন, 'তারপর থেকে আমি ফুটবল খেলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি!'

সেদিন রাত্তিরে আমাদের কী ভয়! খাওয়ার পর আমরা কেউ আর বাথরুমে যেতে ও সাহস পাই না। জানলায় একটু বাতাসের শব্দ শুনলেই চমকে চমকে উঠি।

ছোটোকাকা বললেন, 'তোরা বটুকদাদার ওই গাঁজাখুরি গল্প শুনে ভয় পেয়েছিস বুঝি? ওই গল্প আমাদের কাছে আগে কতবার বলেছে। বটুকদাদার গায়ে ওই যে দাগগুলো, ওগুলো আসলে স্মল পক্সের দাগ। ছোটোবেলায় ওর একবার খুব সাংঘাতিক স্মল পক্স হয়েছিল, প্রায় মরতে বসেছিল, সেই দাগ রয়ে গেছে সারাগায়ে।'

আমি অবিশ্বাসের সুরে বললুম, 'তাহলে মুখে দাগ নেই কেন? স্মল পক্স হলে মুখে দাগ থাকবে না?'

ছোটোকাকা বলল, 'মুখেও দাগ আছে। সেই দাগ ঢাকার জন্যই তো অত বড়ো দাড়ি রেখেছে।'

https://boierhut.com/fb

ছোড়দি বলল, 'ঠিক, ঠিক। বটুকদাদার নাকের পাশেও দুটো-তিনটে দাগ আছে। এখন মনে পড়ছে।'

এই কথা বলে ছোড়দি বিছানা ছেড়ে উঠে গেল আচার খাবার জন্য।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাবা শহরে গেছেন একটা টেলিগ্রাম করার জন্য। মা শুয়ে শুয়ে একটা মোটা উপন্যাস পড়ছেন, এই সময় চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল পুপলু।

একেবারে চুপচাপ দুপুর। নাগিন লেকের ওপরে ভাসছে দশ-বারোটি হাউসবোট। কয়েকটা হাউসবোটের ছাদে শুয়ে শুয়ে সাহেব মেমরা রোদ পোহাচ্ছে।

আজকের দিনটা খুব সুন্দর। ঝকঝক করছে রোদ। দূরে দেখা যাচ্ছে বরফের মুকুট-পরা পাহাড়ের সারি। একঝাঁক হাঁস ডানা দুলিয়ে উড়ে যাচ্ছে সেই পাহাড়ের দিকে।

পুপলুদের হাউসবোটটা বেশ বড়ো। ঠিক যেন একটা বাড়িরই মতন। দু-খানা ঘরে রয়েছে দু-দল জার্মান আর আমেরিকান, আর একটা ঘরে বাবা-মার সঙ্গে পুপলু। এ ছাড়া একটা বেশ বড়ো ডাইনিং রুম, তারপর একটা বসবার ঘর বেশ সোফা-টোফা আর রেডিয়ো দিয়ে সাজানো। তার সামনে একটা ছোট্ট ঘেরা বারান্দা।

পুপলু সেই ঘেরা বারান্দাটায় এসে দাঁড়াল।

শ্রীনগর থেকে এই নাগিন লেকটা খানিকটা দূরে। এখানকার জল নীল রঙের আর বেশ পরিষ্কার, ডাল লেকের মতন নোংরা নয়। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই জলের তলার অনেকখানি দেখা যায়। জলের তলায় অনেক রকমের গাছ, ঠিক মনে হয় একটা জঙ্গল। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় একটা রুপোলি মাছের ঝিলিক।

একটু দূরে ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকোয় বসে মাছ ধরছে সেলিম।

এই সেলিম পুপলুর চেয়ে বেশি বড়ো নয়। পুপলুর বয়স আট, আর সেলিমের বয়স বড়ো জোর দশ বছর। কিন্তু ওইটুকু বয়সেই সেলিম কী সুন্দর নৌকো চালাতে পারে আর বঁড়শি দিয়ে টপাটপ মাছ ধরে। তা ছাড়াও সেলিম চা বানাতে জানে, তরকারি কুটতে জানে।

সেলিম একবার এদিকে তাকাতেই পুপলু হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল।

সেলিম ডিঙি নৌকোটা নিয়ে চলে এল হাউসবোটটার কাছে।

সেলিম কথা বলে কাশ্মীরি ভাষায়। তা ছাড়া সে হিন্দি, উর্দুও জানে। আর কয়েকটি ইংরেজি শব্দ শুধু বলতে পারে। পুপলু কাশ্মীরি বা হিন্দি উর্দু কিছুই জানে না, তবু তার কথা সেলিম ঠিক বুঝে যায়।

পুপলু জিজ্ঞেস করল, 'সেলিম, ক-টা ফিশ ধরলে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেলিম একটা ঝুড়ি তুলে দেখাল। এর মধ্যেই সে দশ-বারোটা মাছ ধরে ফেলেছে। মাছগুলো অনেকটা তেলাপিয়া মাছের মতন দেখতে। এখনও লাফাচ্ছে।

পুপলু বলল, 'আমিও মাছ ধরব। আমায় তোমার নৌকোতে নেবে?'

সেলিম বলল, 'কেয়া?'

পুপলু বলল, 'আই ক্যাচ ফিশ। তোমার বোটে আমায় টেক করবে?'

সেলিম বলল, 'আও।'

সব হাউসবোটের সঙ্গেই একটা ছোট্ট সিঁড়ি লাগানো থাকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে সাবধানে পুপলু উঠল ডিঙি নৌকোটায়।

ছোট্ট নৌকো, দুজনের ভারেই একটু জল উঠল।

সেলিম নৌকোটাকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে ছিপ ফেলল জলে।

পুপলু বলল, 'আমায় দাও। আমি কোনোদিন মাছ ধরিনি।'

সেলিম ছিপটা তুলে দিল পুপলুর হাতে।

তারপর দুজনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জলের দিকে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা যায়, মাঝে মাঝে ঝাঁঝির জঙ্গল থেকে দু-একটা মাছ বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক ঘুরে আবার সাঁত করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

একবার একটা মাছ বড়শির টোপটার কাছে এসে ঘুরে ঘুরে কয়েকবার গন্ধ নেবার পর একবার ঠোকরাতেই সেলিম বলল, 'খিঁচো, খিঁচো।'

পুপলু খিঁচো কথাটার মানে জানে না। সে তো আগে কখনো ছিপ হাতে নেয়নি, কখন টান মারতে হয় সে জানবেই বা কী করে?

সেলিম তখন পুপলুর হাতে ধরা ছিপটা নিজে ধরে মারল একটা টান। অমনি কী আশ্চর্য ব্যাপার, সত্যিই উঠে এল একটা মাছ। ছটফট ছটফট করছে। পুপলুর জীবনে এই প্রথম মাছ ধরা। টানটা সেলিম মারলেও ছিপটা তো ছিল তার হাতে।

পুপলুর কী আনন্দ। ইচ্ছে হল সেই নৌকোর ওপর লাফাতে। লাফালেই কিন্তু ডুবে যাবে নৌকোটা, আর পুপলু সাঁতারও জানে না।

সেলিম মাছটা খুলে নিয়ে আবার ছিপ ফেলল জলে। এই সময় সরু রিনরিনে গলায় একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই, কাম হিয়ার; কাম হিয়ার, টেক মি।'

ওরা তাকিয়ে দেখল, 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া' নামের হাউসবোট থেকে ওদেরই বয়সি একটা মেয়ে হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওই মেয়েটিকে চেনে পুপলু। ওর নাম অ্যালিস। ওরা আমেরিকান। অ্যালিসের চুলের রং একদম সোনালি। আর মেমের মেয়ে যখন গায়ের রং তো ফর্সা হবেই, চোখ দুটো নীল। ঠিক যেন একটা পুতুল।

পুপলু 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' নামে গল্পের বইটা পড়েছে। এই মেয়েটিকে দেখে তার মনে হয়েছিল সেই গল্পের অ্যালিস। কিন্তু এই মেয়েটা বেশ রাগী। অ্যালিস কথা বলে বেশ রাগী সুরে আর ইংরেজিটাও খুব জড়ানো ধরনের। তবু পুপলু আর সেলিম ওর কথা মোটামুটি বুঝে যায়।

অ্যালিস ওদের সঙ্গে নৌকোয় উঠতে চাইছে। পুপলু সেলিমকে বলল, 'ওকেও নিয়ে নাও না।'

সেলিম জানাল যে এইটুকু নৌকোতে তিনজনের জায়গা হবে না। নৌকো ডুবে যেতে পারে।

অ্যালিস আবার চিৎকার করে বলল, 'টেক মি উইথ ইউ।'

পুপলু বলল, 'তিনজন হবে না। স্মল বোট, নো থ্রি।'

অ্যালিস হুকুম করে রাগী গলায় বলল, 'আই ওয়ান, নো নাও-ও।'

মেয়েটাকে বেশি রাগাতে চায় না ওরা। সেলিম তার ডিঙি নৌকোটা নিয়ে গেল 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া' হাউসবোটটার কাছে। অ্যালিস তাড়াহুড়ো করে এমনভাবে লাফিয়ে নামল যে তক্ষুনি ডুবে যেত নৌকোটা। সেলিম 'আরে আরে' করে উঠল।

পুপলু অ্যালিসকে বাংলায় বলল, 'একদম চুপ করে বসো, নড়াচড়া করবে না।'

অ্যালিস তার কথা অগ্রাহ্য করে ঠোঁট উলটে বলল, 'আই নো সুইমিং।'

সেলিম আবার ডিঙি নৌকোটা সরিয়ে নিয়ে গেল দূরে। আবার ছিপ ফেলল।

আর একটা মাছ উঠতেই অ্যালিস বলল, 'ও হাউ লাভলি! আ রিয়াল ফিশ! স্টিল অ্যালাইভ! লেট মি, লেট মি—'

এবার অ্যালিস নিজে মাছ ধরতে চায়।

পুপলু তাকে বিজ্ঞের মতন উপদেশ দিল, 'কখন টান মারতে হয় তুমি জানো? ঠিক মাছটা এসে যখন ঠোকরাবে...'

অ্যালিস জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট?'

পুপলু বলল, 'হোয়েন ফিশ আস্তে আস্তে ঠোকরাবে, ইয়ে ঠোকরাবে মানে হচ্ছে বাইট... তুমি ঠিক এমনি করে টানবে।'

হাত তুলে হ্যাঁচকা টান মারা দেখিয়ে দিল পুপলু। সেলিম মুচকি মুচকি হাসছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...এইটুকু নৌকোতে তিনজনের জায়গা হবে না...

কিন্তু অ্যালিস ছিপ ফেলায় আর মাছ ঠোকরায় না। একটুক্ষণের মধ্যে তার ধৈর্য ফুরিয়ে যায়। সে বলে, 'হোয়াট হ্যাপনড! হোয়ার দি ফিশেজ গন?'

হাওয়ায় দুলতে দুলতে নৌকোটা বেশিদূরে চলে যাচ্ছে।

এদিকে পুপলুর মা গল্পের বইটা পড়তে পড়তে হঠাৎ একসময় চমকে উঠলেন। হাউসবোটটায় কোনো শব্দ নেই কেন? পুপলু যেখানেই খেলা করুক, খুটখাট দুপদাপ শব্দ তো-কিছু-না কিছু হবেই! সাধারণত পুপলু বসবার ঘরটায় তার খেলনাগুলো ছড়িয়ে বসে।

মা বইটা মুড়ে রেখে চলে এলেন বসবার ঘরে। অন্য ঘরের সাহেব-মেমরা সবাই পহলগাঁও বেড়াতে গেছে, তাই পুরো হাউসবোটটাই এখন ফাঁকা।

বসবার ঘরেও পুপলুকে না-পেয়ে তিনি চলে এলেন সামনের বারান্দায়। তারপর বেশ খানিকটা দূরে তিনি ডিঙি নৌকোটা দেখতে পেয়েই ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

ওইটুকু তিনটি ছেলে-মেয়ে এক ডিঙি নৌকোয়, এক্ষুনি যদি নৌকোটা ডুবে যায়, তাহলে কী হবে? মা ভাবলেন, ওরা আর ফিরতে পারবে না।

তিনি পাগলের মতন চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'সিদ্দিকি, রহমান, তুমলোক দৌড়ে আও; শিগগির দেখকে যাও। সর্বনাশ হো গিয়া—'

সিদ্দিকি আর রহমান এই হাউসবোটের সব কিছু দেখাশুনো করে। ওরা থাকে পাশের একটা ছোটো হাউসবোটে। চেঁচামেচি শুনে ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মাকে এত ভয় পেতে দেখে ওরা সেলিমকে ডেকে বলল, তক্ষুনি ডিঙি নৌকো এদিকে নিয়ে আসতে।

মা বললেন, 'ওরা আসতে পারবে না। তোমরা একটা শিকারা নিয়ে যাও, ওঃ, উলটে গেলে কী হবে? আমি ভাবতে পারছি না—'

শিকারা মানে জলের ট্যাক্সি। অনেক দূর দিয়ে একটা শিকারা যাচ্ছে, মা হাত তুলে ডাকতে লাগলেন সেটাকে। কিন্তু সেই শিকারাটা আসবার আগেই সেলিমের ডিঙি পৌঁছে গেল।

পুপলু একগাল হাসিমুখে বলল, 'মা, জানো আমি একটা মাছ ধরেছি। সেলিমকে জিজ্ঞেস করো—। অ্যালিস কিন্তু ধরতে পারেনি!'

মা বললেন, 'উঠে এসো আগে। তারপর তোমায় দেখাচ্ছি মজা!'

অ্যালিস পুপলুর মাকে বলল, 'হেই। হোয়াই ইউ ওয়্যার শাউটিং লাইক দ্যাট?'

ওইটুকু মেয়ের মুখে বকুনির সুর শুনে মা-ও তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, 'ইউ কিডস আর ভেরি নটি। হোয়াই ডিড ইউ গো ইন সাচ এ স্মল বোট?'

অ্যালিস এমন দুষ্টু, এই কথা শুনে হেসে উঠল। তাতে আরও রাগ হয়ে গেল পুপলুর মার।

পুপলু উঠে এসে বলল, 'আমার মাছটা? আমার মাছটা আমি নেব না?'

মা বললেন, 'না! মাছ নিতে হবে না।'

পুপলুকে নিজেদের ঘরে নিয়ে এসে মা বললেন, 'দুষ্টু ছেলে, তুই কেন আমাকে না- বলে নৌকোয় উঠেছিলি?'

পুপলু কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে জানে, মা যখন খুব রেগে যান তখন কথা বলে বেশি লাভ নেই। মাকে জব্দ করারও একটা ভালো উপায় পুপলু জানে। সে কাঁদতে শুরু করলেই মার রাগ সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বাবা ফিরে আসতেই সবিস্তারে সব ঘটনাটা শোনালেন মা। বাবার ভুরু কুঁচকে গেল। সত্যি চিন্তারই কথা। পুপলু সাঁতার জানে না। হাউসবোটে ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকার এই একটা ভয়, যদি হঠাৎ ওদের কেউ জলে পড়ে যায়।

বাবা বললেন, 'চলো তাহলে এই হাউসবোটটা ছেড়ে কালই পহলগাঁও চলে যাই।'

প্রথম দিন এসেই বাবার এই হাউসবোটটা পছন্দ হয়নি। প্রথমবার খাবার ঘরে ঢুকতে গিয়েই বাবা 'ওরে বাপরে, বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন দারুণ ভয় পেয়ে।

আসলে হয়েছিল কী, একটা ঘরে যে জার্মান ছেলে দুটি আছে, তাদের সঙ্গে রয়েছে একটা কুকুর। কুকুরটা ডোবারম্যান জাতের, প্রায় বাঘের মতন চেহারা, চোখ দুটি খুব হিংস্র। সেই কুকুরটা একেবারে বাবার বুকের ওপর দুটো থাবা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

https://boierhut.com/fb

বাবা এমনিতেই কুকুর পছন্দ করেন না, তার ওপর অত বড়ো কুকুরকে বুকের ওপর থাবা তুলতে দেখলে তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবেই। বাবাকে ভয় পেতে দেখে খুব মজা লেগেছিল পুপলুর। সে কিন্তু অত বড়ো কুকুর দেখেও একটুও ভয় পায়নি। কুকুরটার গায়ে মাথায় হাত দিয়ে পুপলু খেলাও করেছে।

কুকুরটার মালিক জার্মান ছেলেটি এসে বাবাকে সেদিন উদ্ধার করে বলেছিল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। আমার এই কুকুর দেড় বছর ট্রেনিং স্কুলে পড়েছে, আমার হুকুম ছাড়া কাউকে কামড়ায় না।'

বাবা কিন্তু তবুও কুকুরটাকে দেখলেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

সেইজন্যই বাবার এই হাউসবোটে থাকার বিশেষ ইচ্ছে নেই।

মা বললেন, 'কিন্তু এখানে যে আরও তিন দিনের টাকা জমা দেওয়া আছে, তা কি ওরা ফেরত দেবে?'

বাবা একটু চিন্তা করলেন, টাকা বোধ হয় এরা ফেরত দেয় না। তা ছাড়া পহলগাঁও যেতে হলে আগে থেকে বাসের টিকিট কিনতে হবে। তার জন্য দু-একদিন সময় লাগবে।

বাবা বললেন, 'টাকা ফেরত না-দেয় না-দিক। চলো, আমরা কয়েকটা দিন কোনো হোটেলে থাকি।'

পুপলুর কিন্তু এই হাউসবোটটাই বেশি পছন্দ। সেলিম আর অ্যালিসের সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখান থেকে কতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। সারাদিন ধরে দূরের পাহাড়ের রং বদলায় বারবার। সন্ধেবেলা বরফের ওপর রোদ পড়লে ঠিক মনে হয় সোনার মুকুট।

পুপলু বলল, 'না, আমরা এখানেই থাকব।'

বাবা বললেন, 'শোনো পুপলু, তুমি এখনও সাঁতার শেখোনি। সাঁতার না-জেনে জলের কাছে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। সামনের বছরই তুমি সাঁতার শিখে নেবে।'

মা বললেন, 'কিরে। বল আমাদের না-জিজ্ঞেস করে তুই আর জলের কাছে যাবি না!'

লঞ্জী ছেলের মতন ঘাড় নেড়ে পুপলু বলল, 'যাব না।'

মা বললেন, 'উফ, ভাবলে এখনও বুক কাঁপছে। যদি নৌকোটা উলটে যেত?'

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে বাবা আবার বললেন, 'জানো পুপলু, কাশ্মীরে এই যে হ্রদ দেখছ, অনেক দিন আগে কিন্তু এখানে এত হ্রদ ছিল না। এই ডাল লেক, উলার লেক—এসব কিছুই ছিল না। কার জন্য ওইসব হ্রদ হয়েছে জানো?

পুপলু বলল, 'কার জন্য?'

বাবা বললেন, 'দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এইসব করেছেন। এখানে আগে অনেক দৈত্য থাকত। বাইরে থেকে ভারতবর্ষে ঢোকাই যেত না। দৈত্যদের জয় করবার জন্য ইন্দ্র পাহাড় ফাটিয়ে এখানে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এসেছিলেন। ইন্দ্র যুদ্ধে সেই দৈত্যদের হারিয়ে দিলেন, আর সেই যে পাহাড় ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসব জায়গাতেই এইসব হ্রদ তৈরি হল। কী পুপলু, ঘুমিয়ে পড়োনি তো?'

পুপলু বলল, 'না'।

বাবা বললেন, 'সেই দৈত্যরা হেরে গেলেও সবাই কিন্তু মরে যায়নি। এখনও জলের তলায় লুকিয়ে আছে। এই হ্রদের নীচে আছে দৈত্যদের পাথরের বাড়ি। এক-একটা বাড়ি রাজপ্রাসাদের মতন!'

পুপলু বলল, 'সেই বাড়িগুলো তো আমরা দেখতে পাই না?'

বাবা বললেন, 'দেখবে কী করে? জলের তলায় কত গাছ, সেই গাছের জন্য বাড়িগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। তুমি যদি একবার জলে পড়ে যাও, অমনি দৈত্যরা তোমার পা ধরে টেনে নিয়ে যাবে, আর তোমাকে উদ্ধার করা যাবে না। বুঝলে?'

পুপলু চুপ।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছ?'

পুপলু শুকনো গলায় বলল, 'না!'

বাবা বললেন, 'তাহলে বুঝলে তো? খবরদার, একা একা জলের কাছে কক্ষনো যেয়ো না। একবার দৈত্যদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই।'

পরের দিন দুপুরে মা ইংরেজি উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পুপলুকে শুইয়ে রাখলেন নিজের পাশে। ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঠ্যালা! এই দুপুরটাই সবচেয়ে ভয়ের।

আজও বাবা দুপুরে বেরিয়েছিলেন পহলগাঁও-এর বাসের টিকিট কেটে আনতে। ফিরলেন বিকেলবেলা। পুপলু একটুও দুষ্টুমি করেনি শুনে বাবা খুব খুশি।

বিকেল বেলা হাউসবোটের কাছে বসে বাবা আর মা চা খান। পুপলুও ওর খাবার-টাবার ছাদে বসেই খেয়ে নেয়।

এই সময় অনেক ফেরিওয়ালা আসে শিকারায় চেপে। কেউ আনে শাল, কেউ কাঠের নানারকম জিনিসপত্র, কেউ আনে ফুল।

এত ফেরিওয়ালা যে তাদের তাড়ানোই খুব শক্ত ব্যাপার। তারা প্রত্যেকেই একেবারে নাছোড়বান্দা। অথচ ওদের কাছে জিনিস কিনলেই ঠকতে হয়।

সন্ধের একটু আগে একজন ফেরিওয়ালা একেবারে উঠে এল হাউসবোটের ছাদে।

তার হাতে ছোট্ট একটা বাক্স। সে বেশ বাংলাও জানে। কাশ্মীরে অনেক বাঙালি বেড়াতে যায় তো তাই এরা কাজ-চালানো গোছের বাংলাও শিখে নেয়।

বাবা কিছু বলবার আগেই সে বলল, 'কিনতে হবে না। শুধু দেখে নিন। আমার কাছে ভালো জাতের স্টোন আছে।'

https://boierhut.com/fb

বাবা বললেন, 'স্টোন নিয়ে আমরা কী করব? দরকার নেই।'

ফেরিওয়ালাটি তবু সামনে বসে পড়ে একটা বাক্স খুলল। তারপর একটা ছোট্ট পাথর তুলে নিয়ে বলল, 'এই দেখুন দিদি, এটা মরকতমণি।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'মরকতমণি। নামই শুনেছি শুধু। চোখে দেখিনি কখনো। এরকম দেখতে হয় বুঝি?'

ফেরিওয়ালাটি বলল, 'হাঁ, হাতে নিয়ে দেখে নিন না। আর এইটা আছে পদ্মরাগ।'

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বুঝলেন যে এই ফেরিওয়ালাটিকে তাড়ানো যাবে না।

মা সেই পাথরটা হাতে নিয়ে বললেন, 'ভারি সুন্দর তো! এর দাম কত?'

ফেরিওয়ালাটি বলল, 'আগে দেখে নিন না পছন্দ হয় কি-না? দামের জন্য কী আছে! আপনার ইচ্ছা করলে বিনা পয়সায় নিয়ে যাবেন!'

বাবাকেও খুশি করবার জন্য সে বলল, 'এই দেখুন সাহেব, কস্তুরী! একদম সাচ্চা জিনিস! হাতে ঘষে দিলে গন্ধ হবে। দিন, আপনার হাতটা দিন—'

ফেরিওয়ালাটি কথাবার্তায় এমন ওস্তাদ যে, বাবা আর মা একেবারে মগ্ন হয়ে পড়লেন।

হঠাৎ অনেকগুলো হাউসবোট থেকে অনেক লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

মা অমনি ভয় পেয়ে বললেন, 'পুপলু কোথায়? পুপলু কোথায় গেল?'

বাবা তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালেন।

এ দিকে হয়েছে কী, পাথরের ফেরিওয়ালাটি আসবার পরই পুপলু নেমে গেছে নীচে। হঠাৎ তার ক্যাম্বিস বলটা দেখবার ইচ্ছে হল।

বলটা দু-দিন আগেই কেনা হয়েছে। বাবা বলেছেন, পহলগাঁও গিয়ে বরফের ওপর এই বলটা দিয়ে খেলা হবে। তার আগে, এখানে জলের মধ্যে বলটা বার করবার দরকার নেই।

পুপলু তবু বলটা মাঝে মাঝে দেখে। দু-একবার ড্রপ খাওয়ায়। বলটা সাদা ধপধপে।

হাউসবোটের ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে পুপলু বলটা দু-একবার ড্রপ খাওয়াতেই সেটা বড্ড বেশি লাফিয়ে একেবারে জলে গিয়ে পড়ল।

পুপলু ভয় পেয়ে গেল খুব। বলটা হারিয়ে ফেললে বাবা বকবেন নিশ্চয়ই।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পুপলু ফিসফিস করে ডাকল, 'সেলিম! সেলিম!'

সেলিমকে পাওয়া গেল না। সেলিম থাকলে বলটা উদ্ধার করে দিতে পারত।

'স্টার অফ ইণ্ডিয়া' হাউসবোটের বারান্দা থেকে অ্যালিস বলল, 'হেই, পুপলু, ইয়োর বল ওভার দেয়ার...'

পুপলু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'চুপ!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেলিমের ডিঙি নৌকোটা পাশেই বাঁধা আছে। ওই নৌকোটায় উঠে হাত বাড়ালেই বলটা পাওয়া যাবে।

পুপলু ভাবল টক করে একবার নৌকোটায় উঠে বলটা তুলে আনলেও বাবা-মা কিছুই বুঝতে পারবেন না। নৌকোটা তো বাঁধা আছেই।

বেশি সময় নষ্ট হলে বলটা বেশি দূরে চলে যাবে। পুপলু সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠে পড়ল ছোট্ট ডিঙি নৌকোটায়!

নৌকোটা আসলে বাঁধা ছিল না। একটা দড়ি শুধু জড়ানো ছিল একটা কাঠের সঙ্গে। পুপলু নামতেই তো দড়িটা খুলে গেল।

এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল পুপলু। বলটা ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই সেটা চলে গেল আর একটু দূরে। নৌকোটাও দুলে উঠল।

এখন কী হবে? নৌকো তো সে চালাতে পারবে না! ইস, সেলিমটা যে গেল কোথায়!

অ্যালিস চেঁচিয়ে বলল, 'হেই, ইউ আর টেকিং দা বোট...অল বাই ইয়োরসেলফ? কাম হিয়ার...'

নৌকোটা আর একটু দূরে সরে যেতেই সিদ্দিকি ও আরও কয়েকজন দেখতে পেয়ে গেল তাকে। বিপদটা বুঝতে পেরেই তারা চেঁচিয়ে উঠেছে।

হাউসবোটের ছাদের ওপর থেকে বাবা দেখতে পেলেন পুপলুকে। পুপলুও দেখতে পেয়েছে বাবাকে।

ঘাবড়ে গিয়ে 'বাবা' বলে ডেকে উঠে পুপলু যেই বসে পড়তে গেল, অমনি উলটে গেল নৌকোটা।

পুপলুকে আর দেখা গেল না।

বাবা এক ঝটকায় কোটটা খুলে ফেলতে গেলেন। তিনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লেন বলে।

ফেরিওয়ালাটি সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল বাবাকে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!'

ফেরিওয়ালাটি বলল, 'বাবুজি, কী করছেন! এখান থেকে লাফালে আপনি বাঁচবেন না! দাঁড়ান!'

মা ভয়ে বিস্ময়ে এতই অবাক হয়ে গেছেন যে, কোনো কথা বলতে পারছেন না।

সিদ্দিকি, আরও দু-জন ততক্ষণে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু তারই আগে একটা শিকারা খুব জোরে ছুটে এল ওলটানো ডিঙি নৌকোটার কাছে।

মাছরাঙা পাখি যেমন জলের মধ্যে ছোঁ মেরে মাছ ধরে উঠে আসে, ঠিক সেইরকমভাবেই শিকারা থেকে একজন লোক জলে লাফিয়ে পড়ে প্রায় চোখের নিমেষেই তুলে আনল পুপলুকে।

ঠাণ্ডা জলে ডুবে যাওয়ায় পুপলুর মুখখানা নীল হয়ে গেছে। চোখ দুটো বোজা। যে লোকটি পুপলুকে উদ্ধার করে এনেছে সে বলল, 'ও কই ডর নেই, বাবুসাব। ঠিক হো জায়গা।'

https://boierhut.com/fb

মা পুপলুকে কোলে নিয়ে বসে রইলেন। বাবা তাড়াতাড়ি খানিকটা ব্র্যাণ্ডি জোগাড় করে ঢেলে দিলে পুপলুর মুখে।

একটু বাদেই পুপলুর জ্ঞান ফিরল।

তাতেও মা আর বাবা নিশ্চিন্ত হলেন না। অত ঠাণ্ডা জলে ডুবে গিয়েছিল। যদি কঠিন কোনো অসুখ হয়!

সাহেবদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তিনি পুপলুকে দেখে বললেন, 'না, কোনো ভয়ের কারণ নেই।'

কাছাকাছি অনেকগুলো হাউসবোট থেকে অনেকে এল পুপলুকে দেখতে। কিন্তু সন্ধের পরই পুপলু একেবারে ভালো হয়ে গেল। লাফালাফি করে খেলতে গেল অ্যালিসদের হাউসবোটে।

সেদিন রাতে শুয়ে পড়বার পর তার বাবা কিছুক্ষণ আলো জ্বেলে বই পড়লেন। মা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনেক রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ।

এর মধ্যে পুপলু বলল, 'বাবা, জানো তো, জলের তলায় কী দেখলাম?'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

পুপলু বলল, 'সেই দৈত্যদের বাড়ি দেখলাম। গাছপালার আড়ালে মস্ত বড়ো বাড়ি!'

বাবা বললেন, 'তাই নাকি?'

পুপলু বলল, 'হ্যাঁ। সেই দৈত্যগুলো মোটেই খারাপ নয়, বেশ ভালো। আমায় দেখে বলল, এই যে এসো, এসো! সেখানে একজন রাজকন্যাও রয়েছে, ঠিক আমার সমান। বাংলায় কথা বলতে পারে...আমায় দেখে বলল, তুমি কলকাতার পুপলু না? তুমি থাকবে আমাদের বাড়িতে? বাবা, তোমরা তো দেখোনি! আমি কীরকম জলের তলায় দৈত্যদের দেশ দেখে এলুম। বাবা, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে?'

বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

https://boierhut.com/fb

কাছাকাছি আট-দশখানা গ্রামের মধ্যে একজনই ডাক্তার। ভরত ডাক্তার। তাঁর উপর সবারই খুব বিশ্বাস। কয়েকজন কবিরাজ আছেন ঠিকই। কিন্তু কবিরাজ তো আর ডাক্তার নন। সিরাজসাহেব হেকিমি চিকিৎসা করেন, কিন্তু সে-ও তো হেকিমি, ডাক্তারি নয়। লোকের ধারণা, ভরত ডাক্তার বিলিতি ওষুধ দেন, তাতেই সব রোগ সারে। তা ছাড়া, তিনি সুই দেন মাঝে মাঝে। অর্থাৎ ইঞ্জেকশন। তা তো কবিরাজ কিংবা হেকিম দিতে পারেন না।

ভরত ডাক্তার বেশ ভালো ডাক্তার এবং ভালো মানুষ। দূর-দূর গ্রামের লোক তাঁকে ডাকলেই তিনি চলে যান। গোলগাল ফর্সা চেহারা, একটু বেঁটে, মাথায় সুন্দর চকচকে টাক।

তখনকার দিনে গ্রামে রাস্তাঘাট প্রায় কিছুই ছিল না। বর্ষার সময় লোকে যাতায়াত করত নৌকোয়, আর গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে গেলে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। সরু আলপথ কিংবা এবড়োখেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে সাইকেল চালানোও খুব কষ্টকর।

কিন্তু একজন ডাক্তার কী করে হেঁটে হেঁটে রুগি দেখতে যাবেন? তাহলে তো দু-তিন জায়গার বেশি যাওয়াই যায় না। অথচ শীত শেষ হতে-না-হতেই মানুষের খুব রোগভোগ শুরু হয়।

তাই ভরত ডাক্তার রুগি দেখতে যান ঘোড়ায় চেপে। ভরা বর্ষার সময় নৌকো। অন্য সময় ঘোড়া। ডাক্তার ছোটোখাটো মানুষ বলে তাঁর ঘোড়াটিও তেমন বড়ো নয়। কখনো খুব জোরে ছোটে না।

ঘোড়ায় একটা সুবিধে, সকাল-দুপুর-রাত যেকোনো সময়েই নিয়ে যাওয়া যায়। ঘোড়ারা সহজে ক্লান্ত হয় না, তাদের ঘুমও কম হয়। পা ব্যথা থেকে মাথা ব্যথা সবরকম চিকিৎসাই করতে হয় ভরত ডাক্তারকে। তাই এক-একদিন রাতবিরেতেও তাঁর ডাক পড়ে। রুগির এখন-তখন অবস্থা। ভরত ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিলেই সে বেঁচে উঠবে। অনেকে মাঝরাতেও শুনতে পায় ঘোড়ার পায়ের কপ কপ শব্দ, তাতে বুঝে যায় ভরত ডাক্তার কোথাও কোনো মুমূর্ষুকে বাঁচাতে যাচ্ছেন।

ভরত ডাক্তারের ফি মাত্র দু-টাকা। কেউ কেউ তাও দিতে পারে না। কেউ কেউ কাঁচুমাচু মুখ করে মাথা চুলকে বলে, 'ডাক্তারবাবু, হাতে তো এখন পয়সাকড়ি নেই, পরে শোধ করে দেব। যদি দয়া করেন।'

ভরত ডাক্তার জানেন, পরে আর কেউ শোধ করে না। তবু রাগারাগি করেন না তিনি। উদারভাবে বলেন, 'ঠিক আছে। তোকে পয়সা দিতে হবে না। আমার ঘোড়াটার জন্য এক বস্তা ঘাস পাঠিয়ে

https://boierhut.com/fb

দিস। কিংবা, তোদের ঘরের মাচায় তো দেখলাম দুটো বেশ পুরুষ্টু লাউ ঝুলছে, তার একটা দে, অনেক দিন লাউয়ের শুক্তো খাইনি।'

ডাক্তারের এই উদারতার সুযোগ নিয়ে কারুর-কারুর কাছে টাকা থাকলেও তা না-দিয়ে কিছু জিনিস দিতে চায়। একটা লাউয়ের দাম মোটে চার আনা, আর এক বস্তা ঘাস বড়ো জোর আট আনা।

সব রুগিই তো আর শেষপর্যন্ত বাঁচে না। দুনিয়ার কোনো ডাক্তারই বাঁচাতে পারেন না সব মানুষকে। কোনো বাড়িতে রুগির মৃত্যু হলে ভরত ডাক্তার ফি তো নেনই না, বরং পকেট থেকে দু-পাঁচ টাকা বের করে দেন শ্মশান খরচের জন্য।

ডাক্তারের বাড়ির লোক অবশ্য এমন উদার নন। এত নামকরা ডাক্তার কিন্তু টাকা-পয়সা এত কম উপার্জন করেন বলে বকাবকি করেন তাঁর বউ। দুটো ছেলে আছে, মহা-বিচ্ছু। রাত্তিরে বাবা বাড়ি ফিরলেই তারা তাঁর পকেট হাতড়ে দেখে, তারপর ঠোঁট উলটে বলে, 'মোটে এই।'

ডাক্তারের ঘোড়াটির নাম ছোট্টু। তার দেখাশুনো করে বদন ভুঁইমালি। সে ছোট্টুকে ঘাস খাওয়ায়, ছোলা খাওয়ায়, দলাইমলাই করে। আর সপ্তাহে একদিন গায়ে জল ঢেলে স্নানও করিয়ে দেয়। অন্য কেউ ছোট্টুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে এলে ছোট্টু তা মোটেই পছন্দ করে না, জোরে জোরে মাথা নাড়ে আর ছিঁ-হি-হি করে ডেকে ওঠে।

ঘোড়ার দেখাশুনো ছাড়াও এ বাড়ির আরও অনেক কাজ করতে হয় বদনকে।

বদনের কাছে ডাক্তারবাবু যে স্বয়ং এক দেবতা। কোনোদিন তিনি বদনকে বকাবকি করেন না। মাস-মাইনে ছাড়াও তিনি বদনকে এক টাকা-দু-টাকা বকশিশ দেন, বদনের বাবা সাধুচরণকে সাপে কামড়েছিল, তাকে পর্যন্ত সারিয়ে তুলেছিলেন ভরত ডাক্তার। তাঁর ওষুধের এমন গুণ।

এক ঝড়-জলের রাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন ভরত ডাক্তার। তাঁর গায়ের জামা ছেঁড়া, মুখে ফালা-ফালা দাগ, সেখান থেকে রক্ত পড়ছে, ফুলে গিয়েছে একটা চোখ। সোনালি ফ্রেমের চশমাটাও নেই।

কী হয়েছে? কী হয়েছে?

ডাক্তারবাবু একেবারে চুপ।

বউ, ছেলে-মেয়ে কারুর প্রশ্নেরই তিনি জবাব দেন না। পোশাক বদল করে তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছু খাবারও খেলেন না।

এরপর দু-দিন ডাক্তারবাবু ওই একইরকম রইলেন, কোনো কথাও বললেন না, রুগি দেখতেও বেরোলেন না। অবশ্য ঝড়-বৃষ্টি চলছেই।

পাড়াপ্রতিবেশীরা দেখা করতে এল অনেকেই। ডাক্তারবাবু কথা বলছেন না বলে কেউ কিছু জানতেও পারল না। তখন কেউ কেউ বলতে লাগল, 'ডাক্তারবাবুকে ডাকাত ধরেছিল নিশ্চয়ই।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাতে কয়েকজন বলল, 'যা:, তা হতেই পারে না। এ তল্লাটের সবাই ডাক্তারবাবুকে ভালোবাসে। ডাকাতরাও তাঁকে দেখলে প্রণাম করে। কত দিন তিনি কত রাতে বাড়ি ফিরেছেন। কখনো কিছু হয়নি।'

আর ক-জন বলল, 'তাহলে নিশ্চয়ই ভূতে ধরেছিল। ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করলেও তো কেউ কেউ ভূত হয়, সেরকম কোনো ভূত যদি রেগে থাকে।'

তা শুনে একজন বলল, 'আরে কী যে বলো! কেউ মরলেও মরতে মরতে ভাবে, ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য করেছেন, নেহাত আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই মরতে হল। ডাক্তারবাবুর উপর রাগ করবে কেন? তা ছাড়া তিন-চার দিনের মধ্যে তো এই তল্লাটের কেউ মরেনি।'

এইসব তর্কাতর্কিতে আসল ব্যাপারটা আর বোঝা গেল না।

তৃতীয় দিনে ডাক্তারবাবু বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বসে রইলেন কিছুক্ষণ। উঠোনের এক- পাশে একটা গোয়ালঘর, তার পাশে একটা আস্তাবল। সেখানে বদন দলাইমলাই করছে ঘোড়াটাকে।

একসময় ডাক্তারবাবু হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, 'এই বদন, শোন। এদিকে আয়।'

বদন কাছে এসে প্রণাম করে উবু হয়ে বসল।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বদন রে, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আমার মৃত্যুদিন ঘনিয়ে এসেছে।'

তা শুনে বদন দারুণ চমকে উঠে বলল, 'এ কী কথা বলেন কর্তা? আপনি কত মানুষকে চিকিৎসা করে বাঁচাচ্ছেন। আপনি নিজের দু-ফোঁটা ওষুধ খেলেই তো সেরে উঠবেন। আপনি মরবেন কেন?'

ডাক্তারবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওরে, ডাক্তাররা নিজের চিকিৎসা করতে পারে না। ডাক্তারদেরও মরতে হয়। আমি বুঝে গিয়েছি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

তা শুনেই বদন ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমার কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোন। আমি মরে গেলে তোকে বোধ হয় আর এ বাড়িতে কাজে রাখবে না। আমার ছেলেরা তোকে পছন্দ করে না। তা তুই অন্য বাড়িতে কাজ পেয়ে যাবি। কিন্তু আমার ঘোড়াটার কী হবে বল তো?'

বদন চোখ মুছে বোকার মতো বলল, 'আপনার ঘোড়া? ছোট্টু? তার কী হবে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁরে, আমার ছেলেরা ছোট্টুকেও পছন্দ করে না। ওকেও রাখবে না। বিক্রি করে দেবে। তারপর?'

বদন বলল, 'বিক্রি করে দেবে? তারপর?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বিক্রি করে দিলে কে কিনবে জানি না। যদি কোনো গাড়িওয়ালাকে দেয়, সে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রোজ চাবুক মারবে। তাহলে আমি মরে গিয়েও শান্তি পাব না। ছোট্টু

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমায় কত সার্ভিস দিয়েছে। বদন, ছোট্টুকে আমি তোর হাতে দিয়ে যাব। তুই আগের মতোই ওর দেখাশুনো করবি। প্রতিজ্ঞা কর। তুই ওকে কোনো দিন বিক্রি করে দিবি না?'

বদন প্রথমে অনন্দে ডগমগ হয়ে বলল, 'কর্তা, ছোট্টু আমার কাছে থাকবে? আহা-হা, কী ভালো। কী ভালো! কোনোদিন ওকে বিক্রি করব না। তাহলে আমার পাপ হবে! তিন সত্যি করছি, কোনোদিন ওকে বেচব না।'

তারপরই সে মুখ শুকনো করে বলল, 'কিন্তু কর্তা, আমি গরিব মানুষ। আমি একটা ঘোড়া পালব কী করে? অন্য বাড়িতে চাকরি করলে কী করে ওর দেখাশোনা করব? ছোলা আর বিচালি কেনার পয়সাই বা পাব কোথায়?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তাও তো কথা বটে। গচ্চা তো আছেই। ঠিক আছে, আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে যাব, যাতে তুই মাসে মাসে কিছু টাকা পাবি।'

পরদিনই মারা গেলেন ডাক্তারবাবু। একেবারে জলজ্যান্ত অবস্থায়। রাত্তিরে ঘুমিয়ে ছিলেন, সকালবেলা আর জাগলেন না।

বদনের জন্য ডাক্তারবাবু কী ব্যবস্থা করে গেলেন তা জানা গেল না। বোধ হয় তিনি সময় পাননি।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বদনকে বললেন, 'কাল থেকে আর তোকে আসতে হবে না। আমরা কম টাকায় অন্য লোক রাখব। তুই বুড়ো হয়ে গিয়েছিস, তোকে দিয়ে আর চলবে না।'

বদন গিন্নিমাকে প্রণাম করে ছোট্টুকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পরদিন সকালেই ডাক্তারবাবুর ছেলে সুধীর বদনের বাড়িতে এসে খুব চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল।

সে বলল, 'তুই কোন সাহসে আমাদের ঘোড়া নিয়ে চলে এলি? তুই একটা চোর। তোকে পুলিশে দেওয়াই উচিত। নেহাত পুরোনো লোক বলে দিচ্ছি না।'

বদন যতই বলে ডাক্তারবাবু ঘোড়াটা তাকেই নিতে বলেছেন, তা সুধীর শুনতেই চায় না। সে জোর করে ছোট্টুকে নিয়ে চলে গেল, বদন কোনো বাধাই দিল না।

সন্ধ্যেবেলাই ফিরে এল ছোট্টু। বদনের বাড়ির কাছে এসে চিঁ-হি-হি করে ডাকল।

দুদিন পরে সুধীর এসে আবার অনেক গালাগালি করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ছোট্টুকে। এবার সে ছোট্টুকে বিক্রি করে দিল কলিমুদ্দিন মিঞার কাছে। কলিমুদ্দিনের দু-খানা ঘোড়ার গাড়ি আছে। তার মধ্যে একটা ঘোড়ার মার খেতে খেতে খুব কাহিল অবস্থা।

সেখান থেকেও পালিয়ে এল ছোট্টু। সে যেন ঠিক জানে ডাক্তারবাবুর মনের কথা।

https://boierhut.com/fb

কলিমুদ্দিন মিঞা যখন জানতে পারল যে ঘোড়াটি ফিরে গিয়েছে বদনের কাছে, তখন সে কিন্তু রাগারাগি করল সুধীরের উপরেই। বদনের দোষ কী? সে তো ঘোড়া চুরি করে আনেনি। ঘোড়া নিজে থেকে তার বাড়ি চলে এলে সে কী করবে?

চারদিকে রটে গেল, ডাক্তারবাবুর ঘোড়া বদন ছাড়া আর কারুর বাড়িতেই থাকবে না। তাহলে আর এ ঘোড়া কে কিনবে?

তারপর থেকে ছোট্টু রয়ে গেল বদনের কাছে। কিন্তু সে গরিব মানুষ, ঘোড়া দিয়ে কী করবে? অন্য একটা বাড়িতে সে কাজ পেয়েছে, সেখানে সারাদিন খাটতে হয়। ঘোড়ায় চড়ার সময়ই বা সে পাবে কখন, ঘোড়ায় চড়ে সে যাবেই বা কোথায়?

এক-একদিন ভোরবেলায় ঘোড়াটা নিয়ে বেরোলে মাঠের লোকেরা তাকে দেখে হাসে, ঠাট্টা করে। কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলে, 'কিরে বদন, ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিস নাকি? ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সদ্দার।'

কেউ বলে, 'এই রে, গরিবের ঘোড়া রোগ হয়েছে!'

দিনেরবেলা আর সে ঘোড়া নিয়ে বেরোয় না। কোনো কাজেই লাগে না। তাও তো ঘোড়াকে খাওয়াতে হয়। ঘাস কাটার সময় পায় না সে। ছোলাটোলা কিনতেও তো পয়সা লাগে। কিন্তু সে ডাক্তারবাবুর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছে ঘোড়াটার কখনো অযত্ন হবে না। মহা মুশকিল।

বদনের ছেলে নেই, আছে দুটি মেয়ে আর বউ। তারা তো জানেই না কী করে ঘোড়ার যত্ন নিতে হয়। বদনই রাত্তিরে ফিরে এসে ছোট্টুকে দলাইমলাই করে। নিজেরা আধপেট খেয়েও ছোট্টুকে খেতে দেয়। ঘাস-বিচালির বদলে ছোট্টুকে ভাত কিংবা রুটি দিলেও দিব্যি খেয়ে নেয় সে। তাকে বেঁধে রাখা হয় না, সারাদিন সে বাড়ির আশপাশেই ঘোরাফেরা করে, দূরে কোথাও যায় না।

মাঝে মাঝে বদন ছোট্টুর সঙ্গে কথাও বলে। ছোট্টুও যেন বুঝতে পারে সব কিছু। বদন তার ঘাড়ে চাপ্পড় মেরে বলে, 'ওরে ছোট্টু রে, আমি তোকে ঠিকমতো যত্ন করতে পারি না। আমরা যে খুব গরিব।

ছোট্টু মুখ দিয়ে ফ-র-র-র শব্দ করে, যেন এইটুকু আদর পেয়েই সে খুব খুশি।

একদিন বদন ভাবল, বেশি রাত্তিতে ছোট্টুকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এলেও তো হয়। রাত্তিরে তো কেউ দেখতে পাবে না। কেউ ঠাট্টাও করবে না। তা ছাড়া ঘোড়ার মতো একটা প্রাণীকে তো মাঝে-মাঝে ছোটানোও দরকার। দৌড়াদৌড়ি না-করলে ঘোড়ার পায়ে বাত হয়।

ছোট্টুর পিঠে জিন পরিয়ে বদন চেপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটা শুরু করল ছোট্টু মনের আনন্দে। প্রথমে আস্তে, তারপর বেশ জোরে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আকাশ পরিষ্কার, ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, তার মধ্যে ঘোড়া ছোটাতে ভারি আরাম। বদনের মনে হল, সে যেন বদন ভুঁইমালির মতো একজন সাধারণ এলেবেলে মানুষ নয়, সে একজন সেনাপতি। হাতে তলোয়ার নেই, এই যা!

বদন ভেবেছিল সে শুধু গ্রামের চারপাশটা ঘুরে আসবে। কিন্তু খানিক বাদে সে ফিরতে চাইলেও ছোট্টু ফিরবে না। সে ছুটতে লাগল আপন খেয়ালে। বেশ জোরে। বদন তাকে থামাতেই পারছে না।

ছোট্টুর পিঠে জিন পরিয়ে বদন চেপে বসল...

দু-খানা গ্রাম ছাড়িয়ে ছোট্টু এসে থামল একটা বড়ো বাড়ির সামনে। দু-পা তুলে চিঁ-হি-হি করে ডাকল। সেই ডাক শুনে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দু-জন লোক। একজন লোক অবাক হয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবুর ঘোড়া! ওমা, ডাক্তারবাবু এসেছেন! ডাক্তারবাবু, আসুন আসুন। আমাদের রতনের খুব জ্বর। আপনি কী করে জানলেন?'

সেদিনের আকাশ মেঘলা। বাইরেটা বেশ অন্ধকার। ঘোড়ার পিঠে কে বসে আছে তা বোঝা যায় না। অন্য লোকটি বলল, 'যা:, ডাক্তারবাবু তো স্বর্গে গিয়েছেন, তিনি কী করে আসবেন? এ অন্য কেউ।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বদন তখন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'বাবুরা আমায় মাপ করবেন। আমি বদন ভুঁইমালি। ডাক্তারবাবুর ঘোড়াটা আমার কাছে এখন থাকে।'

একজন বলল, 'অ, তাই বলো। তা তুমি এখানে এলে কীজন্য? কিছু দরকার আছে?'

বদন বলল, 'আজ্ঞে না। এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘোড়াটা এখানেই একবার থামল।'

অন্যজন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের রতনের ধুম জ্বর। এত রাতে ডাক্তার-বদ্যি কোথায় পাব! তুমি কি চিকিৎসার কিছু জানো? তুমি তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ছিলে।

বদন জিভ কেটে বলল, 'বাবু, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। ওষুধ-বিসুধের কিছুই জানি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের বাড়ির ছেলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক।'

ছোট্টু এবার ছটফটিয়ে উঠল। উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে শুরু করল দৌড়। সোজা বদনের বাড়ি।

এর দু-দিন পর আবারও ঠিক ওই রকম ব্যাপার হল। বেশি রাত্তিরে বদন ছোট্টুর পিঠে চাপতেই সে ছুটতে লাগল আপন খেয়ালে।

এবারে গিয়ে থামল অন্য দিকের আর একটা গ্রামের একটা বাড়ির সামনে। এ বাড়ির ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে কান্নার আওয়াজ। কেউ বুঝি মারা গিয়েছে। ভয় পেয়ে বদন কাঁপা গলায় বলল, 'এ কোথায় এলি রে ছোট্টু? চল-চল ফিরে চল।'

ছোট্টু মুখ দিয়ে ফ-র-র-র শব্দ করল।

এ বাড়ি থেকেও একজন লোক বেরিয়ে এসে খুব অবাক হল। ভরত ডাক্তারের ঘোড়াকে অনেকেই চেনে। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এ বাড়িতেই আগে এসেছে কয়েকবার। আজ সেই ঘোড়ার পিঠে কে?

বদন হাত জোড় করে বলল, 'আমায় মাপ করবেন বাবু। আমি অতি সামান্য লোক। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।'

লোকটি বলল, 'আমার মেয়ে মায়ারানির ভেদবমি শুরু হয়েছে সন্ধে থেকে। এখন-তখন অবস্থা। ডাক্তারবাবুর ঘোড়ায় চাপো, তুমি কি চিকিৎসার কিছু জানো?'

এখানেও লজ্জা পেয়ে সে বলল, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। ওসব কিছুই জানি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার মেয়ে সেরে উঠবে।'

তৃতীয়বার মাঝরাত্তিরে ছোট্টু বদনকে নিয়ে এল আর একটা বাড়ির সামনে। এটা বেশ বড়ো বাড়ি, কোনো জমিদার-টমিদারের হবে বোধ হয়। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। তারাও বদন ডাক্তারের ঘোড়াটাকে চেনে। যে এখন ঘোড়াটা চালাচ্ছে, তাকে চেনে না। একজন লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে হে? তুমি বুঝি এই ঘোড়াটা কিনেছ?'

বদন বলল, 'আজ্ঞে না ঘোড়া কিনব সে সামর্থ্য আমার কোথায়? আমি অতি গরিব লোক, ডাক্তারবাবু এ ঘোড়াটা আমায় দিয়ে গিয়েছেন।'

https://boierhut.com/fb

লোকটি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আহা, ডাক্তারবাবু ছিলেন অতি মহৎ মানুষ। শেষবার তো এ বাড়িতেই ছোটো কত্তার চিকিৎসে করতে এসেছিলেন। সে রাতেই তিনি ফেরার সময় ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলেন। লোকে বলে, শ্মশানতলায় একটা বটগাছের ডাল নেমে এসে ওঁকে খুব মেরেছিল। লোকে তো কত কথাই বলে। অমন একজন মানুষকে একটা গাছ মারবে কেন? হয়তো ঝড়ে গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছিল মাথায়। যাইহোক, তুমি যে আজ এই সময় এলে? তুমি কি কোনো খবর পেয়েছ?'

বদন হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে না। কীসের খবর?'

লোকটি বলল, 'আমার মাতৃদেবী আজ চলে যাচ্ছেন। এখন-তখন অবস্থা। কবিরাজ-বদ্যিরা সব জবাব দিয়ে গিয়েছেন। সারাদিন ধরে অজ্ঞান, শুধু শ্বাস আছে একটু একটু। তোমাকে দেখে ভাবলাম, তুমি বুঝি কোনো ওষুধ এনেছ। এখন তো আর কোনও আশা নেই, যে যা বলছে তাই শুনছি।'

বদন অন্য দিনের মতো কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'আজ্ঞে, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, ওষুধের কথা কিছুই জানি না।'

বাড়ির সামনের উঠোনে একটা খাটের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে বৃদ্ধাকে। একজন তার মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছে। বদন ঘোড়া থেকে নেমে সেই খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। তার মনে পড়ল নিজের মায়ের কথা। চোখে জল এসে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হে ভগবান, ভাল করে দাও, ভাল করে দাও!' ফেরার পথে সে রাতে বদন বকুনি দিতে লাগল ছট্টুকে ছোট চাপড় মেরে বলল, 'তুই এটা কি করছিস ছট্টু? শুধু শুধু আমাকে এক-একজন রুগির বাড়িতে নিয়ে আসিস! মানুষের রোগভোগের কষ্ট দেখতে কি ভাল লাগে? আমারও কষ্ট হয়। আর আমি রাত্তিরে তোকে নিয়ে বেরোব না।'

দু-দিন বাদে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ঘোড়া ছুটিয়ে একজন এল বদনের বাড়িতে। তিনি পুলিশের দারোগা। এ তল্লাটে জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট দারোগারাই তো ঘোড়া হাঁকান। বদনের মতো গরিব লোকের তো ঘোড়া থাকার কথা নয়।

দারোগাসাহেব বদনকে ডেকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু তাঁর এই ঘোড়াটা তোমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন?'

বদন বলল 'আজ্ঞে, সে কথাটা শুধু ভগবান জানেন। ডাক্তারবাবু তো আর কাউকে কিছু বলে যায়নি। কেউ যদি অবিশ্বাস করতে চায়, আমি নিরুপায়।'

দারোগা বললেন, 'তুমি ঘোড়া নিয়ে কী করবে? বিক্রি করো দাও না কেন?'

আমি বিক্রি করতে পারব না। ডাক্তারবাবুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। তবে কেউ যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায়, আমি কি করে বাধা দেব? এ ঘোড়া কিন্তু অন্য কারওর কাছে থাকতে চায় না।'

https://boierhut.com/fb

দারোগা বললেন, 'হুঁ: বাধা নেই তো দেখছি। শোনো বদন, তুমি যে সে রাতে জমিদার মুরারি চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েছিলে, কেউ তোমাকে খবর দিয়েছিল?'

বদন বলল 'আমি সামান্য মানুষ, আমায় কে খবর দেবে? কেনই বা খবর দেবে?'

দারোগা বললেন, 'ভরত ডাক্তারকে যেই কল দিত, রাত বিরেতে হলেও তিনি ঠিক যেতেন। তুমি গিয়েছিলে কেন?'

বদন বলল, 'তাও জানি না হুজুর। ঘোড়াটাই আমাকে ওখানে নিয়ে গেল।'

দারোগা ঘোড়াটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন, 'এর মধ্যে এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে। ও বাড়ির বুড়ি মায়ের তো সেদিন মরণ একেবারে ঘনিয়ে এসেছিল। কবিরাজি চিকিৎসায় কোনো কাজ হয়নি। দু-একজন বলেছিল, ভরত ডাক্তার বেঁচে থাকলে হয়তো কিছু একটা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো আর নেই। এর কিছু পরেই ভরত ডাক্তারের ঘোড়া নিয়ে তুমি উপস্থিত হলে সেখানে। তারপর দু-ঘণ্টা যেতে-না-যেতে বুড়ি চোখ মেললেন। আজ তো তিনি স্নান করতে গেলেন পুকুরঘাটে। একেবারে সুস্থ। তোমাদের দেখেই নাকি এমনটা হয়েছে। নইলে তো কোনোক্রমেই বাঁচার কথা নয়। সেই জন্য জমিদারবাবু তোমাকে আর ওই ঘোড়াকে পঞ্চাশটা টাকা উপহার পাঠিয়েছেন।'

বদন চক্ষু চড়কগাছে তুলে বলল, 'পঞ্চাশ টাকা? সে তো আমি কখনো একসঙ্গে দেখিনি।'

শুধু তাই নয়, এর পর জানা গেল, আর যে দুটো বাড়িতে ছোট্টু নিয়ে গিয়েছিল বদনকে, সেই দু-বাড়ির রতন আর মায়ারানিও সেরে উঠেছে একেবারে। তারাও কিছু টাকা পাঠাল।

চারিদিকে রটে গেল ভরত ডাক্তার বেঁচে না-থাকলেও এখনও তিনি চিকিৎসা চালাচ্ছেন। অনেক বাড়ি থেকে এখন বদন আর ছোট্টুর ডাক পড়ে। ইচ্ছে থাক বা না-থাক, বদনকে যেতেই হয়। সে ওষুধ দেয় না, শুধু প্রার্থনা করে। তাতেই অনেক রুগি সেরে ওঠে। যে কয়েকজন সারছে না, তাদের বাড়ির লোক ধরে নেয়, তাদের আয়ু একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে। আয়ু না-থাকলে ডাক্তার কী করবে!

ওইসব বাড়ি থেকেই বদন এখন এক টাকা-দু-টাকা কিংবা লাউ-কুমড়ো, কিংবা ছোট্টুর জন্য ঘাসের বস্তা পায়।

ভরত ডাক্তার বদনকে যে-কথা দিয়েছিলেন, সেকথা রেখেছেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পার্বতীপুর স্টেশনে নেমেই সুজয়ের গা-টা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। দু-চোখের কোণ জ্বালা করতে লাগল একটু একটু, আঙুলের ডগাও ভোঁতা-ভোঁতা লাগল। জুন মাসের দুপুর, গনগন করছে রোদ, তাও সুজয়ের হঠাৎ শীত লাগল। জ্বর আসবার সময়ে এইরকম হয়।

স্টেশনটা ছোটোখাটো, অতি সাধারণ। বাবা ট্রেন থেকে মালপত্র নামাচ্ছেন, মা আর দিদি একপাশে দাঁড়িয়ে বাক্স-প্যাঁটরা গুনছে। সুজয় একটু দূরে সরে গেল। ধুৎ, বেড়াতে এসে জ্বর হবার কোনো মানে হয়? মা টের পেলেই বিছানায় শুইয়ে রাখবেন।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা উঠল ওভারব্রিজে। মাঝামাঝি আসবার পর সুজয়ের মনে হল ব্রিজটা কোথায় যেন ভাঙা। তক্ষুনি কুলিটি বলল, 'দেখবেন বাবু, সাবধান, সামনে দুটো কাঠ ভাঙা আছে।' সুজয় অবাক হয়ে গেল--ওই কথাটা হঠাৎ তার মনে হল কেন? সে তো ভাঙা জায়গাটা দেখতে পায়নি। দু-খানা তক্তা নেই সেখানে, কেউ অন্যমনস্ক থাকলে গলে নীচে পড়ে যেতে পারে।

স্টেশনের বাইরে একটি মাত্র নীল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর কয়েকখানা সাইকেল রিকশা। বাবা বললেন, 'ওই যে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে।'

বাবার বন্ধু রঞ্জিতকাকুর মামাবাড়ি পার্বতীপুরে। রঞ্জিতকাকুর মামারা একসময়ে এখানকার জমিদার ছিলেন। এখন তো আর জমিদারি নেই। কিন্তু সেই আমলের একটা প্রকান্ড বাড়ি আছে। বড়ো বড়ো দুটো দিঘি আর ফলের বাগান আছে। রঞ্জিতকাকু প্রায়ই পার্বতীপুরের এই বাড়ির গল্প করতেন, তাই বাবা একদিন বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা করে দাও না, আমরা ওখানে কিছুদিন থেকে আসি।'

রঞ্জিতকাকু বলেছিলেন, 'কোনোই অসুবিধে নেই।' তাঁর এক মামা এখনও সেখানে থাকেন। অন্য মামারা থাকেন কলকাতায়, গ্রামে আর আসতে চান না। কিন্তু তাঁর মেজোমামা এখানেই থাকতে ভালোবাসেন। তিনিই এ বাড়ির দেখাশুনা করেন।

রঞ্জিতকাকু তাঁর মেজোমামাকে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি নিজেও সঙ্গে আসবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আটকে গেছেন কাজে।

একটা মস্ত বড়ো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের গাড়িটা। সুজয় বেশির ভাগ গাছই চেনে না, কিন্তু এটা যে অশ্বত্থ গাছ তা চিনতে পেরেছে। পার্বতীপুর স্টেশনের বাইরে একটা গাছ থাকবে তাও যেন সে জানত।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুজয়ের একই সঙ্গে শীতও করছে, গরমও লাগছে। গাড়ি থেকে একজন লম্বা, শুকনো চেহারার লোক নেমে বিনীতভাবে হাতজোড় করে বলল, 'মেজোবাবু নিজে আসতে পারেননি। আপনাদের ট্রেনে আসতে কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো? দয়া করে গাড়িতে উঠে বসুন।'

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুজয়ের মনে হল লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।

গাড়িটা স্টার্ট নেবার সময় প্রচুর শব্দ করল। এমন ফটফট দুমদাম শব্দ যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে গাড়িটার গায়ে হাত বুলোচ্ছিল, তারা ওই শব্দ শুনে দূরে সরে গেল ভয়ে।

একটুখানি পাকা রাস্তার পরই গাড়িটা নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। সেইখান দিয়েই চলতে লাগল ধুমধামের সঙ্গে। গাড়িটা লাফাচ্ছে যেন ঘোড়ার মতন।

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গতবছর বন্যায় এদিককার রাস্তা সব ভেঙে গেছে তো। গাড়ি চালাবার উপায় নেই।'

বাবা বললেন, 'তাহলে গাড়ি আনলেন কেন? আমরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে না হয় হেঁটেই যেতুম। বেশি দূর তো নয়।'

ড্রাইভার বলল, 'না, বেশি দূর নয়, এই মাত্র মাইল পাঁচেক।' বাবা বললেন, 'অ্যাঁ? রঞ্জিত যে বলেছিল স্টেশনের কাছেই বাড়ি!' ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, আগে খুব কাছে ছিল, এখন যে রেলস্টেশনটা দূরে সরে গেছে!'

সুজয় বসে আছে ড্রাইভারের পাশে, তার এসব কোনো কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না।

মিনিট দশেক যাবার পরেই গাড়িটা ক্যাঁকর-কোঁ ভুরর-ভট শব্দ করে একেবারে থেমে গেল। ড্রাইভার নেমে গিয়ে বনেট খুলে খুটখাট আরম্ভ করল।

মা বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি বলেছিলুম পুরী যেতে। শুনলে না তো আমার কথা!'

ড্রাইভার উঁকি মেরে বলল, 'উপায় নেই, ঠেলতে হবে।' সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। রোদ একেবারে ঝাঁঝাঁ করছে, তবে গতকালই বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, মাঠের এখানে সেখানে জল জমে আছে। মা তো কাদার মধ্যেই পা দিয়ে ফেললেন। ড্রাইভার বলল, 'সাবধান, দেখবেন এখানে বড্ড সাপখোপের উপদ্রব, কালই একজনকে সাপে কেটেছে।'

দিদি তাই শুনে এক লাফ দিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলে, 'সাপে কেটেছে মানে সাপে কামড়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায়? এই মাঠে?'

'মাঠে তো সাপের কামড়ে প্রায়ই এক-আধজন মরে। কাল একজন মরেছে আমাদের রাজবাড়িতেই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মা বললেন, 'স্টেশনটা তো বেশ কাছে। ফিরে গেলে হয় না?'

বাবা বললেন, 'আহা, আগেই অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

মাঠের সামনে একটা উঁচু বাঁধ। গাড়িটা অনেক কষ্টে ঠেলে তোলা হল ওপরে। সবাই দারুণভাবে হাঁপাতে লাগল। সুজয়ের শরীরটা কাঁপছে। ঠিক ম্যালেরিয়া রুগির মতো।

ড্রাইভার বলল, 'এইবার উঠে বসুন, আর চিন্তা নেই।'

গাড়ি চলতে শুরু করল আবার। সুজয়ের মনে হল গাড়িটা আসলে খারাপ হয়নি। লোকটি ইচ্ছে করে ঠেলাল ওদের দিয়ে। মাঠটা পার করে দিল এইভাবে।

বাঁধের ওপরে বেশ ভালো রাস্তা। একটু বাদেই সেটা গিয়ে মিশেছে পাকা রাস্তায়। তারপর আবার মিনিট দশেক চলার পর একটা মোড় এল। রাস্তার মাঝখানটা গোল করে বাঁধানো। তার সামনে, বাঁদিকে আর ডানদিকে তিনটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। গাড়িটা বাঁদিকে বেঁকতেই সুজয় বলে উঠল, 'ডানদিকে।' মা, বাবা, দিদি সবাই তার দিকে তাকাল। ড্রাইভারও ঘচ করে ব্রেক কষে সুজয়ের দিকে চেয়ে রইল।

সুজয় দৃঢ়ভাবে বলল, 'এবার ডানদিকে যেতে হবে।'

ড্রাইভারটি কাঁচুমাচুভাবে বলল, 'হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়ে গেছে। এদিকে তো বেশি আসা হয় না।'

পেছনের সিট থেকে দিদি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী করে জানলি রে।'

সুজয় কোনো উত্তর দিল না। দিদি তার ঘাড় ছুঁয়েছে। কিন্তু চমকে উঠল না তো। সুজয়ের তো এখন জ্বরে পুড়ে যাবার কথা। তবে কী তার জ্বর হয়নি?

রাস্তাটা আবার ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে মোড় ফেরবার আগেই সুজয় আবার বলে উঠল, 'আমরা এসে গেছি।' বাবা বললেন, 'যা:, পাঁচ মাইল দূর বলল যে।' ড্রাইভার এবার রীতিমতন ভয়ে ভয়ে সুজয়ের দিকে চোরা চাহনি দিল।

গাড়িটা ডানদিকে ঘোরার একটু পরেই দেখা গেল গাছপালার আড়ালে একটা বিশাল বাড়ি। জমিদারবাড়িকে গ্রামের লোক রাজবাড়ি বলে। সত্যি রাজবাড়ির মতন দেখতে। সামনে প্রকান্ড লোহার গেট, দু-পাশে দুটি গম্বুজ। গেটের পর সুরকি বিছানো পথ, তার দু-দিকে নানারকম ফুলের গাছ আর পাথরের পরী। তারপর বাড়িটা যেন দুর্গের মতন।

গেট দিয়ে গাড়িটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুজয় বলল, 'বাবা, এই বাড়িতে আমি আগে এসেছি।'

বাবা বললেন, 'সে কী? তুই কী করে আগে আসবি এখানে? আমি নিজেই কখনো আসিনি।'

সুজয় বলল, 'এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। এই বাড়িটাও।'

দিদি বলল, এরকম অনেক বাড়ি ছবিতে দেখা যায়। দেখলেই মনে হয় চেনা চেনা।

সুজয় বলল, 'না, সেরকম নয়, এই জায়গায় আগে এসেছি।'

মা বললেন, 'আমরা কেউ আসিনি। তুই কি একা এসেছিস?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গাড়িটা এসে থামল বাড়ির সামনে। থাক থাক সিঁড়ি উঠে গেছে। তারপর পেতলের বল্টু লাগানো একটা মস্ত বড়ো কাঠের দরজা। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না।

ড্রাইভারটি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। সুজয় বলল 'কী হল, কাউকে দরজা খুলতে বলুন।' সে চমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' তারপর সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ধাক্কা দিল দরজায়। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলে একজন লাঠিয়াল বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন, 'আশ্চর্য তো! লাঠিয়াল বাইরে পাহারা দেবার বদলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে!'

লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজোবাবু কোথায়?'

লোকটি বাবার দিকে চেয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

সুজয় বলল, 'এই লোকটি বোবা!'

ড্রাইভার প্রায় আঁতকে উঠল সুজয়ের কথা শুনে। ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

এবারে মা আর বাবা খুব অবাক হয়েছেন। দিদি বলল, 'সত্যি?'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, রঘু কথা বলতে পারে না। এই রঘু, মালপত্তর তোল।'

লোকটি লাঠি নামিয়ে রেখে দু-হাতে দুটো সুটকেস তুলে ভেতরে চলে গেল।

ড্রাইভার বলল, 'আসুন, ওপরে চলুন।'

মা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। বাড়িতে অতিথি এলে বাড়ির লোক কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে না?

রঞ্জিতবাবু অবশ্য বলেছিলেন যে তার মেজোমামা বিয়ে করেননি, বাড়িতে অন্য লোক আর বিশেষ কেউ নেই।

দোতলায় অনেকগুলি ঘর তালাবন্ধ। সুজয় ড্রাইভারের আগে আগে এগিয়ে গেল। তারপর বারান্দা ঘুরেই ডানদিকের প্রথম ঘরটার দরজা ঠেলে খুলে দেখল। যেন সে জানত যে এই ঘরটাই তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সুজয় এরপর বলল, 'মা, তোমাদের এই ঘর, আমি আর দিদি থাকব তিনতলায়। চল দিদি, আমাদের ঘরটা দেখে আসি।'

বাবা বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো খোকা? তুই এসব কী বলছিস?'

সুজয় মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বাবা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এই খোকা! কী হয়েছে তোর?'

সুজয় বলল, 'কী জানি! বুঝতে পারছি না। আমার সব কিছুই মনে হচ্ছে আগে থেকে জানা। এ বাড়িতে আগে আমি থেকেছি।'

https://boierhut.com/fb

মা বললেন, 'ছেলেটা খেপে গেল নাকি? এ বাড়িতে ও আগে আসবে কী করে?'

ড্রাইভারটি অস্ফুটভাবে বলল, 'ছোটোবাবু! ছোটোবাবু!' তারপরেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'এই যে, আপনি চলে যাচ্ছেন—আপনার বাবুর সঙ্গে দেখা হল না।'

'বাবুর তো শরীর খারাপ, উনি ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না।

'ঠিক আছে, ওঁর ঘরেই আমরা যাব।'

'উনি বলেছেন সন্ধেবেলা দেখা করবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। ডাকলেই রঘু আসবেন।'

'ওই লোকটি তো বোবা! যারা বোবা হয়, তারা কালাও হয়। ডাকলে ও শুনবে কী করে?'

'না না, ও শুনতে পায়। কথা বলতে পারে না। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মা এবারে প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, 'এ বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ভালো লাগছে না বাপু। রঞ্জিতবাবু এ কোন জায়গায় পাঠালেন আমাদের?'

'রঞ্জিত তো বলেছিল আমাদের খুব ভালো লাগবে। ওর মেজোমামা আমাদের খুব খাতির করবেন। তিনি খুব আমুদে লোক।'

'কোথায়! তিনি তো একবার দেখাও করলেন না।'

'শুনছি তো অসুস্থ। রঞ্জিতের চিঠির উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের আসতে বলেছেন।'

'তাতে তো জানাননি যে তিনি অসুস্থ! ওকী! ওকী! ছেলেটার কী হল?'

সুজয় তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। তার চোখ বুজে গেছে।

বাবা ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, 'খোকা, খোকা, অমন করছিস কেন?'

সুজয় বলল, 'আমি ওপরে যাব।' তারপরেই সে এক দৌড় লাগাল।

'ও কী? ও কী?' বলে বাবা, মা, দিদিও ছুটলেন তার পেছন পেছন।

সুজয় দৌড়াতে দৌড়াতে উঠে এল তিনতলায়। সেখানে ড্রাইভার আর রঘু দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘরের দরজার সামনে। দুজনেরই মুখ শুকনো। সুজয়কে দেখে তারা বেশ ভয় পেয়েছে।

সুজয় হুকুমের সুরে বলল, 'সরে যাও। দরজা খোলো।' ড্রাইভার হাতজোড় করে বললে, 'ছোটোবাবু! ছোটোবাবু! আমার কোনো দোষ নেই।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুজয়কে দেখে লোকটিও বেশ ভয় পেয়ে গেল...

সুজয় এক ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। একজন মাঝবয়সি লোক একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাল। লোকটির মাথায় টাক। মুখে কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি।

সুজয়কে দেখে লোকটিও বেশ ভয় পেয়ে গেল। এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এ কে? এ কে?' সুজয়ের বাবা-মাও ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুজয় তাঁদের দিকে ফিরে বলল, 'এই লোকটা মেজোবাবু নয়। এ একটা বদমাশ! আগে নায়েবের কাজ করত।'

সিল্কের জোব্বাপরা লোকটাও ড্রাইভারের মতন বলে উঠল, 'ছোটোবাবু! ছোটোবাবু!'

সুজয় প্রায় লাফিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি ধরে এক টান দিতেই সেই দাড়ি খুলে এল হাতে। নকল দাড়ি!

লোকটা বিকট সুরে চিৎকার করতে লাগল, 'ওরে বাবা রে। মেরে ফেললে রে! ভূত! ভূত! ছোটোবাবু, ছেড়ে দাও আমাকে—আমি সব স্বীকার করছি!'

ড্রাইভার বলল, 'ছোটোবাবু ঠিকই বলেছেন। এ মেজোবাবু নয়। এ ছিল আগে এ বাড়ির নায়েব।'

রঘু আর ড্রাইভার এসে দুমদাম করে লোকটিকে ঘুসি মারতে লাগল। সে মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল।

এরপর আস্তে আস্তে সব জানা গেল। দিন দশেক আগে এ বাড়িতে মেজোবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। অন্য ভাইরা সবাই কলকাতায় থাকেন। তাঁরা সে-খবর জানতে পারেননি। ওই নায়েবই

https://boierhut.com/fb

ইচ্ছে করে জানায়নি। তার বদলে সে নিজেই মেজোবাবু সেজে এ বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র সরাবার মতলবে ছিল। বাড়ির মধ্যে বাইরের লোক বিশেষ কেউ ঢোকে না। ড্রাইভার আর রঘুকে সে ভয় দেখিয়ে নিজের দলে রেখেছিল।

নায়েব লোকটি বদমাশ হলেও মোটেই সাহসী ছিল না। সুজয়কে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল—পরে সব কথা নিজেই স্বীকার করল।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকাকে দেখে তোমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলে কেন? ছোটোবাবু বলছিলে কেন?

নায়েব আর ড্রাইভার জানাল যে এ বাড়ির যিনি বড়োবাবু ছিলেন তাঁর এক ছেলে ছিল ঠিক সুজয়েরই বয়সি, দেখতেও অবিকল একরকম। বছর খানেক আগে সে কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসে সাপের কামড়ে মারা যায়। সেই ঘটনার পর থেকেই বাবুরা আর এ বাড়িতে আসেন না। মেজোবাবু একলাই এখানে থাকতেন। সুজয়কে দেখে আর তার কথাবার্তার ধরনে ওরা সবাই ভেবেছিল সেই ছোটোবাবুই আবার ফিরে এসেছেন!

বাবা বললেন, 'কেউ মরে গেলে আবার ফিরে আসে কী করে? তোমাদের এইটুকুও বুদ্ধি নেই?'

ড্রাইভার বলল, 'ছোটোবাবুকে তো পোড়ানো হয়নি। এ দেশের নিয়ম হচ্ছে, কাউকে সাপে কামড়ালে তার দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তাই করা হয়েছিল। লখিন্দর যেমন বেঁচে ফিরে এসেছিলেন, সেই রকম ছোটোবাবুও নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন!'

বাবা সুজয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যা:, এ তো আমাদের ছেলে। এ তোমাদের ছোটোবাবু হবে কী করে?'

কিন্তু সুজয় কী করে এখানকার রাস্তাঘাট, এই বাড়ির সব আগে থেকে চিনল? কী করেই বা জানল যে রঘু বোবা আর নায়েবই মেজোবাবু সেজে আছে! কিছুই বোঝা গেল না। সুজয় নিজেও সেকথা বলতে পারল না।

সুজয়ের শরীরে কাঁপুনি নেই। জ্বরভাবও ছেড়ে গেছে। আগের কথা আর তার কিছুই মনে নেই!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেবারে বটুকদাদা একটা কুকুরছানা নিয়ে এলেন আমাদের গ্রামের বাড়িতে।

বটুকদাদা কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে কখন কোথায় ঘুরে বেড়ান তার ঠিক নেই। কখনো যান হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়, কখনো যান কন্যাকুমারীতে। মাঝে-মাঝে ফিরে আসেন বাড়িতে, প্রত্যেকবারই কিছু-না-কিছু জিনিস নিয়ে আসেন আমাদের জন্য।

কুকুরছানাটি একেবারেই বাচ্চা, ভেলভেটের মতন গায়ের চামড়া, নস্যির মতন রং। চোখ দুটো জুলজুল করছে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

বটুকদাদা বললেন, 'বাচ্চাটাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল, বুঝলি! তাই নিয়ে এলাম।'

বাচ্চাটাকে আমাদেরও যে খুবই পছন্দ হয়েছে তা আর বলতে হবে না। শম্ভু, রতন আর তিন্নি ওটা কোলে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। আমি এখনও একবারও ওর গায়ে হাত বুলোবার সুযোগই পাইনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটাকে কোথায় পেলে, বটুকদাদা?'

বটুকদাদা হাসি-হাসি মুখে বলল, 'এটাকে যে-সে কুকুর ভাবিস না। আর একটু বড়ো হোক, তারপর দেখবি এর কত গুণ!

বটুকদাদাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেই সোজাসুজি উত্তর পাওয়া যায় না। যদি জিজ্ঞেস করি, 'বটুকদাদা, হিমালয় পাহাড়ের কত উঁচুতে বরফ থাকে? হিমালয়ের ভাল্লুকদের গায়ের রং কালো না সাদা?'

বটুকদাদা বলবেন, 'একবার আসামের জঙ্গলে কী হয়েছিল জানিস? একটা গন্ডারের পাল্লায় পড়েছিলাম, সেটার গায়ের রং সবুজ!'

তারপর সেই গন্ডারের গল্প যে ঘুরতে-ঘুরতে কখন হিমালয়ের ভাল্লুকে পৌঁছাবে, তার ঠিক নেই। না পৌঁছাতেও পারে!

শম্ভু জিজ্ঞেস করল, 'ও বটুকদাদা, এই কুকুরটার কী জাত? অ্যালসেশিয়ান, না বুল ডগ?'

বটুকদাদা মুচকি হেসে বললেন, 'রাজস্থানের মরুভূমিতে এবার একজন হাঙ্গারিয়ান জিপসির সঙ্গে দেখা হল। তাদের জামা-কাপড় কী সুন্দর রংচঙে, তোদের কী বলব! আহা, তোদের জন্য একটা করে নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল!'

রতন বলল, 'উঃ, বটুকদাদাকে নিয়ে আর পারা যায় না। কী গুল মারতেই পারো বাবা তুমি। হাঙ্গারি কত দূরের দেশ। সেখানকার জিপসিরা রাজস্থানে আসবে কী করে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘এটাকে কোথায় পেলে বটুকদাদা ?’

আমাদের মধ্যে তিন্নি বেশি পড়াশুনো করে। তিন্নি তো আর ফুটবল খেলে না, নৌকো চালাতেও জানে না, তাই বই পড়বার বেশি সময় পায়। বটুকদাদাকে সে খুব ভালোবাসে।

তিন্নি মাথা ঝাঁকিয়ে বেণী দুলিয়ে বলল, ‘আহা, সেটা অসম্ভব কেন? জিপসিরা তো আমাদের দেশ থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। হাঙ্গারির জিপসিরাও এককালে ভারতীয় ছিল। তাই তারা মাঝে-মাঝে তাদের আগেকার দেশ দেখতে আসতেই পারে!’

বটুকদাদা তিন্নির মাথায় হাত রেখে আদর করে বললেন, ‘তুই ঠিক বলেছিস রে! এরা দেশ দেখতেই এসেছে। ওদের কাছ থেকেই আমি কুকুরটা চুরি করেছি, আবার এটা ওরা আমাকে দান করেছে, তাও বলা যায়।’

রতন বলল, ‘একই সঙ্গে চুরির জিনিস আবার দান করা জিনিস কী করে হয়?’

আমি বললাম, ‘এটা খুব সোজা! বটুকদাদা প্রথমে কুকুরছানাটা চুরি করে পালাচ্ছিলেন। তারপর ধরা পড়ে গেলেন। তখন বটুকদাদাকে দেখে জিপসিদের মায়া হল, তারা বলল, ‘আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তোমাকে এমনি দিয়ে দিলাম!’

বটুকদাদা বললেন, ‘নিলু, তুই অনেকটা ধরেছিস। জিপসিদের যে নেতা, সে আমাকে বলল, ‘বটুক, কুকুরটা নিচ্ছ নাও।’

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শম্ভু জিজ্ঞেস করল, 'ওদের লিডার তোমার নাম জানল কী করে?'

বটুকদাদা বললেন, 'আমাকে সারা পৃথিবীর লোক চেনে। এই তো জাপানের সম্রাট চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, আগামী মাসে যেতে হবে! তারপর শোন, জিপসিদের লিডার বলল, 'বটুক, কুকুরটা নিতে চাও নিয়ে যাও, কিন্তু সামলাতে পারবে তো? এই জাতের কুকুর পৃথিবীতে মাত্র একজোড়া আছে, আর তাদের তিনটে বাচ্চা। এদের মতিগতি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না!'

কুকুরের ছানাটা তিন্নির কোলে। সে আদর করে বলল, 'এটা আমার খুব পোষ মানবে। আমি এর নাম রাখলুম জিপসি!'

দুদিন বাদেই আবার চলে গেলেন বটুকদাদা। আসামের জঙ্গলে, না রাজস্থানের মরুভূমিতে, না জাপানের রাজবাড়িতে চা খেতে, তা অবশ্য বলে গেলেন না।

বড়োমামা কুকুরছানাটাকে দেখে বললেন, 'এটা আবার কী কুকুর রে? লেজটা মোটা, মুখের দিকটা ছুঁচলো ধরনের। এটা শেয়ালের বাচ্চা নয় তো?'

তিন্নি বলল, 'না, মোটেই না। এটা খুব স্পেশ্যাল জাতের। পৃথিবীতে মাত্র একজোড়া আছে, আর তিনটে বাচ্চা।'

বড়োমামা বললেন, 'বটুকদাদা বুঝি তোদের এই বুঝিয়েছে?'

এই বলে বড়োমামা হো হো করে হাসতে লাগলেন।

কিন্তু রঘু বলল অন্য কথা। রঘু এ গ্রামের পোস্টম্যান, আমাদের বাড়িতে মাঝে-মাঝে চিঠি দিতে আসে। তার রঘু নামটা আমরাই রেখেছি। নাকের নীচে মস্ত বড়ো পাকানো গোঁফ, ঠিক রঘু ডাকাতের মতন দেখতে।

রঘু বলল, 'এই কুকুরের বাচ্চাটা দারুণ তো! শুধু অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়। আমি একটা ছবির বইতে দেখেছি। পৃথিবীতে এটাই একমাত্র সেই জাতের কুকুর, যারা পোস্টম্যান দেখলে তেড়ে যায় না!'

সে-কথা অবশ্য ঠিক। আমরা আগে যত কুকুর দেখেছি, এমনকী রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলো পর্যন্ত, কেউ রঘুকে পছন্দ করে না। কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো রঘুকে আসতে দেখলেই অন্য কুকুররা হিংস্রভাবে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। কিন্তু আমাদের জিপসি রঘুকে দেখলে আনন্দে লেজ নাড়ে। তাহলেও কোথায় হাঙ্গেরি, আর কোথায় অস্ট্রেলিয়া!

দু-দিন পরেই কলকাতা থেকে এলেন পান্তুয়া-জামাইবাবু! ঠিক পান্তুয়ার মতন গায়ের রং আর মুখখানাও গোল ধরনের বলে আমরা আড়ালে তাঁর ওই নাম রেখেছি। পান্তুয়া-জামাইবাবু খুব বড়ো কাজ করেন আর সত্যি-সত্যি অনেক দেশ ঘুরেছেন।

জিপসি পান্তুয়া-জামাইবাবুকে দেখে তাঁর পায়ে মাথা ঘষে একটু আদর জানাতে গেল। তিনি একলাফ মেরে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, এটা কী রে? ভোঁদড় নাকি!'

https://boierhut.com/fb

দিদির কাছে শুনেছি, জামাইবাবু অতি সাহসী মানুষ। পৃথিবীতে তিনি বাঘ-সিংহ-কুকুর-মাকড়সা-ইঁদুর--কিছুকে ভয় পান না। একমাত্র ভয় ভোঁদড় নামে প্রাণীটিকে। কিন্তু আমরা কখনো ভোঁদড় দেখিনি, কেমন দেখতে হয় তাও জানি না। শুধু ছড়াতে পড়েছি, 'ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা!'

আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বলতে লাগলাম, 'না, না, ভোঁদড় না, ভোঁদড় না, ও তো আমাদের জিপসি!'

জামাইবাবু বললেন, 'হুঁ, এ তো দেখছি উগাণ্ডার ওয়াইল্ড ডগ। খুব তেজি। এরা দল বেঁধে থাকলে মানুষ পর্যন্ত মেরে ফেলে, তবে একলা থাকলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব সাবধান, পূর্ণিমার দিন, যখন আকাশে পুরো একটা গোল চাঁদ ওঠে, সেদিন উগাণ্ডার ওয়াইল্ড ডগ অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথায় যে যায়, কেউ জানে না!'

বড়োমামা বললেন, 'উগাণ্ডার কুকুর না ছাই! দেখবে মজা। এক্ষুনি এ গলা মেলাবে।'

এরপর বড়োমামা মুখের কাছে দু-হাত নিয়ে খুব জোরে হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া করে শেয়ালের ডাক ডেকে উঠলেন। জিপসি কিন্তু সেই ডাকে যোগ দিল না। বরং বেশ মজা পাওয়ার চোখে বড়োমামার দিকে চেয়ে রইল।

বড়োমামার তবু ঘোর বিশ্বাস, এই জিপসি আসলে শেয়ালের বাচ্চা। আমাদের তাতে প্রবল আপত্তি। শেয়ালের বাচ্চা একটু বড়ো হলেই জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তাদের পোষ মানানো যায় না। সে চেষ্টা কী আর আমরা করিনি!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু পান্তুয়া-জামাইবাবুর কথাই সত্যি হল।

কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ বড়ো হয়ে গেল জিপসি। সারা বাড়িতে খেলে বেড়ায়। ভুকভুক করে মিষ্টি-মিষ্টিভাবে ডাকে। কাউকে কামড়ায় না। বাইরে থেকে যারাই আসে, সবাই জিপসিকে আদর করে।

সেদিন ছিল লক্ষ্মীপুজো। আমাদের বাড়িতে অনেক লোকের নেমন্তন্ন। তাই জিপসি কোথায় আছে, তার খোঁজ নিইনি। হঠাৎ তিন্নি কাঁদো-কাঁদো মুখ করে এসে বলল, 'এই নীলু, জিপসি কোথায় রে, দেখেছিস?'

রোজ রাত্তিরে তিন্নির খাটের তলায় জিপসি শুয়ে থাকে। আজ তিন্নি ঘুমোতে গিয়ে দেখে জিপসি তার জায়গায় নেই। আমরা সারা বাড়ি, আশপাশের বাগান, পুকুরধার সব খুঁজে দেখলাম, জিপসির নাম ধরে ডাকলাম কত, তবু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। আকাশে তখন মস্ত বড়ো একটা গোল চাঁদ উঠেছে।

সে রাত্তিরে আমাদের এমনই মন খারাপ হয়ে গেল যে, ঘুমই এল না প্রায়। পরদিন সকালেও জিপসিকে দেখা গেল না কোথাও!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে ফিরে এল ঠিক তিনদিন বাদে সন্ধেবেলায়! তার ভুক ভুক ডাক শুনে আমরা সবাই ছুটে এলাম উঠোনে। জিপসি তার মোটা লেজে ভর দিয়ে ঠিক উঠোনের মাঝখানে বসে কান লটপট করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, তার মুখ টাটকা রক্তে মাখামাখি।

আমাদের প্রথমে মনে হল, কোনো জায়গা থেকে বুঝি জিপসি মারামারি করে এসেছে। তার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিন্নি ভিজে ন্যাকড়া এনে তার মুখ মুছে দিল। তখন দেখা গেল, তার মুখে কিংবা শরীরে কোনো কাটাছেঁড়া নেই, ওই রক্তটা সে বাইরে থেকে মেখে এসেছে।

তিন্নি ধমক দিয়ে বলল, 'জিপসি, কোথায় গিয়েছিলি? কীসের রক্ত মেখেছিস? বল, ঠিক করে বল!'

জিপসি এমনভাবে তাকাল, যেন মনে হল, সে প্রশ্নগুলো ঠিকই বুঝেছে। উত্তরও দিতে চায়। কিন্তু বেচারি কুকুর তো, মানুষের ভাষা বলতে পারে না।

এরপর কয়েকদিন জিপসি আগের মতনই হয়ে রইল। এমনিতে সে খুব বাধ্য। কখনো বাড়ি ছেড়ে বেশি দূর যায় না। তাকে যা দেওয়া হয়, তাই সে খায়। ভাত, ডাল, পরোটা, পালংশাক, লাউঘণ্ট, দই-চিঁড়ে, সব, সব। মাছের কাঁটা কুকুরকে দিতে নেই, মাংস পেলেও জিপসি খায় কিন্তু আমাদের বাড়িতে মাংস আর কদিন হয়? বড়োজোর মাসে একদিন!

ঠিক এক মাস বাদে জিপসি আবার নিরুদ্দেশ। এই ছিল, এই নেই। নেই তো নেই। একেবারেই নেই।

এবারও সে ফিরে এল দু-দিন বাদে। এবারও তার মুখে টাটকা রক্ত।

আমরা বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। জিপসির এ কীরকম ব্যবহার। তার মুখে ওই রক্তই বা কীসের?

বড়োমামা বললেন, 'এটা রাক্ষুসে কুকুর। এটাকে দূর করে দে!'

তাই শুনে তিন্নি কেঁদে ভাসাল। আমরাও জিপসিকে ছাড়তে চাই না। তা ছাড়া সে কোনো মানুষ কিংবা তার বাড়ির পোষা গোরু-ছাগলকে কামড়েছে, এমনও কেউ অভিযোগ করে না। তাহলে তার মুখে ওই রক্ত আসে কী করে?

তিন-চার মাস এরকম হবার পর বটুকদাদা আবার এসে উপস্থিত হলেন। এবারে তিনি কোনো জন্তু-জানোয়ার আনেননি, এনেছেন তাঁর ঝোলা-ভর্তি মেওয়া। জাপানের সম্রাটের বাড়িতে চা খেতে গিয়েছিলেন কি না জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এ মেওয়াগুলো কোথাকার জানিস? আসল কাবুলিওয়ালাদের দেশ থেকে আনা। এই মেওয়া খেলে মাথার ঘিলু বাড়ে, কেউ পরীক্ষায় ফেল করে না। তোরা সবাই খা, খা, পেট ভরে খা।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমরা জিপসির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে নালিশ জানাতেই বটুকদাদা গম্ভীর হয়ে গেলেন একটুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেই জিপসিদের নেতা আমাকে যা বলেছিল, তাই-ই দেখছি সত্যি হল।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলেছিল? কী বলেছিল?'

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বটুকদাদা বললেন, 'পান্তুয়া তোদের বলেছে যে, এটা উগাণ্ডার ওয়াইল্ড ডগ! পান্তু অনেক দেশ ঘুরেছে তো। গুলিয়ে ফেলেছে সবকিছু। ওয়াইল্ড ডগদের লেজ এত মোটা হয় না। এই ক-মাসে এত বড়ো হবে না। ঠিক পূর্ণিমার রাতে হাঙ্গারিয়ান কুকুর হঠাৎ খুব হাংরি হয়ে পড়ে। তারা অনেক কিছু দেখতে পায়। আমরা যাদের দেখতে পাই না, তাদেরও দেখতে পায়। তাদের মেরে রক্ত খায়।'

রতন বলল, 'আমরা যাদের দেখতে পাই না, তার মানে অশরীরী, তার মানে কী ভূত?'

শম্ভু বলল, 'ধুৎ! ভূত যদিও বা থাকে, তবু তাদের গায়ে কী রক্ত থাকে নাকি! অদৃশ্য হলে তো চোখ, নাক, কান, রক্ত, মাংস এসব কিছু থাকবে না!'

আমরা হট্টগোল থামালে বটুকদাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ:! আমরা কতটুকুই বা জানি! এই অশরীরী মানে ভূত নয়, অন্য কিছু। তাহলে জিপসিকে তোরা রাখতে চাস না? আমাকে দিয়ে দে, আমি ওর আসল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।'

আমরা সবাই মিলে বললাম, 'না, না, জিপসি থাকবে। জিপসি থাকবে!'

বটুকদাদা বললেন, 'তাহলে এই পূর্ণিমার রাতটায় কী হয়, আমি নিজের চক্ষে একটু দেখি।'

ক্যালেণ্ডারে দেখা গেল পূর্ণিমা আর মাত্র দু-দিন বাদে।

সেদিন সকাল থেকেই জিপসিকে চোখে-চোখে রাখা হল। একজন-না-একজন সব সময় ওর কাছে থাকে। জিপসিও অন্যদিনের মতন খেলা করে, আদর করলে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করা গেল, কিছুই খাচ্ছে না। ভালো যা কিছু খেতে দেওয়া হচ্ছে, সে একবার শুঁকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। দুধ-মুড়ি ও খুব চেটেপুটে খায় অন্যদিন। আজ সে তাতে একবার জিভ ছোঁয়াল না পর্যন্ত। তাকে জোর করে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করেও কাজ হল না। আজ তার উপোস।

সন্ধেবেলা বসবার ঘরে আমরা সবাই গোল হয়ে বসেছি। মাঝখানে বটুকদাদা, আর তিন্নির কোলে জিপসি। আমরা সবাই গল্প শুনছি, জিপসি এমন চুপ করে বসে আছে যেন সেও মন দিয়ে গল্প শুনছে। আকাশ মেঘলা, একসময় টিপিটিপি বৃষ্টিও পড়ছিল!

বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেছে, হঠাৎ একসময় জিপসি ভুকভুক করে ডেকে তিন্নির কোল থেকে নামতে চাইল।

রতন জানলার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'বৃষ্টি থেমে গেছে, চাঁদ উঠেছে!'

সত্যি চাঁদের আলোর একটা শিখা জানলা দিয়ে এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তিন্নি জোর করেও জিপসিকে ধরে রাখতে পারছে না। সে অসম্ভব ছটফট করছে। শম্ভু আর রতন দুজনে জিপসিকে চেপে ধরল।

এবার জিপসি গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠল, এক ঝটকায় ওদের ছাড়িয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। দরজার দিকে চলে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল একবার।

বটুকদাদা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে জিপসি, কোথায় যাচ্ছিস?'

জিপসি মুখটা তুলতেই আমরা আঁতকে উঠলাম। এরকম দৃশ্য কখনো দেখিনি। ঠিক টর্চের আলোর মতন দুটো আলোর শিখা বেরোচ্ছে জিপসির চোখ দিয়ে।

বটুকদাদা আপন মনে বললেন, 'তাহলে ওরা ঠিকই বলেছিল। হাঙ্গারিয়ান জিপসি কুকুরের চোখ দিয়ে পূর্ণিমার দিন আলো বেরোয়। ভয় নেই, তোরা কেউ ভয় পাস না, জিপসিকে যেতে দে!'

দরজা খোলা, জিপসি এক লাফে চলে গেল বাইরে। আমি আর রতন দরজার কাছাকাছি বলে আমরাও ওর পেছন-পেছন যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বটুকদাদা বললেন, 'খবরদার, খবরদার! ওর পেছনে যাসনি! গেলে যা দেখবি, তা সহ্য করতে পারবি না!'

জিপসি বিদ্যুতের বেগে ছুটে গেল, না অদৃশ্য হয়ে গেল, তা বোঝা গেল না। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই জিপসি যেন মিলিয়ে গেল কোথায়!

আমরা সবাই এবার বটুকদাদাকে চেপে ধরে বললাম, 'ও বটুকদাদা, কী ব্যাপারটা হল বলো! জিপসি কোথায় গেল? কোথা থেকে ও রক্ত খেয়ে আসে?'

বটুকদাদা বললেন, 'দেখো বাপু, তোমাদের একটা কথা বলি! তোমরা নিজের চোখেই তো দেখলে পূর্ণিমার রাতে জিপসি কীরকম বদলে যায়? যদি এ কুকুরকে বাড়িতে রাখতে চাও, তাহলে আর কিছু জানতে চেয়ো না।'

তিন্নি কাঁদতে-কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, 'আমার জিপসি কার রক্ত খায়, তা তোমাকে বলতেই হবে। ও যদি খুনে কুকুর হয়, তাহলে আমি ওকে আর ভালোবাসব না!'

বটুকদাদা বললেন, 'সেবার যখন মানস সরোবরে যাই, তখন কী কান্ড হয়েছিল শোন। একদিন জলের মধ্যে এমন তোলপাড় শুরু হল, ঠিক যেন মনে হল হ্রদের তলায় কোনো দৈত্য-দানব লুকিয়ে আছে।'

সম্পূর্ণ অন্য গল্প। এ-গল্প শেষ হতে হতে আমাদের ঘুম পেয়ে গেল প্রায়।

জিপসি যথারীতি ফিরে এল। একদিন বাদে। তার মুখে সেইরকমই টাটকা, টকটকে লাল রক্ত মাখানো। আবার সে নিরীহ, শান্ত কুকুর হয়ে গেল।

এরপর থেকে পূর্ণিমার রাতটায় আমরা জিপসির কথা ভুলে থাকি!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কেন মাঝরাত্তিরে আমার ঘুম ভেঙে গেল?

কিছু একটা জোর শব্দ হল? কিন্তু আর তো কেউ জাগেনি?

আমার বয়স এগারো বছর। আমি কিন্তু ভূতের ভয় পাই না একটুও। আমি শুয়ে আছি ছাদে, একটা মাদুর পেতে। কাছাকাছি আরও তিনখানা মাদুরে ঘুমোচ্ছে চাঁদুদা, ভন্তুমামা আর অচিনমামা। ওরা সকলে বড়োদের দলে।

অন্যদিন আমার নিজের দাদাও আমার সঙ্গে এক মাদুরেই শোয়। আজ দাদার জ্বর হয়েছে। জ্বর হলে ছাদে শুতে নেই, তাই আমি আজ একা।

মেয়েরা কেউ ছাদে শোয় না। মেয়েদের নাকি গরম কম লাগে।

পুরো গরমকালটা আমরা ছাদেই শুই। কলকাতায় যত গরম পড়ে, আমাদের বাগবাজারে নাকি তার চেয়েও বেশি পড়ে।

তখন অনেক বড়োলোকদের বাড়িতেও এসি ঘর থাকত না। পাখা, মানে ফ্যানও থাকত না সব বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে মাত্র একটি ঘরে একটা পাখা ছিল, বাবা-মা শুতেন সেখানে। মায়ের একটু-একটু হাঁপানির অসুখ, তাই তিনি একেবারে গরম সহ্য করতে পারেন না।

ছাদে শোয়া বেশ আনন্দের। ঘরে শোয়ার চেয়ে অনেক ভালো। ছাদে বেশ ফুরফুরে হাওয়া দেয়। শুতে-না-শুতেই চোখ জুড়িয়ে আসে।

ভন্তুমামা অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। এক-এক রাত্তিরে শুয়ে নতুন-নতুন গল্প শুরু করেন। কিন্তু আমার আর সেসব গল্প শোনা হয় না। শুয়েই চোখ বুজে ঘুমের দেশে চলে যাই। প্রত্যেকদিন বাবার কাছে আমাকে রাত ন-টা পর্যন্ত সব বই নিয়ে বসে পড়তে হয়। তারপর ঘুম পাবে না?

যাই হোক, বড়ো হয়ে আমি তো এইসব দেশে যাবই। তখন এইসব গল্প আমারও জানা হয়ে যাবে।

ছাদে শোয়ার একটাই অসুবিধে। যদি হঠাৎ মাঝরাত্তিরে বৃষ্টি নেমে আসে, তাহলেই খুব তাড়াতাড়ি মাদুর গুটিয়ে, বালিশ নিয়ে আমাদের দৌড়োতে হয়। বালিশ ভিজে গেলেই সবচেয়ে মুশকিল। একবার বালিশ ভিজলে তিন-চারদিনেও শুকোতে চায় না।

মাঝে-মাঝে এমন হয়, হঠাৎ ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল, আমরা দুদ্দাড় করে নীচে নেমে এলাম। ওমা, সঙ্গে-সঙ্গেই থেমে গেল বৃষ্টি, যেন আকাশের মেঘেরা আমাদের নিয়ে মজা করে।

https://boierhut.com/fb

বৃষ্টি থেমে গেলেও সে রাতে আর ছাদে ফিরে যাওয়া যায় না। ছাদ ভিজে গেলে আর মাদুর পাতা হবে কী করে? সেইসব রাতে ঘরে ফিরে এলে বেশি-বেশি গরম লাগে।

বড়োদের মধ্যে চাঁদুদা খুব ভীতু। এখন সে অফিসে চাকরি করে, তবু ভূতের ভয় পায়। রাত্তিরে যদি বাথরুমে যেতে হয়, তখনও চাঁদুদা একলা যেতে সাহস পায় না। অচিনমামাকে ডেকে তোলে। অচিনমামা খুব ভালো মানুষ। খুব শান্ত। মাঝরাত্তিরে শুধু-শুধু ঘুম ভাঙলে কারুর ভালো লাগে? অচিনমামা রাগ করে, কিন্তু বেশি না, একটু-একটু। চাঁদুদার সঙ্গে যায়।

একদিন মাঝরাত্তিরে চাঁদুদা জেগে উঠে বলতে লাগল, 'ও কী? ও কী? কে? কে?'

এমনই জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে ঘুম ভেঙে গেল আর সকলের।

ভন্তুমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?'

চাঁদুদা বলল, 'তোমরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? একটা মেয়ে কাঁদছে?'

আমরা সকলে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। কই, কেউ তো কাঁদছে না। এমনকী হাওয়ার শব্দও নেই।

চাঁদুদা বলল, 'আমি যে স্পষ্ট শুনলাম, আর দেখলাম একটা মাথায় ঘোমটা দেওয়া মেয়ে ছাদের এই দিক দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে যাচ্ছে।'

ভন্তুমামা বলল, 'তুই ভুল দেখেছিস! ভুল শুনেছিস!'

চাঁদুদা তবু জোর দিয়ে বলল, 'না, আমি স্পষ্ট দেখেছি।'

ভন্তুমামা বলল, 'ছাদের দরজা বন্ধ। একটা মেয়ে আসবে কোথা থেকে? আকাশ থেকে?'

অচিনমামা বলল, 'তুই স্পষ্ট দেখবি কী করে? তখন তো তোর চোখ বোজা ছিল। তার মানে তুই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এসব দেখেছিস।'

ভন্তুমামা বলল, 'চাঁদু, তুই যত ইচ্ছে স্বপ্ন দ্যাখ, কিন্তু বিচ্ছিরিভাবে চেঁচিয়ে আবার আমাদের জাগিয়ে দিলে কিন্তু এরপর গাঁট্টা খাবি!'

গাঁট্টা মারার ভয় দেখিয়েও কিন্তু চাঁদুদাকে দমানো যায়নি। আরও দু-বার এরকম স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে। চাঁদুদা সব সময় ভয়ের স্বপ্ন দ্যাখে। আমি কিন্তু ভালো-ভালো স্বপ্ন দেখি। শুধু পরীক্ষার দু-চার দিন আগে একটা বাজে স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে যাই। স্বপ্নটা হচ্ছে, আমি যেন পরীক্ষার হলে বসে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে শেষ করতে পারছি না, তার আগেই ঘণ্টা পড়ে যাচ্ছে।

আসলে কিন্তু পরীক্ষার সময় ওরকম কিছুই হয় না। সব কোয়েশ্চেনই তো ঠিকঠাক লিখে ফেলি। আমি কোনো পরীক্ষায় ফার্স্ট হইনি বটে, তবে এবছরই থার্ড হয়েছি। ফার্স্ট হয় আমার বন্ধু ধূর্জটি, সে আমার খুব বন্ধু। আমি মোটেও তাকে ডিঙিয়ে যেতে চাই না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...দেখলাম একটা মাথায় ঘোমটা দেওয়া মেয়ে ছাদের এই দিক দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে যাচ্ছে ।'

আজ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল কেন? কীসের শব্দ? না:, কিছু তো নেই।

আমার ঘুম একেবারে চলে গিয়েছে। আমি পুরো চোখ মেলে তাকিয়ে আছি।

আকাশে আজ এক ছিটে মেঘ নেই। অসংখ্য তারায় ঝকঝক করছে আকাশ।

আমার ভূতের ভয় নেই, কারণ আমাকে যে বাবার কাছে পড়াশোনা করতে হয়। পড়ার বইয়ের বাইরেও অনেক কিছু শিখিয়ে দেন বাবা।

একদিন ভূতের কথা উঠেছিল। মা মাঝে-মাঝে অন্ধকারে ভয় পান। বাবা বলেছিলেন, 'শোনো, অন্ধকারে চোর-ডাকাত লুকিয়ে থাকতে পারে, সেজন্য সাবধান হতে হয়। কিন্তু ভূত থাকলেও তো ক্ষতি নেই। ভূত তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তা জানো?'

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ভূত যদি থাকেই, তাহলে ক্ষতি করবে না কেন? সব গল্পেই তো ভূতেরা খুব পাজি হয়।

মাও বলেছিলেন, 'তোমার যত সব অদ্ভুত কথা।'

বাবা হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'ভূত ব্যাপারটা তো অদ্ভুত। বাংলার ভূতের আর একটা নাম অশরীরী। তার মানে কী? যার শরীর থাকে না। মানুষ মরে গেলে কিছুতেই তার শরীর থাকতে পারে না। যার শরীর নেই, সে যদি ভূতও হয়, তোমার সামনে এলেও কিছুই করতে পারবে না। তার হাত নেই, তাই গলা টিপে দিতে পারবে না। মুখ নেই, তাই কামড়ে দিতে পারবে না। আর

https://boierhut.com/fb

যদি খানিকটা ধোঁয়া-ধোঁয়া মতো চেহারা হয়, যেমন অনেক ছবিতে দেখা যায়, তাহলে খুব জোরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। সে তো তোমাকে ছুঁতে পারবে না।'

আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাবা, ভূত কি কথা বলতে পারে?'

বাবা বলেছিলেন, 'দুর বাবা, যদি মুখ না থাকে, গলা না থাকে তাহলে কথা বলবে কী করে? কোনো শব্দই করতে পারবে না!'

বাবা আরও অনেক কিছু বলে আমাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার মাসতুতো বোন টুলটুলি বেশ ভীতু। তার মা তাকে একটা ছড়া শিখিয়ে দিয়েছে,

ভূত আমার পুত
পেত্নি আমার ঝি
রামলক্ষ্মণ বুকে আছে
করবি আমায় কী!

এখন সেই ছড়াটা শুনলে আমার হাসি পায়।

আমি শুধু মনে মনে বলি, অশরীরী, অশরীরী। যার শরীরই নেই, সে আবার কী করবে!

তাহলে মাঝরাত্তিরে আমার ঘুম ভেঙে গেল কেন?

এই সময় ছাদের দরজার দিক থেকে একটা কালো চেহারার মূর্তি দেখতে পেলাম। ভূত নয় জানি, তবু বুকটা একটু ভয়ে কেঁপে উঠল কেন?

চোর কিংবা ডাকাত?

ছাদে শোয়ার সময় আমাদের কারুর কাছেই তো টাকাপয়সা থাকে না। চোর-ডাকাত আমাদের কী করবে?

যদি আমাদের মেরে নীচে বাবা-মাকেও মারতে যায়?

ধ্যাত! এসব কিছুই না। কালো মূর্তিটা কাছে এলে বুঝলাম এ তো ভন্তুমামা। নিশ্চয়ই বাথরুম করতে গিয়েছিল।

আমি আর কোনো কথা বললাম না। ভন্তুমামা গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের মাদুরে।

একটু পরেই পিচপিচ করে তার নাক ডাকতে লাগল।

আমার কিন্তু কিছুতেই আর ঘুম এল না।

একটু বাদে কী যেন একটা কালো রঙের পাখি উড়ে গেল! কালো পাখি দেখলে ভয় পাওয়ার কী আছে! তবু কেন আমি চমকে উঠলাম?

এটা একটা বাদুড় নিশ্চয়ই। কাছেই জমিদার রায়বাড়ির সামনে অনেকটা বাগান আছে। ওখানে বাদুড় যায়।

আর একটা প্যাঁচাকেও দেখেছি মাঝে-মাঝে। সেটা আবার তারের উপর বসে ডাকে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এই দুটো পাখিকেই দেখা যায় রাত্তিরবেলা। ধূর্জটি বলেছিল, বাদুড় কিন্তু পাখি নয়। যদিও উড়তে পারে, তবু বাদুড় একটা প্রাণী। সব পাখিরা ডিম পাড়ে, বাদুড় ডিম পাড়ে না। তাদের পেট থেকে আস্ত-আস্ত বাচ্চা বেরোয়!

এইসব এলেবেলে কথা মনে আসছে, কিন্তু ঘুম আসার আর নাম নেই।

আকাশভর্তি এত তারা! বাবা বলেছেন, 'যত তারা দেখতে পাই, তাদের মধ্যে অনেকগুলো ওখানে নেই। সেই তারাগুলো অনেক বছর আগেই মরে গিয়েছে। তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি!'

কথাটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না, যে তারা নেই, তাদেরও আমরা দেখতে পাই কী করে? বাবা তো আর ভুল বলবেন না!

তারাগুলো মরে গেলে কী ভূত হয়?

আবার ভূতের কথা? এঃ, এটা আমার ভাবা উচিত নয়। তারাগুলো তো জ্যান্ত প্রাণী নয় যে মরে যাবে? যাদের জন্ম হয়, তারাই একসময় মরে। আমাদের ইস্কুলের বইতে একটা পদ্য আছে, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'

কিন্তু বাবা যে বলেছেন অনেক তারা মরে যায়। তাহলে তাদের জন্মও হয় নিশ্চয়ই।

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করি কোন কোন তারা মরে গিয়েছে। কিছুই বোঝা যায় না।

আমরা আকাশে তাকিয়ে যা দেখি, সবই তারা বলে ভাবি। কিন্তু এটা আমি জানি, তারাও আছে, গ্রহও আছে। যেগুলো পিটপিট করে, সেগুলো তারা, আর যেগুলো একেবারে স্থির সেগুলো গ্রহ। আমাদের সূর্যের যেমন অনেক গ্রহ আছে, সে রকম অন্য অনেক নক্ষত্রেরও গ্রহ আছে।

কত তারা আর গ্রহ আছে আকাশে?

আজও নাকি কোনো বৈজ্ঞানিকই তা গুনে-গুনে শেষ করতে পারেননি।

কোটি-কোটি-কোটি-কোটি তারা, কত দূর, কত দূর!

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় মনে হল, আমি যেন মহাশূন্যে ভেসে যাচ্ছি। কোথায় যাব?

ওরে বাবা, অতসব গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীটা নাকি বেশ ছোটো। তার মধ্যে আমি একটা সামান্য এগারো বছরের ছেলে, আমি কতটুকু? এক কণা বালির চেয়েও ছোটো।

তাহলে আমি ভেসে-ভেসে কোথায় যাচ্ছি। এখনই তো হারিয়ে যাব।

উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমি যেন দেখতে পেলাম, এই আকাশ ছাড়িয়ে আরও আকাশ, আরও কোটি-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র, তাদের মধ্যে আমি একটি বালির কণার চেয়েও ছোটো, উড়ে যদি হারিয়ে যাব, ঠিক হারিয়ে যাব।

ভয়ে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

https://boierhut.com/fb

না, না, আমি হারিয়ে যেতে চাই না, চাই না।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ভয়ে আমার শরীর এখনও কাঁপছে।

আমি তাড়াতাড়ি মাদুরটা গুটিয়ে আর বালিশটা বগলে নিয়ে ছুটে চলে এলাম নীচে।

আমার মায়ের ঘুম খুব পাতলা। একটু শব্দ পেয়েই জেগে উঠে মা বললেন, 'কে রে? নীলে নাকি?'

'হ্যাঁ মা।'

'কেন, নেমে এলি কেন? বৃষ্টি পড়ছে?'

সেকথা তো আমি বলতে পারি না, আমি আকাশ দেখে ভয় পেয়েছি, এ কথাও তো বলা যায় না।

আমি বললাম, 'মা, তোমার পাশে শুতে ইচ্ছে করছে।'

মা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আয়, এখানে আয়।'

আমি ধুপ করে শুয়ে পড়লাম মায়ের পাশে। মা আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমার মনে হল, এখান থেকে আর আমি হারিয়ে যাব না!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভুটানে বেড়াতে গিয়ে একদিনও খবরের কাগজ পড়িনি। পাহাড়, নদী আর আকাশ দেখেই চোখ ভরে থাকত। ছাপা অক্ষর পড়ার কাজ থেকে চোখ দুটোকে ছুটি দিয়েছিলাম।

তারপর একদিন ভুটান থেকে আমরা নেমে এলাম। সমতলে। উঠলাম গিয়ে বরডাবরি বাংলোয়। সেখানে আরও দু-দিন কাটিয়ে তারপর কলকাতায় ফেরা।

সেই বাংলোয় বসবার ঘরে দেখলাম একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। অমনি পুরোনো অভ্যেসটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। টেনে নিলাম কাগজটা।

তাতে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। সেবক রোডে গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিন বার ডাকাতি হয়ে গেছে!

বাংলোর চৌকিদার কাছেই ছিল। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি শুনেছ ডাকাতির কথা?'

সে চোখ বড়ো করে বলল, 'ওরে বাবা, সে-কথা আর বলবেন না, সাহেব! সন্ধের পর আজকাল আর কেউ রাস্তায় বেরোতে চায় না। একে এদিকে রয়েছে পাগলা হাতির উপদ্রব, তার উপর শুরু হয়েছে ডাকাতদের হামলা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে এই ডাকাতরা?'

চৌকিদার বলল, 'এরা কোথা দিয়ে যে কখন আসবে তা বোঝার উপায় নেই। এরা লুকিয়ে থাকে জঙ্গলের মধ্যে। রাত্তির বেলা হঠাৎ বড়ো রাস্তার ওপর একটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলে গাড়ি আটকে দেয়। তারপর সব লুটপাট করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বাধা দিতে এলে গুলি করে মেরে ফেলে। এ পর্যন্ত দুটো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরেছে। পুলিশ এদের কিছুতেই ধরতে পারছে না।'

খবরের কাগজেও দেখলাম, প্রায় ওই এক কথাই লিখেছে। তবে দুটো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরে ফেলার কথাটা ঠিক নয়, তারা আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। আর একটা গাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

ডাকাতরা সংখ্যায় মাত্র তিন-চার জন। ছোটো ছেলেদের যেমন খেলবার মুখোশ পাওয়া যায়, তারা সেইরকম মুখোশ পরে থাকে। পুলিশ এখনও কোনো খোঁজ পায়নি।

আমি খবরের কাগজটা টেবিলের তলায় লুকিয়ে ফেললাম। ঝরনামাসি দেখে ফেললে আবার মুশকিল হবে। কারণ, আমাদের ফিরতে হবে ওই সেবক রোড দিয়েই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু ঝরনামাসির ছেলে বুবুন শুনে ফেলেছিল আমার আর চৌকিদারের কথাবার্তা। সে খাবারের টেবিলে বসে হঠাৎ বলে ফেলল, 'মা, আজ সন্ধেবেলা ডাকাত দেখতে যাবে? এখানে রোজ মুখোশপরা ডাকাত বেরোয়।'

আর চেপে রাখা গেল না। ডাকাতের কথা এসে পড়লই। মেসোমশাই বললেন, 'আমি শুনেছি, খুব ডাকাতি হচ্ছে এদিকে। গেটের সামনে কয়েকজন লোক বলাবলি করছিল। পরশুদিনও নাকি তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে মাইলখানেক দূরে সেবক রোডের ওপর একটা ডাকাতি হয়েছে।'

ঝরনামাসি বললেন, 'তাহলে আমরা কুচবিহার দিয়ে যাব।'

মেসোমশাই বললেন, 'কেন?'

ঝরনামাসি বললেন, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন যেতে হলে সন্ধের পর ওই সেবক রোড দিয়ে যেতে হবে! তোমাদের কী মাথা খারাপ হয়েছে? সঙ্গে এত জিনিসপত্তর।'

এই রে, ঝরনামাসি একবার গোঁ ধরলেই মুশকিল! কুচবিহার যাওয়া মানে এক ঝামেলা। অনেক সময় লেগে যাবে। আর এদিক দিয়ে নিউ জলপাইগুড়িতে গিয়ে দার্জিলিং মেল ধরলে আমরা পরদিন ভোরেই কলকাতায় পৌঁছে যাব!

বুবুন বলল, 'না মা, আমরা ওই ডাকাতের রাস্তা দিয়ে যাব! আমরা ডাকাত দেখব।'

ঝরনামাসি এক ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর তো! বড়ো দুষ্টু হচ্ছিস দিন দিন।'

কাছাকাছি একটা চা-বাগানের ম্যানেজার মেসোমশাইয়ের বন্ধু। পরদিন দুপুরে আমরা নেমন্তন্ন খেতে গেলুম তাঁর বাংলোয়।

কথায় কথায় ডাকাতের প্রসঙ্গ উঠল।

ম্যানেজারের নাম অজয়বাবু। তিনি বললেন, 'আপনারাও ডাকাতের কথা শুনে ভয় পেয়েছেন নাকি?'

ঝরনামাসি বললেন, 'ভয় পাব না? ডাকাতদের কে না ভয় পায়!'

বুবুন বলল, 'আমি ভয় পাই না!'

অজয়বাবু বুবুনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এই তো চাই।'

তারপর তিনি ঝরনামাসির দিকে ফিরে বললেন, 'বাঘ, হাতি আর ডাকাতদের নিয়ে আমাদের থাকতে হয়। আমাদের কী আর ওসব ভয় পেলে চলে?'

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা আজ ওই রাস্তা দিয়ে দার্জিলিং মেল ধরব ভেবেছিলাম, কিন্তু চিন্তা হচ্ছে।'

অজয়বাবু বললেন, 'চিন্তার কী আছে? আমার জিপ গাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। ডাকাতরা জিপ দেখলেই ভাববে পুলিশের গাড়ি, অমনি পালাবে। যদি চান তো বন্দুকটাও দিয়ে দিতে পারি সঙ্গে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বুবুন বলল, 'হ্যাঁ, বন্দুকটা চাই। ডাকাত এলেই গুড়ুম গুড়ুম করে গুলি করে দেব।'

ঝরনামাসি বললেন, 'বন্দুক তো দেবেন, কিন্তু সেটা চালাবে কে?'

অজয়বাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, আপনারা কেউ জানেন না?'

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম, কোনোদিন আমি একটা সত্যিকারের বন্দুক হাতে নিয়েই দেখিনি। মেসোমশাই নাকি এককালে শিকার করতেন। কিন্তু ঝরনামাসি সে-কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং মেসোমশাইও চুপ করে রইলেন।'

অজয়বাবু বললেন, 'সে দরকার পড়লে আমার ড্রাইভারই বন্দুক চালাতে পারবে। দরকার হবে না অবশ্য...আমি নিজেই আপনাদের পৌঁছে দিতাম, কিন্তু আমার আবার একটা বিশেষ কাজ আছে...'

বিকেল থাকতে থাকতেই আমরা জিপ গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝরনামাসি বললেন, 'না হয় বেশিক্ষণ স্টেশনে বসে থাকব, কিন্তু সন্ধের পর ওই রাস্তা দিয়ে যাবার দরকার নেই।'

রাস্তাটা কিন্তু চমৎকার। দু-পাশে চা-বাগান, মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা গেছে এঁকে বেঁকে। সমতল ভূমি ছাড়িয়ে একসময় পাহাড়ের গা দিয়ে যেতে হয়। তারপর তিস্তা নদীর উপর করোনেশান ব্রিজ। এমন সুন্দর জায়গা খুব কমই আছে। বিরাট চওড়া এখানে তিস্তা নদী, ঠিক যেন রুপো-গলা জল। ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে গেলে কালিম্পং-এর রাস্তা। আমরা যাব বাঁদিকে।

বিকেল শেষ হয়েছে, হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। এসব পাহাড়ি জায়গায় আস্তে আস্তে সন্ধে নামে না। যাই হোক আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব।

সারাটা রাস্তা বুবুন ব্যাকুলভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে। তার খুব আশা ছিল যে-কোনো মুহূর্তে পাশের জঙ্গল থেকে একপাল হাতি কিংবা ডাকাত বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেরকম রোমাঞ্চকর কিছুই ঘটল না।

আমাকে সে বারবার জিজ্ঞেস করছিল, 'ও নীলুদা, বলো না, ডাকাতদের কীরকম দেখতে হয়?'

ওর ধারণা, ডাকাত বুঝি ভূত বা দৈত্যের মতন আলাদা ধরনের কিছু।

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'বড়ো বড়ো কান, চোখ দুটো দিয়ে আগুন জ্বলে, ডাকাতদের হাতে নখও থাকে খুব বড়ো বড়ো...'

পাহাড়টা সবে পার হয়ে আমরা সমতল রাস্তায় এসেছি, এমন সময় ঘ্যাস-স-ঘ্যাস-স আওয়াজ করে আমাদের জিপ গাড়িটা থেমে গেল।

ঝরনামাসি আঁতকে উঠে বললেন, 'কী হল?'

ড্রাইভারটি নেপালি এবং খুব গম্ভীর! সে কোনো কথা না বলে রেগে গিয়ে গাড়ির বনেট খুলল। তারপর খুটখাট করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে।

ঝরনামাসি বললেন, 'কী হল, এই নীলু, নেমে দ্যাখ না।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাইরে শীতের ফিনফিনে হাওয়া, তার মধ্যে নামতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আর না নেমে উপায় নেই। ড্রাইভারটির পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া হুয়া? কতক্ষণ বাদ চলেগা?'

ড্রাইভার খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'নেই চলেগা!'

'অ্যাঁ?'

ততক্ষণে মেসোমশাইও নেমে এসেছেন, আমার চেয়ে গাড়ির যন্ত্রপাতির ব্যাপার তিনি ভালো বোঝেন। তিনি ভালো করে দেখে বললেন, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার! গাড়ির রেডিয়েটার ফুটো হয়ে সব জল পড়ে গেছে রাস্তায়। আর ফ্যান-বেল্টও ছিঁড়ে গেছে। এখন এই গাড়ি চালাবার আর কোনো উপায়ই নেই।'

ঝরনামাসি সে খবর শুনে দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার ওই অজয়বাবুটার কী আক্কেল? এরকম একটা পচা গাড়ি দিয়ে আমাদের পাঠিয়েছেন।'

মেসোমশাই বন্ধুর সমর্থনে দুর্বলভাবে বললেন, 'আহা, যন্ত্রপাতির কথা কী বলা যায়, কখন কোনটা খারাপ হয়?'

মেসোমশাই ঝরনামাসিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এদিক থেকে আরও গাড়ি যাবে তো, তাদের কাউকে বললে আমাদের নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই!'

ঝরনামাসি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'এখানে জঙ্গলের মধ্যে কে তোমার জন্য ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকবে!'

ঝরনামাসি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই আবার হাসছিস? তোর লজ্জা করছে না? তখনই আমি বলেছিলাম কুচবিহার দিয়ে যেতে—'

এ রাস্তায় গাড়ি চলাচল সত্যি খুব কমে গেছে। অন্য সময় লরি আর প্রাইভেট গাড়ি যায়। কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা গাড়ি এল না। সবাই কী ডাকাতের ভয় পেয়েছে? লরি তো কখনো বন্ধ হয় না। একটা পুলিশের গাড়ি এলেও তো পারত।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। একটু কাছে আসতে দেখা গেল ট্রাক। একটা নয়, পরপর তিনটে। আমরা হল্লা করতে লাগলাম, 'এই থামো থামো, আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, থামো!'

তারা তো থামলই না, বরং যেন আরও স্পিড বাড়িয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আবার দুটো ট্রাক এল পরপর। এবার আমরা আরও জোরে চেঁচালাম, এবারও তারা না থেমে চলে গেল একইভাবে।

আবার অনেকক্ষণ বাদে একটা গাড়ির আলো যেই দেখলাম, অমনি আমরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলাম তিনজন। দু-হাত তুলে চেঁচাতে লাগলাম। আর যাই হোক, আমাদের তো চাপা দিতে পারবে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রায় চাপাই দিচ্ছিল আর একটু হলে। শেষ মুহূর্তে আমরা লাফিয়ে পড়লাম রাস্তার পাশে, ট্রাকটাও ব্রেক কষল। আমি দৌড়ে ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বললাম, 'বহুত বিপদে পড়া হ্যায়...হাম লোককো ট্রেন পাকড়ানে হোগা, গাড়ি খারাপ হুয়া...'

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। গাড়ির ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে আমার মুখে একটা ধাক্কা দিল খুব জোরে। আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে। গাড়িটাও এর মধ্যে স্টার্ট নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল।

ঝরনামাসি বললেন, 'কী পাজি, শয়তান ওরা! নীলু, তোর বেশি লাগেনি তো?'

ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে আমি বললাম, 'একটা জিনিস বোঝা গেল, কোনো গাড়ি আমাদের নিয়ে যাবে না। দিনকাল খারাপ বলে অচেনা লোককে কেউ তুলতে চাইছে না।'

এবার মেসোমাশাইয়ের মুখটা কালো হয়ে এল। কোনো গাড়ি যদি আমাদের না নিয়ে যায়, তাহলে কী উপায় হবে? জিপটাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে চালাবার কোনো উপায় নেই। সারারাত কী তাহলে আমরা পথের পাশে বসে থাকব?

দু-পাশে ঘন জঙ্গল। রাত্রিবেলা অন্ধকার জঙ্গলে গা ছমছম করে। এদিকে বাঘের উপদ্রব বিশেষ নেই। অবশ্য দু-একটা বাঘ ছিটকে চলেও আসতে পারে। আর আসতে পারে হাতি। অনেক সময়ই এইসব জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়। কিছুদিন আগেই আমরা জয়ন্তিয়ার কাছে দেখেছি যে হাতির দঙ্গল এলে সেখানে একটা-আধটা বন্দুক থেকেও বিশেষ লাভ নেই। তাদের খেয়াল হলে তারা আমাদের সবাইকে পায়ের পাতায় পিষে চ্যাপটা করে দিয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া ডাকাতের ভয় তো আছেই। সারারাত, আমাদের এখানে ডাকাতের ভয় নিয়ে থাকতে হবে।

তার চেয়েও বড়ো ভয় শীত। সারা রাত যদি জিপের মধ্যে বসে থাকতে হয় তাহলে আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাব একেবারে। বাঘ, হাতি আর ডাকাতের ভয় নিয়ে এই দারুণ শীতের রাত কাটানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষত ঝরনামাসি আর বুবুনকে নিয়েই চিন্তা।

অথচ আর কী-ই বা করার আছে?

মেসোমশাই ঘড়ি দেখলেন। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে দার্জিলিং মেল ছেড়ে যাবে। অথচ সেখানে পৌঁছোবার কোনো উপায়ই নেই। হঠাৎ তিনি রেগে গিয়ে নেপালি ড্রাইভারটিকে প্রচন্ড ধমক দিয়ে বললেন, 'কাঁহে এইসা খারাপ গাড়ি লেকে আয়া?'

সে বলল, 'হাম কেয়া করেগা সাব!'

জঙ্গলে কিছু একটা আওয়াজ হলেও আমরা চমকে উঠছি।

শুকনো পাতায় খসখস শব্দ, কে যেন হেঁটে আসছে! একটু পরেই শব্দটা থেমে গেল। সেদিকে টর্চ ফেলেও আর কিছু দেখা গেল না। কেউ কী লুকিয়ে আমাদের লক্ষ করছে?

https://boierhut.com/fb

ঝরনামাসিও এখন আমাদের বকুনি দিতে ভুলে গেছেন।

বুবুন আমার হাতটা শক্ত করে চেপে আছে। মেসোমশাই ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছেন।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় উলটোদিকের জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের ডাল মড়-মড় করে ভেঙে পড়ল। আমরা চমকে লাফিয়ে উঠলাম প্রায়।

আমি আর মেসোমশাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। এইরকমভাবে কাটাতে হবে সারারাত? এরকম চমকে চমকে? অথচ কী যে করা যায়, ভেবেই পাচ্ছি না।

এই সময় উলটোদিকের রাস্তায় একটা হেডলাইটের আলো দেখা গেল। আমার বুকটা ধক করে উঠল। কিন্তু কোনো লাভ নেই। আমরা যেদিকে যাব গাড়িটা আসছে সেইদিক থেকেই। জোরালো আলো দেখেই বোঝা যায় ওটাও একটা ট্রাক।

নেপালি ড্রাইভারটি হঠাৎ বলল, 'সাব, ট্রাক রোকেগা?'

মেসোমশাই বললেন, 'ট্রাক থামবে? কী করে?'

সে সাদা দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসল। তারপর দৌড়ে গিয়ে জিপ থেকে নিয়ে এল বন্দুকটা। তারপর সে আর একটা কাজ করল। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বার করে সেটা বেঁধে ফেলল মুখে। অমনি তার মুখখানা হয়ে গেল মুখোশের মতন।

সে আমাকে বলল, 'সাব, আপ ভি হামারা সাথ আইয়ে!'

তার কোমরে একটা ভোজালি ছিল। সেটা খুলে সে আমার হাতে দিল। তারপর ইঙ্গিতে বোঝাল, আমারও মুখে একটা রুমাল বেঁধে নিতে।

মেসোমশাই উত্তেজিতভাবে আবার ঘড়ি দেখে বললেন, 'দ্যাখো যদি ট্রাকটা থামাতে পারো, তাহলে এখনও দার্জিলিং মেল ধরা যেতে পারে।'

আমি আর নেপালি ড্রাইভারটি গিয়ে দাঁড়ালাম রাস্তার মাঝখানে। মেসোমশাই তখন ঝরনামাসি আর বুবুনকে নিয়ে জিপের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...সেই সময় নেপালি ড্রাইভারটি বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে গুড়ুম করে একটা গুলি চালাল...

হেডলাইটের আলো ঠিক যখন আমাদের মুখে এসে পড়েছে, সেই সময় নেপালি ড্রাইভারটি বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে গুড়ুম করে একটা গুলি চালাল। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। ট্রাকটা যদি না থেমে আমাদের চাপা দিতে আসে তাহলে শেষ মুহূর্তে পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমি তৈরি হয়েছিলাম।

কিন্তু ট্রাকটা থেমে গেল।

নেপালি ড্রাইভারটা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ড্রাইভারের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'রুক যাও। নেহি তো খতম কর দেগা!'

আমি অন্যদিকের জানালায় লাফিয়ে উঠে ভোজালি দেখিয়ে বললাম, 'খবরদার।'

ট্রাকের ড্রাইভার ভয় পেয়ে বলল, 'মারিয়ে মাত, মারিয়ে মাত।'

আমি আবার নেমে পড়ে চলে গেলাম পেছন দিকে। সেখানে প্রচুর মালপত্র রইলেও খানিকটা জায়গা খালি আছে। জিপ থেকে আমাদের মালপত্রগুলো এনে ছুড়ে দিলাম সেখানে। তারপর ঝরনামাসি আর বুবুনকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে দিলাম ওপরে। মেসোমশাইও গিয়ে বসলেন ওদের পাশে।

আমি আবার ড্রাইভারের জানালার পাশে লাফিয়ে উঠে বললাম, 'গাড়ি ঘুরাও।'

নেপালি ড্রাইভারটিও বন্দুকটা ড্রাইভারের কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'আভি গাড়ি ঘুরাও!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ড্রাইভারের পাশে একজন শুধু ক্লিনার বসেছিল। সে বেচারি একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। আমি তার গায়ে খোঁচা মেরে বললাম, 'এই হাটকে বইঠো না!'

ড্রাইভার ট্রাকটা ঘোরাল অনিচ্ছার সঙ্গে, কিন্তু তার আপত্তি করবার উপায় নেই, কারণ কানের পাশেই বন্দুকের নল।

গাড়ি ঘোরাবার পর আমি বললাম, 'জোরসে চালাও।'

বাইরে বেশ কনকনে হাওয়া বলে আমি ভেতরে এসে বসলাম ভোজালি উঁচিয়ে। নেপালি ড্রাইভার বাইরেই রইল, নইলে বন্দুকটা তাক করা যাবে না! আমার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু উপায় নেই, তাহলে মুখ থেকে রুমালটা খুলতে হয়।

এখনও জোরে গেলে ট্রেনটা ধরতে পারি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। আমি ভোজালিটা একবার ড্রাইভারের চোখের সামনে ঘুরিয়ে বললাম, 'জোরসে চালাও! আউর বহুত জোর।'

নেপালি ড্রাইভারটিও বন্দুকের খোঁচা মেরে বলল, 'বহুত জোরসে।'

ট্রাক ড্রাইভার ভাবল, আমরা বুঝি পুরো ট্রাকটাই লুট করতে চলেছি।

দুর্দান্ত জোরে ছুটল। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই দূরে দেখা গেল শহরের আলো। সে একটু একটু টেরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। যেন সে অবাক হয়ে ভাবছে, শহরের মধ্য দিয়ে আমরা যাব কী করে?

সে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেই তো আমরা ধরা পড়ে যাব!

আমি আবার বললাম, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চলো! জোরসে। বহুত জোরসে।'

সে বলল, 'কেয়া? রেলস্টেশন?'

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। মুখের রুমালটা খুলে ফেললাম। নেপালিটিও বন্দুক নামিয়ে বলল, 'স্টেশন আয়া।'

সেদিন ট্রাক ড্রাইভারটি ডাকাতের পাল্লায় পড়লেও শেষ পর্যন্ত মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে একশো টাকা বকশিস পেয়েছিল অবশ্য।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যখন যা চাই, তক্ষুণি সেটা এসে পড়বে, কোনো কিছুরই অভাব নেই। তবু মলয়কুমারের মুখে হাসি নেই। যখন তখন সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। দিন দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। মহারাজার একমাত্র ছেলে এই রাজকুমার মলয়ের খুব অসুখ।

আজকালকার দিনে তো আর আমাদের দেশে একটাও রাজা-মহারাজা নেই। তাই মলয়কুমার সত্যিকারের রাজকুমারও নয়। কিন্তু মলয়ের বাবা পাঁচটা খুব বড়ো কারখানার মালিক। তিনি থাকেন রাজা-মহারাজাদের স্টাইলে। তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিল রাজপুতানা থেকে, কিন্তু এখন সবাই বাঙালি হয়ে গেছে। নিউ আলিপুরে ওঁদের বাড়িটা যে-কোনো রাজবাড়ির চেয়েও বড়ো। এ বাড়ির হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া না থাকলেও গ্যারাজে আছে দশখানা মোটরগাড়ি আর বাড়িভর্তি দাসদাসী। শুধু মলয়কুমারের জন্যই তিনজন চাকর, একজন ঝি, একজন গয়লা আর একজন ড্রাইভার।

মলয় ইচ্ছে করলেই যত খুশি চকলেট-লজেন্স খেতে পারে। কিংবা আইসক্রিম। কিংবা চাইনিজ খাবার। কিংবা সন্দেশ রসগোল্লা। সে মুখের কথাটি খসালেই সব এসে যাবে। কিন্তু মলয় কিছুই খেতে চায় না। তার বয়েস এখন চোদ্দো, রোগা, শুকনো চেহারা। কোনো খাবার তার সামনে আনলেই সে নাক কুঁচকে নাকি-গলায় বলে, 'নাঁ, কিঁচ্ছুঁ খাঁব নাঁ, সঁব কুঁকুরকে খাঁইয়ে দাঁও!'

কত বড়ো বড়ো ডাক্তার আসেন। লম্বা লম্বা কাগজে কতরকম ওষুধের নাম লিখে দিয়ে যান। কিন্তু কিছুই ফল হয় না। আবার নতুন ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি এসে আগের ডাক্তারের সব ওষুধের নাম কেটে দিয়ে আবার নতুন ওষুধ লিখে দেন। মলয়কুমার তবু খাবার দেখলেই বলে, 'কুঁকুরকে খাঁইয়ে দাঁও!'

তার কুকুরটা ইয়া মোটা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর মলয়কুমার আরও শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে খ্যাংরা কাঠি হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার গোরুর দুধে ভেজাল থাকে বলে মলয়ের জন্য আলাদা গোরু কেনা হয়েছে। ওদের নিজস্ব গয়লা মলয়ের মায়ের সামনে সেই দুধ দোয়। কোনোরকম ভেজাল দেবার উপায় নেই। তবু একদিন মলয় সেই দুধে চুমুক দিয়ে বলল, 'ইঁ, পঁচা গঁন্ধ!'

তারপর থেকে আর সে দুধ খায় না। মলয়ের মা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বাড়িতে পোষা গোরুর দুধ যদি ছেলে না খায় তাহলে আর এর চেয়ে ভালো দুধ কোথায় পাওয়া যাবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছেলে যদি দুধও না খায়, তাহলে বাঁচবে কী করে? মলয়ের মা কান্নাকাটি করে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলেন বাড়িতে। তিনি বলতে লাগলেন, ছেলে না খেলে তিনিও আর কিছু খাবেন না।

মলয়ের বাবা কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই থেকে দশজন বড়ো বড়ো ডাক্তার আনিয়ে এক মিটিং বসিয়ে দিলেন বাড়িতে। তাঁর একমাত্র ছেলে, একে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে লাভ হল এই যে, ডাক্তারদের মধ্যেই একটা ঝগড়া বেধে গেল। প্রায় প্রত্যেকে বললেন আলাদা আলাদা রোগের নাম, খেতে বললেন নতুন নতুন ওষুধ।

খালি দুজন ডাক্তার বললেন, মলয়ের কোনো অসুখই নেই। সব সময় ভালো ভালো খাবার খেয়ে খেয়ে ওর হয়েছে অরুচি। সেই দুজনের মধ্যে একজন বললেন, ওকে আর কিছু খাবার দেবার দরকার নেই। দু-দিন উপোসে রাখলেই ছেলে গপাগপ করে সবকিছু খাবে। আর একজন ডাক্তার বললেন, অত কিছু করারও দরকার নেই। না খেতে চাইলেই ওকে দুটো করে থাপ্পড় মারতে হবে। দশ-বারোটা থাপ্পড় খেলেই ওর সব রোগ সেরে যাবে।

মলয়ের বাবা সেই দুজন ডাক্তারের দিকে কটমট করে তাকালেন। আর তাঁদের বিদায় করে দিলেন তক্ষুনি। বাকি আটজন ডাক্তারের আট রকম ওষুধেও কোনো উপকার হল না। মলয় সেইসব ওষুধও কুকুরকে খাইয়ে দিতে বলল।

তারপর হোমিয়োপ্যাথি, কবিরাজি, সাধুবাবুর ওষুধ, ফকিরের তাবিজ—অনেক কিছু দিয়েই চেষ্টা করা হল। কিছুতেই কিছু হয় না। মলয় এখন শয্যাশায়ী। আর বেশিদিন বোধহয় সে বাঁচবে না।

তখন বাড়ির একজন চাকর মলয়ের মাকে বলল, 'মা, বৌবাজারে এক জ্যোতিষী আছেন, তাঁকে এনে দেখাবেন? তিনি আবার কবিরাজি চিকিৎসাও করেন। ওনার চিকিৎসায় মরা মানুষও উঠে বসে।'

মলয়ের মা বললেন, 'ডাক, ডাক শিগগির, সেই জ্যোতিষীকে ডাক।'

সন্ধেবেলা সেই জ্যোতিষী এসে হাজির। তার নাম মাধব পন্ডিত। তার চেহারা দেখলে কিন্তু ভক্তি হয় না একটুও। পাগলা পাগলা চেহারা, খালি পা, গায়ে গেঞ্জির ওপর একটা চাদর জড়ানো, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর চোখ দুটো গাঁজাখোরদের মতন লাল। সে এল ও-বাড়ির চাকর গয়ারামের কাঁধে হাত দিয়ে।

বাড়িতে ঢুকেই সে বলল, 'বাপরে বাপ, কত বড়ো বাড়ি! দেখলেই ভয় করে। নিশ্চয়ই এ বাড়িতে অনেক কুকুর আছে?'

এ বাড়িতে সব মিলিয়ে পাঁচটা কুকুর আছে সত্যি। বাঘের মতন চেহারা।

মাধব পন্ডিত বলল, 'আগে সব কুকুর বাঁধো!'

মলয়ের বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ আবার কী চিকিৎসা করবে?'

মলয়ের মা বললেন, 'দেখাই যাক না ও কী বলে। কুকুরগুলো বাঁধতে বলো!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মাধব পন্ডিত মলয়ের ঘরে ঢুকেই বলল 'টক টক গন্ধ!'

মলয় চোখ বুজে শুয়েছিল, চোখ খুলল না।

মাধব পন্ডিত বলল, 'সব পচা খাবার!'

মলয় এবার চেয়ে দেখল মাধব পন্ডিতকে।

সন্ধ্যাবেলা সেই জ্যোতিষী এসে হাজির...

মাধব পন্ডিত বলল, 'এসব পচা খাবার কী রাজপুত্তুর খেতে পারে? ওর দোষ কী?'

মলয়ের বাবা বললেন, 'পচা খাবার মানে? কলকাতার সবচেয়ে বড়ো দোকানের সবচেয়ে ভালো খাবার দেওয়া হয় ওকে।'

মাধব পন্ডিত বলল, 'হোটেলের খাবার, দোকানের খাবার তো! ওসব আমি জানি। ছেলেকে খাঁটি টাটকা খাবার দিন। ছেলে ঠিক খাবে!'

মলয়ের মা বললেন, 'বাড়ির পোষা গোরুর দুধ, সেটাও টাটকা নয়? এর থেকে টাটকা দুধ আর হয়?'

মাধব পন্ডিত জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার গোরু?'

'মূলতানের গোরু!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'তাই বলুন! যাদের বয়েস ষোলো বছরের কম, তাদের কক্ষনো মূলতানী গাইয়ের দুধ সহ্য হয় না। ভাগলপুরী গোরুর দুধ সবচেয়ে ভালো।'

মলয়ের বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, কালই ভাগলপুর থেকে গোরু কিনে আনাচ্ছি।'

মাধব পন্ডিত বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। ভাগলপুরের গোরু কলকাতায় এসে খাবে কী? সেই তো শুকনো খড়? তাতে আবার পচা দুধ দেবে। ভাগলপুরের ঘাস খাওয়াতে হবে। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা শিশির পড়ে থাকে যে ঘাসে, সেই ঘাস খাওয়াতে হবে গোরুকে। তাহলে সেই গোরু টাটকা দুধ দেবে।'

'ভাগলপুরের ঘাস এখানে কী করে পাব?'

'এখানে পাবেন না। ভাগলপুরে পাবেন।'

'ঠিক আছে। ভাগলপুরে একটা বাড়ি কিনছি, মলয় গিয়ে কিছুদিন ওখানে থাকুক!'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। সেই দুধ খেয়ে হজম করতে হবে তো! আপনার ছেলের হয়েছে বদহজমের অসুখ, এখন ভাগলপুরের জল তো ওর সহ্য হবে না! ওর জন্য এখন লাগবে দেওঘরের দুধকুন্ডের জল।'

'তাহলে দেওঘরে একটা বাড়ি কিনি, সেখানে গিয়ে থাকুক কিছুদিন।'

'দেওঘরে থেকে ভাগলপুরের গোরুর দুধ খাবে কী করে?'

'রোজ আনিয়ে নেব ওখান থেকে। তাহলে ছেলে ঠিক সারবে তো?'

'ছেলে কি শুধু জল আর দুধ খেয়ে বাঁচবে? ভাত খেতে হবে না? শাক, তরকারি, মাছ মাংস খেতে হবে না? ও ছেলের কপালে কী লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন?'

'কপালে আবার কী লেখা আছে? থাকলেও তা দেখা যায় নাকি?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি। ওর কপালে লেখা আছে লালগোলা...।'

'লালগোলা?'

'হ্যাঁ, লালগোলা! লালগোলা একটা জায়গার নাম।'

'তা তো জানি! কিন্তু একটা জায়গার নাম ওর কপালে লেখা থাকবে কেন?'

'আগের জন্মে ও জন্মেছিল লালগোলায়। ওর ষোলো বছর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত ওকে লালগোলার রূপশালি ধানের ঢেঁকিছাটা চালের ভাত খাওয়াতে হবে।'

'ঠিক আছে, সেই চালই আনাব।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। বলেছি না, টাটকা জিনিস চাই। প্রত্যেকদিন এককৌটো ধান ঢেঁকিতে ছাঁটিয়ে সেই চালের ভাত খাওয়াতে হবে। আগের দিনের চালের ভাত খাওয়ালে কোনো লাভ হবে না।'

'বাবা:! তাহলে তো লালগোলায় গিয়ে থাকতে হয়। সেখানে একটা বাড়ি কিনব?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'কিন্তু লালগোলায় গিয়ে থাকলে দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের টাটকা দুধ খাবে কী করে?'

'তাও তো বটে!'

'আরও আছে! হজমের অসুখের পক্ষে খুব ভালো হচ্ছে পেঁপে সেদ্ধ। ওই পেঁপেসেদ্ধ খাইয়ে আমি কত রুগিকে ভালো করেছি। কোথাকার পেঁপে বিখ্যাত জানেন? পুরুলিয়া। পুরুলিয়া থেকে প্রত্যেকদিন একটা করে গাছ থেকে ছিঁড়ে-আনা টাটকা পেঁপে যদি খাওয়াতে পারেন...'

মলয়ের বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 'অসম্ভব! যত সব বুজরুকি! পুরুলিয়ার পেঁপে, লালগোলার চাল, দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের দুধ—প্রত্যেকদিন এগুলো এনে খাওয়ানো যায়? এত বাড়ির ছেলেরা সাধারণ খাওয়া খেয়ে ঠিকঠাক থাকছে...'

মাধব পন্ডিত বলল, 'এত বাড়ির ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলের তুলনা? ও তো সাধারণ ছেলে নয়। চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি ক্ষণজন্মা। কবে যে মায়া কাটিয়ে চলে যাবে!

মলয়ের মা প্রায় কেঁদে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ? ছেড়ে চলে যাবে? ওগো তুমি যেমন করে পারো, ওগুলো জোগাড় করো!'

মলয়ের বাবা বললেন, 'তা আমি জানি না। ব্যবস্থা তোমাকেই করতেই হবে!'

তখন মলয় হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি পুরুলিয়ার পেঁপে খাব!'

সবাই চমকে উঠল সেই কথা শুনে। অনেকদিন বাদে মলয় এই প্রথম একটা কিছু খেতে চাইল নিজের মুখে।

মলয়ের মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোকে পুরুলিয়ার পেঁপে এনে দেব। আজই এনে দেব।'

মলয় বলল, 'আমি লালগোলার চাল খাব।'

মলয়ের মা বললেন, 'হ্যাঁ, তাই এনে দেব।'

মলয় আবার বলল, 'আমি দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের দুধ খাব। সব একসঙ্গে।'

এই বলে মলয় মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সে ভেবেছে, এইবার তার বাবা জব্দ হবেন। সে যখন যা চেয়েছে, সবই এনে দিয়েছেন তার বাবা। কিন্তু এবার আর তিনি পারবেন না।

কিন্তু মলয়ের বাবা মাধব পন্ডিতের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এই সবই আমি জোগাড় করব। কিন্তু পন্ডিত, এতেও যদি ছেলের অসুখ না সারে?'

মাধব পন্ডিত বলল, 'এরপরও যদি আপনার ছেলের রোগ না সেরে যায়, তাহলে আমার নাক-কান কেটে আমায় ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবেন। কিন্তু একদিন খাওয়ালে হবে না। রোজ খাওয়াতে হবে এরকম, ছ-মাস ধরে অন্তত একটানা।'

মলয়ের বাবা বললেন, 'তাই হবে! এতেও যদি ছেলে না সারে, তাহলে তোমার গর্দান নেব আমি। রেলের চাকার নীচে তোমার কাটা মুন্ডু গড়াবে। আর যদি ভালো হয়ে যায়...তাহলে তোমায় কত দিতে হবে?'

https://boierhut.com/fb

মাধব পন্ডিত চোখ বুজে জিভ কেটে বলল, 'আমায় কিছু দিতে হবে না। আমি পয়সা-কড়ি ছুঁই না। লোকের চিকিৎসা করে যদি আমি টাকা নিতাম, তাহলে কী আর আমাকে খালি পায়ে হাঁটতে হয়? আমি শুধু পরের উপকার করি।'

যেন একটা খুব মজার কথা বলেছে, এইভাবে মাধব পন্ডিত নিজেই হেসে উঠল হো হো করে।

মলয়ের বাবা সেইদিনই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। চারজন চাকরকে পাঠালেন চারদিকে। এখন ট্রেনে বাসে সব জায়গায় যাওয়ার অনেক সুবিধে আছে। চারজন চাকর চলে যাবে লালগোলা আর দেওঘর আর ভাগলপুর আর পুরুলিয়া। সেখান থেকে তারা ভোরবেলা চাল, জল, দুধ আর পেঁপে নিয়ে ফিরে আসবে বিকেলের মধ্যে। জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে তারা আবার চলে যাবে তক্ষুনি। আবার পরের দিন আসবে। এইভাবে চলবে। চারজন লোকের শুধু ওই কাজ।

সত্যি সত্যি পরদিন চারজন লোক নিয়ে এল চাল আর জল আর দুধ আর পেঁপে। সেগুলো নামিয়ে রেখেই তারা আবার ছুটল স্টেশনে। সেই দুধ ফোটাবার পর মলয়ের মা বললেন, 'এবার খাবি তো?' মলয়ের বাবা কোমরে হাত দিয়ে রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন। মলয় দুধের গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'আ, এই দুধটা পচা নয়।' তারপর দেওঘরের জলে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'আ, এই জলটা খাঁটি।' এরপর সে লালগোলার চালের ভাত আর পুরুলিয়ার পেঁপেসেদ্ধ খেল বেশ আরাম করে অনেকদিন পর।

দিনের পর দিন এইরকম চলতে লাগল। স্বাস্থ্য ফিরে গেল মলয়ের। এক সপ্তাহের মধ্যেই সে শুরু করে দিল দৌড়ঝাঁপ। ওদের বাড়িতে সকলের মুখে হাসি ফুটল। শুধু মলয়ের পোষা কুকুরটা আর মলয়ের ফেলে-দেওয়া ভালো ভালো খাবার খেতে পায় না বলে মাঝে মাঝে কুঁইকুঁই করে।

এরপর এই গল্পের শুধু আর একটু বাকি আছে। সেটা অবশ্য মলয়দের বাড়ির কেউ জানে না। লেখকরা ডিটেকটিভদের মতন সবকিছু জেনে ফেলে কিনা, তাই ওটুকু আমিও জেনে ফেলেছি।

মলয়দের বাড়ি থেকে চারজন চাকর বেরিয়ে যায় স্টেশনের দিকে। তারা যাবে লালগোলা আর দেওঘর আর ভাগলপুর আর পুরুলিয়া। স্টেশনের কাছাকাছি এসেই তারা সুট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে পালিয়ে যায়। চারজনেই চলে আসে বৌবাজারে মাধব পন্ডিতের আস্তানায়। সেখানে তারা খুব করে গাঁজা আর জিলিপি খায় আর ঘুমোয়। পরদিন একজন রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল ভরে নেয় কুঁজোয়। একজন ছানাপটির গয়লাদের কাছ থেকে কিনে নেয় এক কিলো দুধ, একজন বাজার থেকে কিনে নেয় সবচেয়ে সস্তা চাল, আর একজন কেনে একটা পেঁপে। তারপর সেইগুলো নিয়ে খুব ব্যস্ত ভাব করে চলে যায় বাড়ি। সেগুলো রেখেই তারা আবার দৌড়োয়। আবার এসে হাজির হয়ে যায় মাধব পন্ডিতের আড্ডায়। ভাড়ার পয়সা বাঁচিয়ে সেই পয়সায় খেয়ে তারা নিজেরা খুব আনন্দ করে।

https://boierhut.com/fb

কলকাতার আর সব ছেলেরা যে চাল আর দুধ আর জল আর পেঁপে খায়, সেগুলো খেয়েই কিন্তু এখন মলয়ের স্বাস্থ্য খুব ভালো হয়ে গেছে। এখন সে ইস্কুলের টিমে দারুণ ক্রিকেট খেলে! আর বাড়ি ফিরেই বলে, 'শিগগির খাবার দাও, দারুণ খিদে পেয়েছে!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেণী লস্করের মুন্ডু

মুর্শিদাবাদ জেলায় চিংড়িপোতা নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। সেই গ্রামে সাত-আটটির বেশি পাকাবাড়ি নেই, ইস্কুল নেই, পোস্ট-অফিস নেই, শুধু প্রতি শনিবার একটা হাট বসে। অনেক দূর দূর থেকে মানুষ আসে। সেই গ্রামের মানুষ অধিকাংশই গরিব হিন্দু আর মুসলমান। কিছুই দেখার নেই গ্রামের। শুধু যেখানে হাট হয়, তার মাঝখানে সাদা পাথরের তৈরি একটি মানুষের মূর্তি বসানো আছে।

মূর্তিটি বেশ পুরোনো। একজন বুড়ো মতন বাঙালি ভদ্রলোকের মূর্তি, চোগা-চাপকান পরা, মুখখানা দুঃখী। মূর্তিটার পায়ের কাছে ইংরেজিতে কিছু লেখা ছিল—এখন এত অস্পষ্ট যে বোঝাই যায় না। হাটে যে-সমস্ত মানুষ আসে, তারা কেউ জানে না মূর্তিটা কার। পুরোনো দিনের কথা আমরা বড্ড তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। গ্রামের যেসব ছেলেরা চায়ের দোকানে কিংবা নদীর ধারে আড্ডা মারে তাদের জিজ্ঞেস করলেও বিশেষ কিছু বলতে পারে না। দু-একজন ঠোঁট উলটে বলে, 'শুনেছি, লোকটা নাকি উকিল ছিল।' গ্রামের খুব বুড়ো কয়েকজন শুধু জানে ওই মূর্তিটার ইতিহাস।

আমি একসময় মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামে গ্রামে হেঁটে ঘুরেছিলাম। চিংড়িপোতা গ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ খুব বৃষ্টি আসায় আমি দৌড়োতে দৌড়োতে গিয়ে একটা পাকা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই বাড়ির মালিক আবদুল রব আমাকে খুবই খাতির যত্ন করেছিলেন, চমৎকার চমৎকার খাবার খাইয়েছিলেন। সে-রাত্তিরে আমাকে আর আসতে দেননি, তার বদলে অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। সেইখানেই আমি বেণীমাধব লস্করের গল্প শুনি।

সে অনেক দিন আগের কথা। তখন আমরা জন্মাইনি, আমাদের বাবারাও জন্মায়নি, আমাদের ঠাকুরদা দাদুরা তখন খুব ছেলেমানুষ। সে সময় আমাদের দেশে পুরোপুরি ইংরেজ রাজত্ব, আমরা তখন পরাধীন জাতি। রাস্তায় মাঠে সাহেবদের দেখলে এ দেশের মানুষ ভয়ে দূরে সরে যায়। আদালত-বিচারালয়ে বেশিরভাগ হাকিম আর বিচারকও ছিলেন সাহেব।

মুর্শিদাবাদের একটি মহকুমা শহরের আদালতে একজন সামান্য মোক্তার ছিলেন এই বেণীমাধব লস্কর। তখনকার দিনে ছোটো উকিলকে বলা হত মোক্তার—লোকে বলত বাংলা জানা উকিল। কেন-না, আদালতে উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট সবাইকেই তো তখন ইংরেজিতে কথা বলতে হত—মোক্তাররা বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নিত। মোক্তার কথাটা আরবি শব্দ, ইংরেজিতে বলা হত মুকটিয়ার।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যাইহোক, সেই আদালতে দু-তিন জন উকিল মোক্তার ছিল—তাদের মধ্যে বরদা রায় আর মোহন মোল্লার কাছেই বেশি মক্কেল আসত। বুড়ো বেণীমাধব লস্করের ভাগ্য ছিল খুবই খারাপ—সে একটু তোতলা ছিল বলে সে যখন উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যেত, তখন সবাই হেসে ফেলত। তাই মক্কেলরা কেউ তার কাছে সহজে আসে না। আদালতের সামনে একটা বটতলায় সে হ্যাংলার মতন বসে থাকে, আর লোকজন দেখলেই বলে ওঠে, 'এই যে-এই যে! এখানে আসুন, ভা-ভা-লো মোক্তার।'

নেহাত গরিব লোক ছাড়া বিশেষ কেউ আসে না তার কাছে। খুব কম পয়সা দিয়ে কাজ সারে। সারাদিনে বেণীমাধব লস্করের আট আনা এক টাকার বেশি রোজগার হয় না।

বেণীমাধবের মুখে কেউ কখনো হাসি দেখেনি। সব সময় গোমড়া মুখ। সেটা তার রোজগার কম হয় বলেই নয়—তার খুব মাথা ধরার অসুখ। সব সময় তার ভীষণ মাথা ধরে থাকে। তখন তো আর এতরকম মাথা ধরার ওষুধ বেরোয়নি যে, টক করে দুটো বড়ি খেয়ে নিলেই সেরে যাবে। নানারকম কবিরাজি হাকিমি ওষুধ খেয়েও তার কিছুই হয়নি। মাঝে মাঝে তার যন্ত্রণা এত বাড়ে যে, সে দু-হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে ছটফট করে।

কিন্তু এই বেণীমাধব লস্করই একদিন সবার কাছে দারুণ কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা শুরু হল এইভাবে।

একদিন আদালতের টিফিনের সময় বেণীমাধব লস্কর বাইরের সেই বটতলায় বসে আছে মক্কেলের আশায়। মাথার ব্যথাটা খুব বেড়েছে, দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে মাথা—এই সময় একজন জোয়ান চেহারার মুসলমান তার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কর্তা, আমার একটা গোরু চুরির মামলা আছে।'

বেণীমাধব উৎসাহিত হয়ে উঠে বলল, 'কী মা-মা-মামলা? বসো এখানে! ভা-ভালো করে বলো!'

লোকটি বলল, 'আমার দুধেলা গাই মুঙলিকে পাচ্ছি না দু-দিন ধরে। তাহের আলি সেটাকে চুরি করেছে। নিজের গোয়ালে ঢুকিয়ে রেখেছে—গ্রামের আর পাঁচজন দেখেছে।'

বেণীমাধব খাতা পেনসিল বার করে কিছু লিখতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লোকটির চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার মাথার মধ্যে যেন চিড়িক করে উঠল। মুখখানা শুকিয়ে গেল। ভয় পেয়ে বলল, 'না বাপু, আমি তোমার মামলা নিতে পারব না।'

লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? আগে টাকা দিতে হবে? এই যে টাকা এনেছি।'

লোকটি তার কোমর থেকে একটা রুপোর টাকা বার করল। বেণীমাধব সেটা ছুঁয়েও দেখল না। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি রজ্জব আলি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

... ‘কর্তা,আমার একটা গোরু চুরির মামলা আছে ।’

‘তোমার গাঁয়ের নাম কি পলাশধুবি?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘আমি বাপু তোমার মামলা নিতে পারব না। তুমি বাড়ি যাও—’

লোকটি রেগে উঠে বলল, ‘কেন? বাড়ি যাব কেন? অন্য উকিল মোক্তার নেই? ভীমরতি ধরেছে বুড়োর। আমার গোরু চুরি গেছে, তার জন্য মামলা করতে পারব না?’

বেণীমাধব বলল, ‘ভালো চাও তো বাড়ি যাও।’

লোকটি কী বুঝল কে জানে, আর কথা বাড়াল না। পেছন ফিরে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। আশেপাশের দু-একজন উকিল-মোক্তার ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। তারা সবাই অবাক। বেণীমাধবের এমনিতেই মক্কেল জোটে না। আর চকচকে রুপোর টাকা দেখেও সে মক্কেল ফিরিয়ে দিল?

মোহন মোল্লা এসে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হে বেণীমাধব, লোকটাকে একেবারে তাড়িয়ে দিলে! ব্যাপারটা কী?’

বেণীমাধব বলল, ‘লোকটা ভালো না।’

‘আগে থেকে চিনতে লোকটাকে?’

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'না।'

'তাহলে? গোরু চুরির মামলা নিয়ে এসেছে—লোকটা ভালো কী খারাপ তা দেখার দরকার কী?'

'না হে মোল্লা সাহেব, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। লোকটাকে আগে থেকে চিনতাম না। কে যেন আমার মধ্যে বলল পলাশধুবির রজ্জব আলি। ওর মামলা নিয়ো না।'

'বটে, বটে? এ যে তাজ্জব কথা।'

'শুধু তাই নয়, লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর একটা জিনিস দেখলাম। একখানা যেন ছবি। দেখলাম, এই রজ্জব আলি একখানা মস্ত বড়ো দা দিয়ে একটা সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ছোকরার ঘাড়ে কোপ মারছে। মারতে মারতে তাকে মেরে ফেলল। এই লোকটা খুনি!'

মোহন মোল্লা হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, 'আজকাল কী আফিং ধরেছ নাকি? না, গাঁজা-টাজা খাচ্ছ?'

বেণীমাধব অসহায়ভাবে বলল, 'না, না, বি-বিশ্বাস করো, সত্যি সত্যি দেখলাম।'

মোহন মোল্লা হাসতে হাসতে সবার কাছে এই গল্প করল। সবাই ভাবল, বুড়োর এবার মাথা খারাপ হয়েছে। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে!

গল্পটা ছড়িয়ে পড়ল অনেকের মধ্যে। এখন বেণীমাধবকে দেখলেই লোকে হাসে।

কিন্তু দু-তিন দিন বাদে সত্যি সত্যি পলাশধুবির রজ্জব আলি মানুষ খুনের দায়ে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। সে তার প্রতিবেশীর সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেকে মেরে কচুরিপানার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। লোকে একটু অবাক হল। কেউ কেউ ভাবল, ওই খুনের সময় নিশ্চয়ই বেণীমাধব কোনোক্রমে দেখে ফেলেছিল, সেই কথাটাই বলেছে অন্যভাবে।

এর দিন দশেক বাদে বেণীমাধব আর একটা আশ্চর্য কাজ করে ফেলল। সেদিন আদালতে একটা বড়ো মামলা চলছিল—অনেকেই সেটা দেখতে এসেছে। শশধর কুন্ডু বলে একটা লোক একসঙ্গে তিন-তিনজনকে খুন করেছে। আজ সেই শশধর কুন্ডুর বিচারের শেষ দিন। নির্ঘাত তার ফাঁসি হবে। অন্য অনেকের সঙ্গে বেণীমাধবও শুনছিল এক কোণে বসে। হাতে তার কোনো কাজ নেই। মাথার যন্ত্রণাটা তার আজকে আবার বেড়েছে।দু-হাত দিয়ে শক্ত করে মাথা চেপে ধরে আছে।

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'শশধর কুন্ডু নির্দোষ। শশধর কুন্ডু নির্দোষ!'

সবাই চমকে উঠল। আদালত চলার সময় এইরকমভাবে চেঁচিয়ে ওঠা খুব বেআইনি। হাকিম হচ্ছেন চারলস উইলবারফোরস, ছোকরা বয়েস, ভীষণ রাগী। তিনি বললেন, 'সাইলেন্স।'

বেণীমাধব তবু বলল, 'শশধর কুন্ডু নির্দোষ। হুজুর ওকে ফাঁ-ফাঁ-ফাঁসি দেবেন না।'

হাকিম বললেন, 'সাইলেন্স। এই মুকটিয়ারকো নিকাল দেও!'

বেণীমাধব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়োর অনার। আমাকে একদিন টাইম দিন। আমি জানি ও খুন করেনি। শশধর কুন্ডু নট গিলটি ইয়োর অনার।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তারপর সে দৌড়ে আসামির কাছে এসে বলল, 'তুমি আর একদিন সময় চাও। আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। খুন করেছে পুলিন সরকার। কী ঠিক কি না?'

খুব হইহই হয়েছিল সেদিন। বেণীমাধব বলেছিল, 'শশধর কুন্ডুর বন্ধু পুলিন সরকারই খুনগুলো করে বন্ধুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। পুলিন সরকারের বাড়ির উঠোনে গাঁদাফুল গাছতলায় মাটি খুঁড়লে রক্তমাখা ছুরি আর গয়নাপত্তর পাওয়া যাবে।'

সব মিলে গেল।

সেই মামলায় খুব নাম ছড়িয়ে গেল বেণীমাধবের। সবার মুখে তার কথা। বরদা রায় আর মোহন মোল্লার খুব হিংসে হল। লোকেরা এখন মামলার জন্য বেণীমাধব লস্করের কাছেই আসে।

কিন্তু বেণীমাধব সব মামলা নেয় না। আসামির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে, এদিক-ওদিক ঝাঁকায়। তারপর একসময় বলে, 'না বাপু, তোমার মামলা আমি নিতে পারব না। তুমি অন্য রাস্তা দ্যাখো! কিংবা কারুকে আবার বলে, 'তোমার মামলা আমি নেব—কোন হাকিমের সাধ্য, তোমাকে শাস্তি দেয়!' সত্যি সত্যি তার কথা মিলে যায়। যে মামলা সে নেয় না—সেটা নির্ঘাত হার হয়। সে যে-ক-টা মামলা নেয়, প্রত্যেকটা জিতিয়ে দেয়।

তার নাম রটে গেল হারা মামলার ধন্বন্তরি হিসেবে। সে নিজেও বাড়ির সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল ওইরকম :

হারা মামলার ধন্বন্তরি
পছন্দমতো হারা মামলা
লইয়া থাকি।
সাফল্যের গ্যারান্টি ১০০%
ফিস চার টাকা প্রতিদিন,
দরদস্তুর নাই।

পরপর কয়েকটা মামলা প্রায় অলৌকিকভাবে জিতে যাবার ফলে বেণীমাধবের নামে সম্ভব-অসম্ভব অনেকরকম গল্প রটতে লাগল। বেণীমাধবের রোজগার অনেক বেড়ে গেলেও তার এই সৌভাগ্য যে বেশিদিন থাকবে না, তাও বোঝা যায়। তার মাথার মধ্যে সব সময় এখন অসম্ভব যন্ত্রণা। প্রতিটি মামলার পর সে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার আয়ু বেশিদিন নেই।

এর মধ্যেই স্থানীয় জমিদার নন্দ রায়ের ছেলে মধু একটা মামলায় জড়িয়ে পড়ল। প্রজাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের সময় হঠাৎ গুলি চলে—চারজন গরিব প্রজা মারা যায়। জমিদারের ছেলে মধু রায়ই গুলি চালিয়েছে। কিন্তু জমিদার বলছেন, গন্ডগোলের সময় মধু তল্লাটে ছিলই না—সে ছিল বহরমপুরে, তার অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খুব কড়া—তিনি মধু রায়ের নামে সমন জারি করেছেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এইসব মামলায় বড়ো বড়ো উকিল, ব্যারিস্টার লাগে, কিন্তু জমিদারমশাই বেণীমাধব লস্করকে ডাকবার জন্য পালকি পাঠিয়ে দিলেন। বেণীমাধব তখন খুবই অসুস্থ, তবু জমিদারের ডাক এলে না গিয়ে উপায় নেই। পালকিতে যখন উঠতে যাচ্ছে, তখন একজন বৃদ্ধ চাষি হাউমাউ করে কেঁদে এসে বলল, 'বাবুগো, তুমি এ মামলা নিয়ো না। দুশমনটা আমার ছেলেকে মেরেছে।'

বেণীমাধব বলল, 'আমি ন্যায়ের পক্ষে। অন্যায়ের পক্ষে যাবার ক্ষমতা আমার নেই—তাহলে আমি মরে যাব।'

জমিদারমশাই বেণীমাধবকে খাতির করে বসালেন। রুপোর গড়গড়ার নল তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চিংড়িপোতা গাঁয়ের পঞ্চাশ বিঘে জমি আমি তোমার নামে লিখে দেব। শেষ বয়সে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে পারবে।'

বেণীমাধব জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর, আমায় কী করতে হবে?'

জমিদার বললেন, 'শোনো, কতকগুলো গুন্ডাশ্রেণির লোক আমার পাইক-বরকন্দাজদের আক্রমণ করে। আমার পাইকরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়। তা সে মামলা আমি পরে চালাব। কিন্তু ব্যাটারা আমার ছেলে মধুর নাম এর সঙ্গে জড়িয়েছে। মধু তখন ছিল বহরমপুরে। সেখানকার চোদ্দো জন লোক—তাদের মধ্যে দুজন উকিল, একজন পুলিশের লোকও আছে—তারা হলপ করে এর সাক্ষী দেবে। মধুর কোনোই হাত নেই এর মধ্যে— তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই নেই।'

বেণীমাধব বিনীতভাবে বলল, 'তাহলে তো হুজুর যে-কোনো ভালো উকিলই এ মামলা জিতিয়ে দেবে—আমার মতন সামান্য মোক্তারকে ডেকেছেন কেন?'

জমিদার বললেন, 'তোমার সুনাম আছে যে তুমি যে-সে মামলা নাও না। তুমি এই মামলা নিলে কেউ আর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার সাহস পাবে না। অন্য উকিলরাও তোমাকে ভয় পাবে।'

কিন্তু হুজুর, আসামিকে না দেখে আমি তো কিছু করতে পারি না।'

জমিদার রেগে উঠে বললেন, 'আসামি বলছ কাকে? আমার একমাত্র ছেলে, সে আসামি? তাকে দেখার তো দরকার নেই—আমি নিজেই তো সব বলছি তোমাকে।'

'তাকে না দেখলে আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। সে ক্ষমতা আমার নেই।'

তখন জমিদারের ছেলেকে ডেকে আনা হল। তাকে দেখেই বেণীমাধব নিজের মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরল, তার চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল! বেণীমাধব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

ব্যস্ত হয়ে উঠে জমিদারের লোকজন তাড়াতাড়ি জল এনে তার মাথায় ঢালল। একজন স্মেলিং সল্ট-এর শিশি ধরল নাকের কাছে।

বেণীমাধব আস্তে আস্তে উঠে বসল। তার দু-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর, আমাকে মাপ করুন। এ মামলা আমাকে নিতে বলবেন না।'

জমিদার চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'কেন?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আমার ক্ষমতা নেই, আমি পারব না!'

'তোমাকে আমি পাঁচশো টাকা দেব। পঞ্চাশ বিঘে জমি দেব।'

'আমি পারব না।'

'এক হাজার টাকা।'

'হুজুর, আ-আ-আমাকে ছে-ছে-ছেড়ে দিন।'

জমিদার তখন দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, 'দ্যাখো মোক্তার! এ মামলা তোমাকে নিতেই হবে। না হলে তোমার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেব, তোমাকে আমি শেষ করে দেব!'

জমিদার এমন ভয় দেখাতে লাগলেন যে রাজি না হয়ে উপায় রইল না বেণীমাধবের। একতাড়া মোহর হাতে নিয়ে বিমর্ষ মুখে বাড়ি ফিরে এল।

সেদিন রাত্তিরে একটা সাংঘাতিক কান্ড হল। ঘুমের মধ্যে বিছানায় ছটপট করতে লাগল বেণীমাধব। একবার এপাশ, আবার গড়িয়ে ওপাশ। কেউ যেন তাকে ধরতে চেষ্টা করছে—তাতে বেণীমাধব পালাতে চাইছে। বেণীমাধব সেই অবস্থায় চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! ভুল করেছি। আর করব না!'

ছেলে, মেয়ে, বউ বেণীমাধবের বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়েছে! বেণীমাধব কোনোরকমে উঠে বসে ছেলেকে বলল, 'শিগগির কাগজ কলম আন।'

ছেলে কাগজ আর খাগের কলম এনে দিল। বেণীমাধব তৎক্ষণাৎ জমিদারকে চিঠি লিখল যে, সে তাঁর ছেলের মামলা নিতে পারবে না। তার শরীর ভীষণ অসুস্থ। সে আর কোনোদিনই আদালতে যাবে না।

চিঠি লিখে বেণীমাধব ছেলেকে বলল, 'ভোর হতে-না-হতেই এই চিঠি আর মোহরের থলি নিয়ে গিয়ে জমিদারকে দিয়ে আসবি। নইলে আমি আর প্রাণে বাঁচব না।'

সকালবেলা এক ছেলে চলে গেল জমিদার বাড়িতে। আর এক ছেলে আদালতে গিয়ে খবর দিল, বেণীমাধব মোক্তারি পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। আজ থেকে সে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবে, ধর্মকর্ম করবে।

এরপর আবার অন্যরকম একটা ঘটনা শুরু হল। সেদিন সন্ধেবেলা চারলস উইলবারফোরস-এর পেয়াদা এসে খবর দিল যে হাকিম সাহেব বেণীমাধবকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হাকিমের ডাক জমিদারের ডাকের চেয়েও বড়ো। বেণীমাধবের তখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—সেই অবস্থাতেই পালকি ভাড়া করে যেতে হল।

হাকিম সাহেবের বাংলোটি সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো। সবাই জানে তিনি খুব কড়া মেজাজের মানুষ, কিন্তু বেণীমাধবের সঙ্গে সহজভাবেই কথা বলতে লাগলেন। হাকিম বেশ বাংলা শিখেছেন।

তিনি বললেন, 'মুকটিয়ার, তুমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেণীমাধব বললেন, 'হজুর, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। তাই গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শেষ জীবনটা কাটাতে চাই।'

'কী করে বুঝলে যে বাঁচবে না?'

'সে আমি বুঝে গেছি। আমি জ্বরে ভুগছি।'

হাকিম সাহেব নিজে উঠে এসে বেমীমাধবের কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখলেন। তারপর দেরাজ থেকে কয়েকটা ওষুধ বার করে বললেন, 'এগুলো তিন ঘণ্টা পরপর খেয়ে নিয়ো। জ্বর সেরে যাবে।'

বেণীমাধব বললেন, 'জ্বর সেরে গেলেও আমি আর বাঁচব না।'

সাহেব এবার একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'মুকটিয়ার, একথা কি সত্যি যে তুমি মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারো যে সে দোষী না নির্দোষ?'

বেণীমাধব চুপ করে রইল।

সাহেব আবার বললেন, 'আমার পেশকার আমাকে একথা বলেছে, মুনশি বলেছে, আরও অনেকেই এ কথা বলেছে। সমস্ত জেলার লোক এ কথা বিশ্বাস করে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত চিঠি লিখে আমার কাছে একথা জানতে চেয়েছে।'

'হুজুর, আমি সামান্য লোক।'

'আমি লক্ষ করেছি, যে ক-টা মামলা তুমি নাও, ঠিকঠিক জিতে যাও। এর রহস্য কী? সব খুলে বলো, তোমার কোনো ভয় নেই।'

'হুজুর, সব বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। অনেক দিন ধরেই আমার মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা হয়। ইদানীং কোনো মক্কেলের দিকে তাকালেই যন্ত্রণাটা বেড়ে যায়। একসময় মাথার মধ্যে চিড়িক করে ওঠে—আর কে যেন ফিসফিস করে বলে দেয়, সেই লোকটি দোষী না নির্দোষ!'

'হাউ ইন্টারেস্টিং! এর ব্যাখ্যা কী?'

'আমি জানি না, তবে আমার মনে হয়, মৃত মানুষরা আমার সঙ্গে কথা বলে। মানুষ যখন কারুকে খুন করে—তখন সেই মৃত লোকটির আত্মার একটি অংশ ওই হত্যাকারীর মধ্যে ঢুকে যায়। আত্মার অংশটুকুই হত্যাকারীকে আজীবন শাস্তি দেয়। তার চোখের মধ্যে ওই আত্মাটিই আমাকে বলে দেয়, এই-ই আসামি। আর যখন কোনো নির্দোষ লোককে দেখি, তখনও নিহত ব্যক্তিটি আমার চোখের সামনে এসে বলে দেয়—এ নয়, এ নয়! আসল লোককে দেখিয়ে দিচ্ছি! আপনার সেই শশধর কুন্ডুর কেসটা মনে আছে? আপনি তাকে ফাঁসি দিতে যাচ্ছিলেন। যে তিনজন খুন হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েও ছিল। আমি হঠাৎ দেখলাম, সেই বাচ্চা মেয়েটি আমার চোখের সামনে এসে বলছে, এ নয়! তুমি বলে দাও না। আমি আসল লোককে দেখিয়ে দিচ্ছি। তখনই আমি সব দেখতে পেলাম, তখন চেঁচিয়ে না উঠে আমার উপায় ছিল না।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হাকিম বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক! এ কখনো হতে পারে?'

বেণীমাধব বলল, 'বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমার এরকম হয়।'

'আচ্ছা মুকটিয়ার, একটা কথা বলো তো। তুমি যখন অপরাধী কে—এ কথাটা বুঝতে পারো—তাহলে তো তুমি ইচ্ছে করলে সেই অপরাধীকে বাঁচিয়ে দিতে পারো ; তুমি যখন তার বিরুদ্ধে প্রমাণ-ট্রমাণ সবই জানো—তাহলে সেগুলি সরিয়ে দিলেই তো আর কেউ তাকে ধরতে পারবে না।'

'হুজুর, মাথার ওপরে ভগবান আছেন, তিনিই একমাত্র জানেন, আমি জেনেশুনে কোনোদিন অন্যায়ের পক্ষ নিইনি। তা যদি আমি করতাম—তাহলে যেসব মরা মানুষ আমার সঙ্গে এসে কথা বলে—তারা কী আমায় ছেড়ে দেবে, কালকেই তো—'

'কালকে কী হয়েছে?'

বেণীমাধব একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, 'হুজুর, আপনি হাকিম। আপনার সামনে নামধাম বলা উচিত হবে না, কাল এক জায়গায় যেতে হয়েছিল আমাকে। একজনের মামলা নিতে হবে। যেই আমি তার দিকে তাকিয়েছি, দেখলাম কী, চারজন গরিব চাষির মূর্তি সেই লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—সবাই তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে,এ-ই খুনি! আমি আর সে মামলা নিতে রাজি হলাম না। কিন্তু সেই পক্ষ আমাকে ভয় দেখাল, জোর করে আমাকে সেই মামলা নিতে রাজি করাল। মাঝরাত্রে সেই চারজন মরা লোক ঘিরে ধরল আমাকে। ঘৃণার সঙ্গে বলতে লাগল—তুমি আমাদের খুনিকে বাঁচাবে? সেই জন্যই তো আমি মোক্তারি করাই আজ থেকে ছেড়ে দেব ঠিক করলাম।'

হাকিম সাহেব অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি বললে না যে, সব সময় তোমার মাথায় ব্যথা করে? এর জন্য চিকিৎসা করাওনি?'

'অনেক করিয়েছি, কিছুতেই সারে না।'

হাকিম উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মুকটিয়ার, তোমার মুন্ডুটা আমার চাই।'

বেণীমাধব চমকে উঠে বলল, 'কী বললেন?'

'তোমার মুন্ডুটা আমার চাই!'

বেণীমাধব হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হাকিম বললেন, 'তুমি রোনালড রস-এর নাম শুনেছ? মস্তবড়ো ডাক্তার, কলকাতায় বসে বসে সে মশার পেট থেকে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বার করেছে! সে আমার বন্ধু। তাকে আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

'আজ্ঞে, তিনি এসে কী করবেন?'

'শোনো, আমরা খ্রিস্টান। আমরা মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার ঘুরে বেড়ানো কিংবা মরা মানুষ এসে কথা বলে যাওয়ায় বিশ্বাস করি না। তোমার কেসটা খুব সম্ভবত প্যাথোলজিক্যাল—তোমার

https://boierhut.com/fb

মাথার গড়নের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে—যেজন্যই তুমি এসব কল্পনা করো! সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তোমার মৃত্যুর পর তোমার মাথাটা কেটেছিঁড়ে দেখতে হবে।'

'হু-হু-হুজুর, এ কী বলছেন?'

'ভয় পাচ্ছ? তুমি মরে গেলে তো আর তোমার ব্যথা করবে না! ভয় কী?'

'হুজুর, আমরা হিন্দু। মৃত্যুর পর আমাদের শব দাহ না করলে আত্মা—'

'ওই তো, দেহটা পুড়িয়েই তো নষ্ট করবে! তার চেয়ে বিজ্ঞানের উপকারের জন্য দিয়ে দাও। এর থেকে বিজ্ঞানের কোনো রহস্য বেরিয়ে যেতে পারে। তোমাকে দিতেই হবে।'

বেণীমাধব সেদিন কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরল। এ কী সাংঘাতিক কথা, সাহেব তার মুন্ডু কেটে নিতে চায়। এই সাহেব যা গোঁয়ার, জ্যান্ত অবস্থাতেই কেটে নিয়ে যাবে কি না কে জানে! ভগবান, এ কী করলে!

সেদিন থেকে সাহেবের পেয়াদারা তার বাড়ি পাহারা দিতে লাগল, দু-দিন বাদেই বেণীমাধব একেবারে শয্যাশায়ী, মরো মরো অবস্থা। রাত্রির দিকে বেণীমাধবের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে গেল, খবর পেয়ে হাকিম সাহেবও দলবল নিয়ে হাজির হলেন। পাছে ওই মূল্যবান মাথাটা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়!

এদিকে এ খবরও রটে গেছে যে, সাহেব বেণীমাধবের দেহ পোড়াতে দেবে না। ম্লেচ্ছ ডাক্তাররা শরীরটা নিয়ে কাটাছেঁড়া করবে। স্থানীয় হিন্দুরা খুব রেগে গেল। এটা তাদের ধর্মের অপমান। লাঠিসোঁটা নিয়ে তারা এগিয়ে এল—কিছুতেই দেহ নিতে দেবে না। স্থানীয় মুসলমানরাও বলল, 'এটা ভারি অন্যায়। সাহেবরা ধর্মে হাত দিচ্ছে।'

খুব গন্ডগোলের সম্ভাবনা দেখে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও এসে হাজির হলেন। সঙ্গে একজন ডাক্তার নিয়ে। সবাই মিলে ভিড় করে রইলেন বেণীমাধবের ঘরে।

বেণীমাধব চোখ বুঝে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। হাত দু-খানা বুকের ওপর জোড় করা। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। শোনা যায় না। একেবারে মুখের কাছে কান নিলে বোঝা যায় সে বলছে, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। আমি জমিদারের ছেলের মামলা নিইনি। আমি কখনো অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিনি। ভগবান জানেন, কখনো করিনি।'

ডাক্তার নাড়ি ধরে বসেছিল। একসময় হতাশভাবে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সব শেষ।'

হাকিম সাহেব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব শেষ? ভালো করে দ্যাখো!' ডাক্তার আবার পরীক্ষা করে বললেন, 'দেহে প্রাণ নেই।'

হাকিম তখন বেণীমাধবের আত্মীয়স্বজনকে বললেন, 'আপনাদের ধর্মীয় কাজ যা আছে সেরে নিন! আমি এই ডেড বডি নিয়ে যাব। বরফে ঢেকে রাখতে হবে।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, 'চারলস, কাজটা কি ঠিক হবে?'

https://boierhut.com/fb

বেণীমাধবের ছেলে বললেন, 'আমরা দেহ নিয়ে যেতে দেব না।'

হাকিম তেজের সঙ্গে বললেন, 'আমি নিয়ে যাবই। মুকটিয়ারের সঙ্গে আমার এ সম্পর্কে কথা হয়েছিল। ওর আপত্তি ছিল না।'

ঘরের মধ্যে একটা হইচই পড়ে গেল। কারোর কথাই শোনা যায় না। মেয়েরা কান্নাকাটি করছে আর পুরুষরা চেঁচাচ্ছে।

এই সময় বেণীমাধবের আবার চোখ খুলে গেল। ঘরের সবাই আঁতকে উঠল। ডাক্তার বলল, 'বাই জোভ! বাই জোভ!'

বেণীমাধব তীব্র চোখে তাকাল শুধু হাকিম সাহেবের দিকে। অন্যরকম গলার আওয়াজে বেশ জোরে বলে উঠল, 'সাহেব, তুমি বাড়ি চলে যাও!'

ঘরের মধ্যে থেকে অনেকে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, একজন মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ল, কিন্তু হাকিম সাহেব একটুও ভয় পেলেন না। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'মুকটিয়ার, তুমি বেঁচে আছ?'

বেণীমাধব বলল, 'সাহেব, তুমি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাও। একটুও দেরি কোরো না। তোমার বাড়ির দারোয়ান মারা গেছে। তোমার ছেলে আর বউ-এর খুব বিপদ—শিগগির যাও!'

হাকিম সাহেব আর একটুও দেরি করলেন না। দৌড়ে বাইরে চলে এলেন। তাঁর ঘোড়া দাঁড় করানোই ছিল, সেই গভীর রাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন বাড়ির দিকে—অন্যরাও গেল পেছন পেছন। একটু পরেই পরপর বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। ততক্ষণে বেণীমাধব আবার মরে কাঠ। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা।

সেই রাত্তিরে হাকিম সাহেবের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। ডাকাতরা বাড়ির দারোয়ানকে মেরে ফেলে বাংলোর ভেতরে ঢুকে পড়ে মেমসাহেবকে আক্রমণ করতে যায়। মেমসাহেব তার ছেলেকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছিল। ডাকাতরা দুমদাম দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে—সেই সময়ে হাকিম সাহেব এসে পড়লেন। আর একটু দেরি হলে বউ আর বাচ্চাকে বাঁচানো যেত না। একজন ডাকাত মরল, দুজন ধরা পড়ে গেল।

হাকিম সাহেব বেণীমাধবের দেহ কাটাছেঁড়া করে আর দেখতে চাননি। তার বদলে নিজের খরচে বেণীমাধবের একটা পাথরের মূর্তি তৈরি করিয়ে তার গ্রামে স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তলায় লিখে দিয়েছিলেন শেক্সপিয়ারের একটা লাইন:

স্বর্গে, মর্ত্যে এমন অনেক ব্যাপার আছে,
হোরেশিও, যা তুমি কল্পনাও করতে পারো না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুই বন্ধুই ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু আলাদা ইস্কুলে। ওদের মধ্যে টিটো খুব খেলাধুলো ভালোবাসে। পড়ার বই ছাড়া বাইরের বই বিশেষ পড়ে না, বড়োজোর দু-একটা ইংরেজি কমিকস। আর পাপান খেলার মাঠে বিশেষ যায় না, যখনই একটু সময় পায় অমনই একটা গল্পের বই নিয়ে বসে। এমনকী একবার টিটোর সঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েও পাপান একটা ডিটেকটিভ বই পড়ে শেষ করে ফেলেছিল। পাপান ইংরেজি বইও পড়ে। বাংলা বইও পড়ে।

এখন একটানা দশ দিন স্কুল ছুটি। সকালবেলা পড়াশোনা শেষ করে টিটো যায় ব্যাডমিন্টন খেলতে, আর পাপান বড়ো রাস্তার মোড়ে একটা বইয়ের দোকানে এসে নতুন-নতুন বই দেখে, একটা-দুটো কেনে। যাওয়া-আসার পথে রোজই প্রায় এক জায়গায় ওদের দুজনের দেখা হয়ে যায়। গল্প হয় খানিকক্ষণ। টিটো বলে আগের দিনের ব্যাডমিন্টন ম্যাচে একজনকে হারিয়ে দেওয়ার কথা, আর পাপান বলে, কাল রাত্তিরে একটা দারুণ বই পড়লুম, জানিস!

সকাল সাড়ে দশটায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গল্প করছে টিটো আর পাপান। টিটোর হাতে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট, পাপানের হাতে দু-খানা বই। পাশেই একটা ব্যাংক, সামনের রাস্তায় তিন-চারখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গল্পেগল্পে ওরা যখন মশগুল, তখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সুট-টাই পরা, মাথায় আধখানা টাক। মুখে একটা কেউকেটা ভাব। লোকটির হাতে একটা চাবি, সেই চাবি দিয়ে একটা গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে সে টিটো আর পাপানের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলল, অ্যাই, আমার গাড়িতে ঠেসান দিয়েছিস কেন রে? সরে যা! সরে যা!

কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে পাপান একটা নীল রঙের গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই। তাতে কী হয়েছে, গাড়িটা ক্ষয়ে গেছে নাকি? একজন অচেনা লোক তাদের তুই বলবে কেন?

পাপান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা থেকে সরে গেল খানিকটা। লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার গাড়িটা ছুঁয়ে ফেলেছি, এজন্য দুঃখিত!

লোকটি গাড়িতে ঢুকতে গিয়েও এদিকে চলে এল। গাড়িটা যেন একটা পোষা জন্তু, এইভাবে এক জায়গায় হাত বুলোতে গিয়ে চমকে উঠল। গর্জন করে বলল, আমার গাড়িতে আঁচড় কেটেছিস? গাড়িটা নষ্ট করে দিয়েছিস!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...অ্যাই,আমার গাড়িতে ঠেসান দিয়েছিস কেন রে? সরে যা! সরে যা !

পাপান সেদিকে তাকাল, গাড়িটার গায়ে সে কোনো দাগ দেখতে পেল না। তা ছাড়া গাড়ির গায়ে সে আঁচড় কাটতে যাবে কেন? তাও অন্যের গাড়িতে? একটুখানি পিঠটা ঠেকিয়েছিল শুধু।

লোকটি রাগে গরগর করতে করতে বলল, যত সব বিচ্ছু ছেলে! বদমাশ!

এবার টিটো বলল, আপনি গালাগাল দিচ্ছেন কেন? আপনার গাড়ির কোনো ক্ষতি করা হয়নি!

লোকটি প্রচন্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল, চোপ!

তারপর দুটো হাতের পাঞ্জা ঠিক থাবার মতন ওদের দুজনের মুখের ওপর রাখল। এক ধাক্কায় ওদের দুজনকেই ফেলে দিল মাটিতে। কঠিন ফুটপাথে মাথা ঠুকে গেল টিটো আর পাপানের।

ওরা আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই লোকটি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টিটো আর পাপানের যত না ব্যথা লেগেছে, তার চেয়েও ওরা আহত হয়েছে বেশি। বিনা দোষে একজন লোক ওদের গায়ে হাত দিল? এর আগে কেউ কোনোদিন ওদের সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করেনি। ওরা কোনোদিন মারই খায়নি!

কলকাতার রাস্তায় এরকম কত কী ঘটে, অন্য কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। কত লোক হেঁটে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে। একদম কাছাকাছি দু-চারজন লোক ওদের ওরকমভাবে পড়ে যেতে

https://boierhut.com/fb

দেখে একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল, তারপর চলে গেল যে-যার নিজের কাজে। কেউ সেই লোকটিকে একটু বাধাও দিল না, কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

টিটো আর পাপান গায়ের ধুলো ঝেড়ে হতবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। এটা কী হল? কেন লোকটা এরকম অসভ্যের মতন ব্যবহার করে চলে গেল? লোকটা কে?

ব্যাংকের গেটে একজন বন্দুকধারী দরোয়ান থাকে। সে বন্দুকটা পাশে শুইয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে খৈনি খাচ্ছে। টিটো তার কাছে গিয়ে বলল, এইমাত্র যে-লোকটি বেরোল ব্যাংক থেকে, তাকে আপনি চেনেন? এখানে প্রায়ই আসে?

দরোয়ান ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, কোন লোক? কত লোক তো যাচ্ছে আর আসছে!

টিটো বলল, বেশ লম্বা, খয়েরি সুট পরা।

দরোয়ান বলল, সুট এখন সবাই পরে। শীত পড়েছে, সুট পরবে না!

বোঝা গেল, এর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না!

পাপান বলল, আমি গাড়ির নম্বরটা দেখেছি। *9837,* তবে আগে কী ছিল? *WMF,* না *WMB ?*

টিটো বলল, আমি দেখিনি। আর ওকে ধরা যাবে না!

পাপান চোয়াল শক্ত করে বলল, ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। অকারণে একটা লোক অন্যায় করে যাবে? ওকে শাস্তি পেতেই হবে! 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে...' তুই এই কবিতাটা পড়িসনি, টিটো?

টিটো বলল, কিন্তু ওকে খুঁজে পাব কী করে?

পাপান বলল, পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, ওকে আমরা ঠিক খুঁজে বার করব। ওর মুখটা যেন ভুলে যাস না। দাঁড়া, একটু চোখ বুজে ওর মুখের ছবিখানা মনে গেঁথে রাখি।

টিটো বলল, ওর মুখটা আমার মনে না থাকলেও, দেখলেই চিনতে পারব।

তারপর থেকে ওই ব্যাংকের সামনেটায় নজর রাখে দু-বন্ধুই। যদি সেই লোকটি বা গাড়িটাকে দেখা যায়! ব্যাঙ্কটার সামনে দিয়ে মাঝে মাঝে দু'জনেই হাঁটে। অন্য সময়েও রাস্তার যে-কোনো গাড়ির নম্বরটা ওরা একবার দেখে নেয়। লম্বা-চওড়া, খয়েরি কোটপরা একজন লোককে পেছন থেকে দেখে পাপান অনেকখানি ছুটে গেল তার মুখটা দেখার জন্য। সে অন্য লোক।

লোকটি আর ব্যাংকে আসে না। রোজরোজ কেই-বা ব্যাংকে যায়! তবে পাঁচ দিন পর অন্য একটি সুযোগ পাওয়া গেল।

পাপান টিকিট কাটতে গিয়েছিল গ্লোব সিনেমায়। হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা গাড়ির নম্বরের দিকে। *9837,* তবে আগের অক্ষরগুলো *WMD*। আগের অক্ষরগুলো মেলাটাই বেশি দরকার, একই নম্বরের অনেক গাড়ি থাকতে পারে। কিন্তু এ-গাড়ির রংটাও নীল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে নিউ মার্কেটের সামনে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যদি এই গাড়িটাই সেই লোকটার হয়? কিন্তু পাপান একা একা সেই লোকটাকে দেখতে পেলেই বা কী করবে? কী করে শাস্তি দেবে? টিটোকে একটা খবর দেওয়া দরকার। টিটোদের বাড়িতে টেলিফোন আছে।

একটা দোকান থেকে ফোন করল পাপান। টিটো জিজ্ঞেস করল, তুই ঠিক জানিস ওটা সেই গাড়ি? নীল রঙের অ্যামবাসাডর গাড়ি তো কতই আছে!

পাপান একটু দুর্বলভাবে বলল, না, একেবারে ঠিক বলতে পারছি না। অন্য গাড়িও হতে পারে। কিন্তু যদি সেই গাড়িটাই হয়? গাড়িটাকে ফলো করলে সেই লোকটার বাড়িটা চিনে আসা হবে।

টিটো বলল. ঠিক আছে, তুই নজর রাখ। আমি আসছি!

একটু দূরে, অন্য একটা গাড়ির আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পাপান। টিটোর আসতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগবেই। তার আগেই যদি লোকটা বেরিয়ে আসে নিউ মার্কেট থেকে? অতবড়ো লোকটার সঙ্গে পাপান গায়ের জোরে পারবে না। তবে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে একটা ল্যাং মেরে আছাড় খাওয়াতে পারে। তাতেই অনেকটা প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কিন্তু ওর সঙ্গে যদি অন্য লোক থাকে?

ঠিক তাই। টিটো এসে পৌঁছোবার আগেই নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এল সেই লোকটা। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, সেই লোকটাই বটে। তার সঙ্গে রয়েছে আরও দুজন লোক। তারা নীল গাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে হাসতে হাসতে। হাতে কয়েকটা প্যাকেট। পাপানের মনটা দমে গেল। এখনই তো ওরা গাড়িতে উঠে চলে যাবে, সে কী করবে?

লোকটিকে ভালো করে দেখবার জন্য পাপান অনেকটা কাছে এগিয়ে এল।

সেই আসল লোকটাই গাড়ি চালাবে। একটা ভিখিরি বুড়ি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল তার কাছে। লোকটা ধমকে উঠল, এই, যা! সরে যা!

বুড়ি তবু সরে না। ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

তারপরের ব্যাপারটা দেখে আতঁকে উঠল পাপান। লোকটা সাঁ করে কাচ তুলে দিল গাড়ির জানালার। তাতে আটকে গেল ভিখিরি বুড়িটার হাত। বুড়িটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে, ওরে বাবা রে, মরে গেলাম রে বলতে লাগল, আর ভেতরে সেই লোকগুলো খলখল করে হাসছে।

ঠিক এই সময় টিটো এসে ডাকল, পাপান!

কাছেই একটা ট্যাক্সি থেমেছে, তার মধ্যে বসে আছে টিটো। পাপান দৌড়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে বলল, সেই গাড়ি, সেই লোক। ওকে ফলো করে বাড়িটা দেখে আসতে হবে।

জানালার কাচ আবার নামিয়ে নীল গাড়িটা এবার স্টার্ট দিয়েছে।

https://boierhut.com/fb

পাপান উত্তেজিতভাবে বলল, ওই লোকটা, ওই লোকটা, ওর মতন খারাপ লোক আমি পৃথিবীতে আর দেখিনি। একটা ভিখিরিকে শুধু শুধু কী কষ্ট দিল! ওকে ছাড়া হবে না, ওকে শাস্তি দিতেই হবে!

টিটো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, আপনি আবার চলুন, শিগগির!

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাব?

টিটো আর কিছু বলবার আগেই পাপান বলল, ডানদিকে ঘুরিয়ে নিন।

সে একটা গল্পের বইয়ে পড়েছে যে, অল্পবয়সি ছেলেরা কোনো ট্যাক্সিতে চেপে অন্য কোনো গাড়ি ফলো করতে বললে ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা সন্দেহ করে। যেতে চায় না। সেইজন্য পাপান শুধু আগের গাড়িটা দেখে দেখে বলতে লাগল, ডানদিকে, এবার বাঁদিকে।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর টিটো ফিসফিস করে বলল, গাড়িটা কত দূর যাবে রে? ট্যাক্সিভাড়া অনেক হয়ে গেলে কী করে দেব? আমার কাছে বেশি পয়সা নেই। তোর কাছে আছে?

পাপান বলল, আমার কাছে তো পাঁচ টাকার বেশি নেই!

টিটো বলল, এর মধ্যেই পনেরো টাকা উঠে গেল, আমার কাছে আছে মাত্র দশ টাকা।

পাপান বলল, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। এখন আর ওকে ছাড়লে চলবে না।

নীল গাড়িটা এসে থামল টালিগঞ্জে, বড়ো রাস্তা ছেড়ে একটা ছোটো রাস্তায় ঢুকে একটা পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির সামনে। পাপান আর টিটো নেমে পড়ল একটু দূরে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ওরা ঠিকানা খোঁজার ভান করে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। এ রাস্তাটা অন্ধকার অন্ধকার মতন। সেই বাড়িটার সামনে একটা লোহার গেট, ভেতরে একজন দরোয়ান বসে আছে। লোক তিনটে ভেতরে ঢুকে গেছে, ভেতরটায় কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এ তো বেশ বড়োলোকের বাড়ি। এখন কী করা যায়?

পাপান ভাবল, লোকটা এমন বড়োলোক হয়েও একটা বুড়ি ভিখিরিকে অমন কষ্ট দেয়? পাষন্ড! ওকে শাস্তি দিতেই হবে!

বাড়িটার সামনে এমনিই ঘোরাঘুরি করা যায় না। ট্যাক্সি-ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। পাপান ঠিক করে ফেলেছে যে, ওই ট্র্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরতে হবে, না হলে ভাড়া দেবে কী করে? বাড়িতে গিয়ে দাদার কাছে টাকা চাইতে হবে। দাদা যদি এখন বাড়িতে না থাকে, তাহলে মায়ের কাছে!

টিটো বলল, এখন আর তো কিছু করার নেই। বাড়িটা তবু চেনা হল।

পাশ থেকে গায়ে চাদর-জড়ানো একটি লম্বা মতন ছেলে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কী চাই ভাই? কাকে খুঁজছ?

https://boierhut.com/fb

টিটো বলল, কিছু চাই না। একটা ঠিকানা খুঁজছি। আমার এক বন্ধু থাকে পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়িতে, কিন্তু সে তো ওরকম লোহার গেটওয়ালা বাড়ি বলেনি, এমনই সাধারণ দোতলা বাড়ি। ওই বাড়িটা কার বলতে পারেন?

লম্বা ছেলেটি বিরক্ত ভাব করে বলল, ওটা তো রঘু চৌধুরীর বাড়ি। কেন, তার সঙ্গে তোমাদের কী দরকার?

পাপান বলল, না, না, কোনো দরকার নেই। এমনই জিজ্ঞেস করছিলাম।

ছেলেটি বলল, মহা পাজি লোক! লোককে ঠকিয়ে ঠকিয়ে অত বড়ো বাড়ি করেছে। এটা আগে ছিল একজন বিধবা ভদ্রমহিলার, তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর বাড়িটা রঘু চৌধুরীর হয়ে গেল। লোকে বলে, ওই রঘু চৌধুরীই বিধবা মহিলাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে!

টিটো চোখ বড়ো-বড়ো করে বলল, খুন? ওকে পুলিশে ধরেনি?

ছেলেটি বলল, ওর সব বড়ো-বড়ো লোকের সঙ্গে চেনা আছে। কী সব কলকাঠি নেড়েছে, কেউ ওকে ছুঁতেও পারেনি!

টিটো আবার জিজ্ঞেস করল, আপনারা পাড়ার লোক কিছু করতে পারেননি? ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল না?

ছেলেটি বলল, ওকে ধরাছোঁয়া অত সহজ নয়। আমরা কিছু করতে গেলে আমাদেরই পুলিশে ধরিয়ে দেবে। জানো, আমি ওর কাছে একবার চাকরি চাইতে গিয়েছিলাম। আমার কথা ভালো করে শুনলই না, দূরদূর করে তাড়িয়ে দিল, কুকুর লেলিয়ে দিল!

ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্য হয়ে গেছে, ওদের উঠে পড়তে হল। ফেরার পথে আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইল পাপান।

এরপর দু-তিন দিন দুই বন্ধু দেখা হলেই ওই রঘু চৌধুরীকে নিয়ে আলোচনা করে। লোকটা অসভ্য, নিষ্ঠুর, খুনি অথচ তাকে কেউ শাস্তি দিতে পারে না। একটা খারাপ লোক মানুষের ক্ষতি করে ঘুরে বেড়াবে, এত বড়ো বাড়িতে থাকবে, অথচ কেউ জানতে পারবে না তার আসল রূপটা? একটা কিছু করতেই হবে, কিন্তু কী করা যায়?

ওরা দুজন মাঝে মাঝে চলে আসে টালিগঞ্জে। সেই বাড়িটার সামনে ঘোরাঘুরি করে। দু-একবার রঘু চৌধুরীকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে। একবার রঘু চৌধুরীর সঙ্গে পাপানের চোখাচোখিও হয়ে গেল। কিন্তু রঘু চৌধুরী তাকে চিনতেও পারল না। ও নিশ্চয়ই অনেক, অনেক লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তাদের মুখ মনে রাখতে পারে না।

ওরা খবর জোগাড় করল যে, রঘু চৌধুরী এ-পাড়ার দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময় অনেক টাকা চাঁদা দেয়। তাই কেউ তাকে ঘাঁটায় না। তবে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে বলছিল, রঘু চৌধুরী আসলে স্মাগলার, তাই ওর এত টাকা।!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একদিন সকালবেলা ওই বাড়ির লোহার গেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা দেখল, ভেতরে একটা সুন্দর সবুজ লন। সেখানে দুটি ফুটফুটে ছেলে, পাপানদের চেয়ে অনেক ছোটো। মনে হয় ক্লাস ফোর আর ফাইভে পড়ে, একটা বল নিয়ে খেলছে, আর তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছে রঘু চৌধুরী আর একটা কুকুর। বাবা ছেলেদের সঙ্গে খেলছে আর সবাই মজা করে হাসছে। এক একবার ছোটো ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছে রঘু চৌধুরী। কুকুরটা লাফাচ্ছে পাশে।

কী সুন্দর দৃশ্য! মনে হয় কী আনন্দময় এই বাড়ি! রঘু চৌধুরী তার ছেলেদের সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করে, আর খুব খারাপ ব্যবহার করে বাইরের লোকদের সঙ্গে।

সেদিন ফেরার পথে টিটো বলল, আর টালিগঞ্জে এসে কী হবে রে পাপান? কিছুই তো করা যাবে না!

পাপান বলল, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

টিটো সঙ্গে সঙ্গে উৎসুকভাবে বলল, কী?

পাপান বলল, ওকে বেনামি চিঠি লিখব! ওপরে একটা মানুষের মাথার খুলি এঁকে লিখব, সাবধান রঘু চৌধুরী! তুমি যদি পাপ কাজ বন্ধ না করো, তাহলে তোমার মুন্ডু উড়ে যাবে! ইতি মেঘনাদ! মেঘনাদের তলায় একটা জ্বলন্ত তির আঁকা থাকবে!

টিটো বলল, এই চিঠি পেলে ও হাসতে হাসতে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে! মোটেই ভয় পাবে না।

পাপান বলল, কেন ভয় পাবে না? তুই কী করে জানলি ওদের বাড়িতে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট আছে?

টিটো বলল, সব বাড়িতেই থাকে। শুধু চিঠি পড়ে ভয় পাবে কেন? মুন্ডু ওড়াবার ক্ষমতা যে তোর আছে, তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবি?

পাপান বলল, আরও বেশি ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখব!

টিটো বলল, ধুত! ওতে কিছু হবে না। অন্য রাস্তা ভাব।

পরদিন বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলতে না গিয়ে টিটো দৌড়ে দৌড়ে চলে এল পাপানের বাড়িতে। ছাদে টেনে নিয়ে গেল। তারপর দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, আজ ইস্কুলে কী দেখলাম জানিস! ওই ছেলে দুটো আমাদের ইস্কুলেই পড়ে!

ওই ছেলে দুটো মানে?

রঘু চৌধুরীর দুই ছেলে। এদের নাম অজয় আর সুজয়। আমাদের জয়দেবের ভাই গোগো ওই সুজয়ের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। গোগো বলল, ওরা দুই ভাই-ই খুব ভালো। পড়াশোনায় ভালো, ব্যবহারও খুব ভদ্র! ওই নীল গাড়িটা ছুটির পর ওদের নিতে আসে। তাহলে তো খুব কাছাকাছি এসে গেল রে!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রঘু চৌধুরীও হয়তো কোনোদিন স্কুলে আসবে। তারপর ওকে পেছন থেকে ল্যাং মারব?

তার চেয়ে অনেক কঠিন শাস্তি দেওয়ার কথা আমার মাথায় এসে গেছে। শোন টিটো, মনে কর, তুই একদিন জানতে পারলি যে, তোর বাবা একজন চোর কিংবা খুনি—

অ্যাই, কী হচ্ছে কী? আমার বাবা কীরকম লোক, সবাই জানে।

আহা, সত্যি-সত্যি বলছি না! ধর, যদি এমন হত! তোর কিংবা আমার বাবাকে সবাই খুব ভালো লোক বলেই জানে, হঠাৎ একদিন প্রমাণ বেরিয়ে গেল বাবা একজন খুনি, তাহলে তোর মনের অবস্থা কী হত?

বাবাকে আমি ঘেন্না করতাম।

ঠিক তাই। রঘু চৌধুরী লোকটা তো সত্যিই খারাপ!

ওর ছেলে অজয় আর সুজয় তা জানে না। ওরা বাবাকে ভালোবাসে। ওদের আমরা সব কথা জানিয়ে দেব। প্রমাণ দেব। তখন ওরা বাবাকে ঘেন্না করতে শুরু করবে। সেটাই হবে রঘু চৌধুরীর শাস্তি।

গুড আইডিয়া, কিন্তু...

এর মধ্যে আবার কিন্তু কী?

অজয় আর সুজয় অত ছোটো... বাবা সম্পর্কে হঠাৎ ওইসব জানতে পারলে ওদের মনে খুব আঘাত লাগবে না? ওদের তো কোনো দোষ নেই! অন্য কিছু করা যায় না, পাপান?

অন্য আর কী?

টিটো পাপানের কাছে মাথাটা নিয়ে এসে বলল, তুই যে সেই চিঠির কথাটা বলেছিলি?

দুজনে বুদ্ধি আঁটল অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিনই রঘু চৌধুরী তার বাড়ির লেটার বক্সে একটা চিঠি পেল। সাদা খাম। ভেতরে একটা সাদা পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা

রঘু চৌধুরী, সাবধান!

তোমার পাপের কথা,

কুকীর্তির কথা সব বলে দেব

তোমার দুই ছেলেকে!

ইতি মেঘনাদ

চিঠিটা পড়ে রঘু চৌধুরীর ভুরু কুঁচকে গেল। কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল বটে, কিন্তু সারাদিন তার মনটা খচখচ করতে লাগল।

পরদিন আর একটা চিঠি:

রঘু চৌধুরী, সাবধান!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তোমার ছেলে অজয় সুজয়
কোন ইস্কুলে যায়, আমরা জানি
তোমার বহু পাপের প্রমাণ আছে
আমাদের হাতে
অজয় আর সুজয়কে জানিয়ে দেব
সব কথা, সব কথা
লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে!
ইতি মেঘনাদ

এবারে চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না রঘু চৌধুরী। ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিঠিটা পড়তে লাগল বারবার, তার বুক ঢিপঢিপ করছে। জীবনে সে কখনো এত ভয় পায়নি। নিজের ছেলে দুটিকে সে সত্যিই ভালোবাসে।

এবার এল তিন নম্বর চিঠি:

রঘু চৌধুরী, সাবধান!
আর সময় নেই
তুমি চাও তোমার ছেলেরা তোমায়
ঘেন্না করুক?
সব বলে দেব, সব!
এখনও যদি বাঁচতে চাও
কাল সকাল সাতটায় দেখা করো
বিবেকানন্দ পার্কে বড়ো ছাতিম গাছের তলায়।
ইতি মেঘনাদ
পু: : একা আসবে!

এবার রঘু চৌধুরী ধরে নিল, যে তাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে টাকা চায়। ব্ল্যাকমেইল! তার মুখখানা হিংস্র হয়ে উঠল, চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে পা দিয়ে মাড়িয়ে সে ড্রয়ার খুলে বার করল একটা রিভলভার!

পরদিন ঠিক সকাল সাতটায় রঘু চৌধুরী বিবেকানন্দ পার্কে এসে হাজির। বড়ো ছাতিম গাছটার কাছে এসে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সেখানে বসে আছে একটা তেরো-চোদ্দো বছরের হাফপ্যান্ট-পরা রোগা ছেলে, তাকে সে পাত্তা দিচ্ছে না। তার ধারণা, কোনো বিকট চেহারার গুণ্ডা লুকিয়ে আছে কাছেই। পকেটে হাত দিয়ে সে চেপে ধরে আছে রিভলভারটা।

পাপান হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, এই যে চৌধুরীমশাই, এদিকে আসুন! আমিই মেঘনাদ!

https://boierhut.com/fb

রঘু চৌধুরীর মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল।

দাঁত কিড়মিড় করে বলল, হতভাগা ছেলে! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? মেরে তোর মুখের সব ক-টা দাঁত ফেলে দেব!

একটুও ভয় না পেয়ে পাপান বলল, আমাকে ওরকম শাসাবে না, কোনো লাভ নেই। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে আমার বন্ধুরা। আপনি আমার ওপর আক্রমণ করতে এলেই তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একজন পুলিশে খবর দেবে। তাতেই তোমার দুই ছেলে সব জেনে যাবে!

থমকে গিয়ে রঘু চৌধুরী বলল, তুই কী চাস? কত টাকা?

পাপান হা-হা-করে হেসে উঠল।

রঘু চৌধুরী বলল, শোন, আমি তোকে এক হাজার টাকা দেব। তারপর খবরদার, আমার ছেলেদের কাছে ঘেঁষবি না। যদি ওদের কিছু বলতে যাস, তোকে খুন করে ফেলব। নির্ঘাত খুন করে ফেলব!

পাপান বলল, আমাকে খুন করলেও আমার অন্য বন্ধুরা থাকবে। তারা তোমার ছেলেদের বলে দেবে, তুমি খুনি, তুমি স্মাগলার, তুমি বিনা কারণে অন্য ছেলেদের ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দাও! এইসব শুনে তোমার ছেলেরা তোমাকে ঘেন্না করবে। তোমাকে বাবা বলে মানতে চাইবে না।

রঘু চৌধুরী এক পা এগিয়ে এসে বলল, তুই কত টাকা চাস?

পাপান বলল, এক পয়সাও চাই না! তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে! যদি ক্ষমা না চাও...

রঘু চৌধুরীর শরীরটা কেঁপে উঠল। সমস্ত মুখটা কুঁচকে গেল। হঠাৎ সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, ক্ষমা চাইছি! আর কক্ষনো এসব করব না! কাউকে ঠকাব না, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না। তুমি আমার ছেলেদের কিছু বোলো না। ওরা আমাকে এত ভালোবাসে, বোলো না প্লিজ, কিছু জানিয়ে দিয়ো না ওদের, আমি এখন থেকে আর কোনো অন্যায় করব না।

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রঘু চৌধুরী।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মস্ত বড়ো পুকুরের ওপাশে জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরখানা। তারপর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ার। আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হল বলে এখানকার স্কুলে ভরতি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভরতি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিসে চলে যান, মা খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে। একটাও নতুন গল্পের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশিক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপিচুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পাড়ে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই। আমার তির-ধনুক আছে অবশ্য, তা দিয়ে বাঘ মারা যায় না। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু-একবার। কিন্তু ওই কবরখানাটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশি গা ছমছম করে। বাবার অফিসের পিয়োন মুনাব্বর খাঁ বলেছিল, ওই কবরখানায় নাকি ভূত আছে।

আমি এদিক-ওদিক তাকাই, কখনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কীরকম যেন একটা বোটকা গন্ধ পাই। আর থাকতে ইচ্ছা করে না, এক ছুটে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখানে এসে এখনও যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয়নি। একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছোটো ছোটো ইটের টুকরো বা পাথর ছুড়ে মারি জলের মধ্যে।

পুকুরটা বিরাট বড়ো, আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায় কানায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয়। কোথাও কোনো লোকজন নেই, আমি শুধু একা।

এক-এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদিও কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়, আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের ওপর গোল গোল ঢেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঠিক ওইখানটায় কোনো বিরাট কিছু প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড়ো তো মাছ হতে পারে না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপর থেকে আমি সবসময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর।

পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরোনো। পাথর দিয়ে তৈরি, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জায়গাগুলো গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জলেও ছোটো ছোটো মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বঁড়শি নেই, আর বঁড়শি দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরনের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ওগুলোর নাম বেলে মাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না। মাছগুলো অবশ্য দারুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেকখানি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকল, 'এই বাবলু!'

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো! তাহলে আমায় কে ডাকল? স্পষ্ট শুনলাম, অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোচ্ছেন, তাহলে কে ডাকল। খুব কাছ থেকে! মা-ই কী আমাকে ডেকে চট করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন!

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই।

অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগল। কেউ কোথাও নেই, তাহলে আমায় ডাকল কে? আমি যে স্পষ্ট শুনেছি!

দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে। দোতলায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি তবু মাকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, তুমি কি এই পুকুরঘাটে গিয়েছিলে?'

মা তো খুব অবাক। বিছানার উপর উঠে বসে বললেন, 'কেন, পুকুরঘাটে যাব কেন? তুই বুঝি গিয়েছিলি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হল পেছন থেকে কে আমাকে ডাকল। ঠিক তোমার মতন গলা।'

মা বললেন, 'তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস!'

'না, মা! আমি স্পষ্ট শুনলাম।'

https://boierhut.com/fb

মা রেগে গিয়ে বললেন, 'তুই কেন পুকুরঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা? দুপুরবেলা কেউ একলা যায়?'

'কেন, কী হয় তাতে?'

'না, কক্ষনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই। আর কোনোদিন যাবি না। তোর পড়াশুনো নেই?'

'পড়াশুনো তো হয়ে গেছে।'

'তাহলেও যাবি না! খবরদার।'

মা আমাকে টেনে নিয়ে তার পাশে শুইয়ে দিলেন। পুকুরধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা একথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিয়োন মুনাব্বর খাঁ প্রায়ই সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসে। কী সব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাব্বর খাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সন্ধেবেলা আমি মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই পুকুরটার মধ্যে কত বড়ো মাছ আছে বলো তো? তুমি জানো?'

মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন বলো তো খোকাবাবু?'

আমি বললাম, 'একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকান্ড জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।'

মুনাব্বর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, 'খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরধারে কক্ষনো একলা যেয়ো না। যেতে নেই।'

'কেন, গেলে কী হয়?'

'অনেকরকম বিপদ হয়। তুমি জানো না, এইসব পুরোনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে?'

'পানিমুড়া কী!'

'পানিমুড়া জানো না? পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত!'

'ধ্যাত। জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি?'

'ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোনোনি? এ তো সবাই জানে। পানিমুড়া বড়োদের কিছু বলে না। কিন্তু ছোটোদের জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়।'

'মুনাব্বর খাঁ, তুমি পানিমুড়া দেখেছ?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'হ্যাঁ, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমিরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এইসব পুকুর, জানো তো, খুব পুরোনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এইসব পুকুরের মাঝখানে গাদ্দি থাকে।'

'গাদ্দি কী?'

'গাদ্দি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ডুবে মরে, পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়, ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতের খুব ঝগড়া। পানিমুড়ারা ওপরে উঠে এলেই কবরখানার ভূতরা তাদের তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব ঝটাপটি করে লড়াই করছে!'

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসের গল্প হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'মা, তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছ কখনো? মুনাব্বর খাঁ দেখেছে!'

মা বললেন, 'বসে বসে বুঝি ভূতের গল্প হচ্ছে এই সন্ধেবেলা! মুনাব্বর, তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প বোলো না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? কিছু নেই! ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।'

মুনাব্বর বলল, 'না, মেমসাব। আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।'

মা হেসে বললেন, 'ছাই দেখেছ!'

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্তিরবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিছু দেখতে পাননি। মাকে দেখে ভূতেরা ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, 'তোমার হাতে টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতেরা পালিয়ে গেছে। তুমি অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখো তো!'

মা বলেছিলেন, 'ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অন্ধকারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।'

দু-তিন দিন আমি আর পুকুর ধারে যাইনি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে। দুপুরবেলা কী শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুর। মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের বইগুলিই আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোটো লাঠি। যদি ভূত-টুত আসে তাহলে লাঠি দিয়ে মারব।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...লোকটা এল কোথা থেকে?...

পুকুরের কাছে এসে দেখি, ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই। লোকটা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা ভেজা। লোকটা এল কোথা থেকে? আমাদের এই পুকরে তো বাইরের কোনো লোক স্নান করতে আসে না।

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখল। দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে?

চোর-টোর নয় তো? যদি চোর হয়, লোকটা তাহলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে।

আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে! আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত গুনে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই রে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাহলে কী এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমার মনে হল, ওটা ভূত নয় তো? ও-ই কি পানিমুড়া? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাব্বর খাঁ যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমিরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন। শুধু টাক মাথা। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল তখন দেখেছি, ওর চোখের ওপর ভুরুও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাব্বর মিথ্যে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনোদিন দেখেনি।

তক্ষুনি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেব ভাবছি, এমন সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠল। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তাহলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোর নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইল, আর কিছু না। লোকটার মাথাও দেখা গেল না। তারপর মনে হল, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল, তাতে বিচ্ছিরি নখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগল। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?'

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। চোখ দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার! আমার একবার ইচ্ছে হল, পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার তো হাতে লাঠি আছে।

এবার সেই হাতটা খুব কাছে চলে এল। মনে হল যেন আমার পা চেপে ধরবে। এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকল, 'বাবলু! বাবলু!'

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগল কি না বুঝতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকল, 'বাবলু, বাবলু!'

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচটা টান দিল, আমি ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম।

জলে পড়েই মনে হল, আমি আর বাঁচব না। আমি যে সাঁতার জানি না! পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওমা—! মা!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জলের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনও আমার পা ধরেনি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধহয়।

এরই মধ্যে একবার কোনোরকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, মা—কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। মা আর আমাদের রাঁধুনি আমার গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। আমি চোখ মেলতেই মা বললেন, 'আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশি জল ঢোকেনি। এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে!'

মা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কী যে হত, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কী করে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পরে শুনেছি সে কথা। মা ঘুমিয়েছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকল, 'মা, মা!' ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তখন বাইরে থেকে আবার সেই 'মা মা' ডাক শোনা গেল। তারপর পুকুরঘাট থেকে।

আমি জলে পড়ার সময় 'মা মা' বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এত দূর থেকে মায়ের তো সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'বাবলু, তোকে আমি একা একা পুকুরঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন? কেন জলে নেমেছিলি?'

আমি বললাম, 'মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।'

মা বললেন, 'বাজে কথা।'

আমি বললাম, 'না, সত্যি?'

মা, 'মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি!'

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রাঁধুনি বলল, 'হ্যাঁগো দিদি, এসব পুরোনো পুকুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে।'

মা বললেন, 'সাঁতার না জানলে লোকে জল দেখে ওরকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়। আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাঁতার শেখাব।'

এরপর সাত দিনের মধ্যে আমি সাঁতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কখনো দেখিনি! তবে আমি সাঁতার কাটতে যেতাম নদীতে, ওই পুকুরে আর নয়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অনেকেই জানে, জলার মধ্যে ওই বাড়িটা ভূতের বাড়ি নয়। ওখানে ডাকাতের আড্ডা। তবু কেউ কেউ সন্ধেবেলা ওদিকে তাকালেই ভয় পায়।

জায়গাটা আগে এরকম জলাভূমি ছিল না। সবুজ মাঠ ছিল, ছোটো-ছোটো বাড়িঘর আর একটা শিবমন্দিরও ছিল। আর একটা মস্তবড়ো জমিদার বাড়ি। একবার সেই যে ভয়ংকর বন্যা হল, সুনন্দ তখন বেশ ছোটো, কিন্তু তার বেশ মনে আছে সেই সময়কার কথা। তখন এদিককার সবকিছু জলে ডুবে গিয়েছিল, সুনন্দদের বাড়িও অর্ধেকটা জলের তলায়। দু-দিন বাড়ির ছাদে সবাই উঠে বসেছিল। সেভাবে তো বেশিদিন থাকা যায় না। রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া হবে কী করে? জিনিসপত্র সব ফুরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া জল যদি আরও বেড়ে যায়?

দু-দিন বাদে মিলিটারিরা নৌকো করে এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল স্কুল বাড়িতে। সে জায়গাটা বেশ উঁচু।

সেই সময়কার একটা স্মৃতি সুনন্দের মনে এখন জ্বলজ্বল করে। নৌকো করে যেতে যেতে চোখে পড়েছিল একটা বাতাবি লেবুর গাছ। প্রচুর বাতাবি লেবু হত সেই গাছে। এত বাতাবি লেবু যে খেয়েও শেষ করা যায় না। রোজ খেতে খেতে অরুচি হয়ে যায়। সেই বাতাবি লেবু গাছটার অনেকটাই ডুবে গেছে। শুধু উঁচু হয়ে গেছে দুটো ডাল। তার একটা ডাল জড়িয়ে আছে মস্ত বড়ো সাপ, আর একটা ডালে একটা বিড়াল। এমনিতে সাপ আর বিড়াল খুব শত্রু, বিড়ালের গায়ে খুব লোম বলে সাপে ছোবল দিতে পারে না। আর সাপের চামড়া হড়হড়ে বলে বিড়ালও কামড়াতে পারে না। দেখা হলে এই দু'জনই রেগে ফোঁস ফোঁস করে। কিন্তু সেদিন বন্যার মধ্যে বিপদে পড়ে কেউ কারুর দিকে ফোঁস ফোঁস করছে না, দুজনেই তাকিয়ে আছে করুণভাবে।

তারপর এক সময় তো বন্যার জল সরে গেল। কিন্তু ওই দিক অনেকটা ঢালু ছিল বলে সেখানকার জল গেল না। অনেকটা জায়গা, কোনো পুকুর বা দিঘির চেয়েও অনেক বড়ো, প্রায় একটা হ্রদের মতন। লোকে বলে জমিদারের জলা।

বন্যার সময় জমিদার বাড়ির লোকজন অন্য জায়গায় সরে গিয়েছিল নিশ্চয়ই, তারা কেউ আর ফিরে আসেনি। সে বাড়ির একতলাটা এখনও জলের তলায়। নৌকোয় ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। তবু তো সে বাড়িটা এখনও টিকে আছে। অন্য অনেক ছোটো-ছোটো বাড়ি আর বেঁচে ওঠেনি। শিব মন্দিরটারও ভগ্নদশা।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুনন্দদের বাড়ি এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়। সে পাড়ায় ফিরে এসেছে আগের অবস্থা। স্কুল-বাজার সবই খুলে গেছে অনেক দিন।

সুনন্দ স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে, এবার সে কলেজে পড়তে যাবে। সুনন্দর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে, সেজন্য যেতে হবে খড়্গপুরে আই আই টি-তে। সুনন্দ জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে সেখানেও সুযোগ পেয়ে গেছে। এখন অবশ্য কিছুদিন ছুটি।

সুনন্দদের বাড়ি থেকে জলাভূমির সেই জমিদার বাড়িটা দেখা যায়।

অত বড়ো একটা বাড়ি, কেউ থাকে না সেখানে, সেইজন্যই কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। দোতলা-তিনতলাতেও কতগুলো ঘর, কয়েকটা ঘরের দরজা-জানলা খসে গেছে। কয়েকটা ঘরের জানলা আছে। কোনো কোনো জানলা খোলাই থাকে, আবার জোরে হাওয়া উঠলে বন্ধ হয়ে যায়। সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে এমনিই মনে হয় যেন ঘরের মধ্যে কেউ ঘোরাফেরা করছে।

এক একদিন রাত্তিরে সে বাড়ির ছাদে দেখা যায় আলো। দুটো-তিনটে আলো, ঠিক মশালের মতন। সে আলোও স্থির থাকে না এক জায়গায়। উঁচু-নীচু। এদিক-ওদিক হয়, ঠিক যেন মনে হয়, কেউ আলোর মশাল নিয়ে সেখানে নাচে।

যে-বাড়িতে কোনো মানুষজন নেই, সে বাড়িতে রাত্তিরে বেশ আলোর নাচ দেখলেই অনেকে ধরে নেয়, এসব ভূতের ব্যাপার। অনেকে ধরে নেয়, সবাই নয়। গ্রামেও কিছু কিছু মানুষ এখন আর ভূত প্রেত বিশ্বাস করে না।

সুনন্দ বিজ্ঞানের ছাত্র, সে ভূতের কথা শুনলে হাসে।

ওদের বাড়ির কাজের মেয়ে বাসন্তী ওই আলোর নাচ দেখলেই ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। চিৎকার করতে-করতে বলে, ওগো, ওদিকে কেউ তাকিয়ো না। তাকিয়ো না। ভূতের আগুন দেখলে চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়।

সুনন্দ তাকে হাসতে-হাসতে বলল, বাসন্তীমাসি, ভূত-ফুতরা তো অন্ধকারের জীব। তারা আলো কিংবা আগুন নিয়ে কারবার করে না।

ভূতের সঙ্গে ফুত বলায় বাসন্তী দু-হাতে কান চাপা দিয়ে, চোখ বুজে দৌড়ে চলে গেল।

ভূত যদি না হয়, তাহলে কারা ওই বাড়িতে অন্ধকার রাতে আগুন নিয়ে নাচানাচি করবে? সাধারণ মানুষ কেউ ওখানে যাবে না। তাহলে চোর-ডাকাতরা নিশ্চয়ই?

সুনন্দর ছোটোমামা আকাশ বললেন, চোর-ডাকাতদের তো গোপনে লুকিয়ে থাকার কথা। তারা আগুনের খেলা দেখিয়ে ওদিকে তাকাতে বাধ্য করবে কেন? তাহলে খুব সম্ভবত আলেয়া।

আলেয়া নিয়ে অনেক রহস্য কাহিনি আছে। কিন্তু আলেয়া ব্যাপারটা আসলে কী তা সুনন্দ জানে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এরকম জলা জায়গায় মাঝে মাঝে এক ধরনের গ্যাস জমে যায়। কখনো-সখনো সেই গ্যাস দপ করে জ্বলে ওঠে। দূর থেকে মনে হয়, কোনো মেয়ে যেন জলের মধ্যে আলো হাতে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাই ওই আলোর নাম দেওয়া হয়েছে আলেয়া।

আসলে মেয়েটেয়ে কেউ থাকে না। ওই আলোও একটু বাদেই নিভে যায়। লোকে ভাবে, অদৃশ্য হয়ে যায় সেই মেয়েটি। অনেক মানুষ সেই আলেয়া দেখলে পাগল হয়ে যায়, এমন গল্পও প্রচলিত আছে।

কিন্তু আলেয়ার আলো সব সময় জলের ওপরেই থাকে। তা তিনতলার বাড়ির ছাদে উঠবে কেন? এটা অসম্ভব।

আকাশ বলল, তাহলে এমন হতে পারে, চোর-ডাকাতরা এ আলো দেখিয়ে দূরে ওদের দলের লোকেদের কিছু সিগন্যাল দেয়। সেটা শুধু তারাই বোঝে, অন্য কেউ বোঝে না।

ও বাড়িতে সাধারণ মানুষ কেউ যায় না। তবু, আকাশ সুনন্দকে বলল, চল না, নৌকো করে আমরা ওই বাড়িটা একবার ঘুরে আসি। চোর-ডাকাতরা আমাদের দেখে কী করবে? আমরা তো পুলিশ নই, তাদের ধরতেও যাচ্ছি না। জমিদারদের বাড়িতে যে-কেউ যেতে পারে।

মা-বাবা শুনে দারুণ আপত্তি করলেন। তারা বললেন, কী দরকার ওইসব ঝামেলা করবার? একেই বলে, সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া। না, যেতে হবে না।

কিন্তু আকাশ খুব জেদি আর সাহসী। সুনন্দরও যাওয়ার খুব ইচ্ছে। কিন্তু বাবা-মায়ের সঙ্গে তর্ক করে সে জিততে পারত না। বাবা যদি বলতেন, যেতে হবে না, ব্যাস। তা হলে আর কথা নেই।

কিন্তু আকাশ বারবার বলতে লাগল, অত পুতু-পুতু করলে জীবনে কিছুই হয় না। এমনকী ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলেও সাহস থাকা দরকার।

গ্রামের বিজ্ঞান-চেতনা সমিতির তিনটি ছেলেও দলে জুটে গেল।

নদী থেকে তুলে আনা হল নৌকো। জোগাড় করা হল পাঁচখানা লাঠি। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে এই দলে যোগ দিলেন বিশু চৌধুরী। তিনি গ্রামসুদ্ধ সবারই বিশু কাকা। এক সময় মিলিটারিতে ছিলেন। এখন ফুটবল খেলার রেফারি হন।

এই বিশু চৌধুরীর আছে একটা রাইফেল। কিন্তু তাঁর কাছে একটাও গুলি নেই। অনেকদিন গুলি জোগাড় করা হয়নি। রাইফেলে গুলি চালাবার কোনো দরকারও হয়নি। বিশু চৌধুরীর ধারণা, শুধু রাইফেল দেখলেই বিশ্বশুদ্ধ সবাই ভয় পাবে।

সুনন্দরা যখন নৌকোটায় সবেমাত্র উঠেছে, তখনই বিশু চৌধুরী কাঁধে রাইফেল নিয়ে এসে বললেন, ওরে, আমিও তোদের সঙ্গে যাব। যদি ডাকাত-ফাকাত থাকে, ধরে নিয়ে আসব।

নৌকোটা চালাতে লাগল মমতাজ আর সুদীপ নামে দুটি ছেলে, ওরা বিজ্ঞান-চেতনা সমিতির সদস্য।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নৌকোটা এসে থামল জমিদার বাড়ির দোতলার একটি ঘরের জানলার সামনে। জানলাটা আছে ঠিকই। কিন্তু কোনো গ্রিল কিংবা শিক নেই, সেইজন্য—নামা গেল ঘরের মধ্যে।

বিশু চৌধুরী রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে বললেন, আমি আগে যাব, তোরা আমার পেছন পেছন আয়।

এই ঘরের মধ্যে ছপছপ করছে জল। তারপর একটা বারান্দা। একতলাটা একেবারে জলে ভরতি, সেই জলে কয়েকটা শোল মাছ ঘোরাফেরা করছে দেখা যায়। একতলার সিঁড়িটাও ভেঙে গেল।

তিনতলায় যাওয়ার সিঁড়িটা অবশ্য আস্ত আছে। সেই দিকে এগোতে-এগোতে মমতাজ গ্রামের মতো সুর করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক দুককুর বেলা' ভূতে মারে ঠেলা। ভূতের আছে তিনটে হাত, পাঁচটা চক্ষু মেলা। 'রক্তিম নামে আর একটি ছেলে বলল,' তুই এই গল্পটা জানিস? রাম নামে ভূত পালায়, ভূতেই রামের গান গায়।'

হাসাহাসি করতে করতে সবাই উঠতে লাগল ওপরের সিঁড়ি দিয়ে। ভূত দেখার কথা কেউ ভাবেইনি। ভূত নিয়ে তাই হাসাহাসি করছে।

তিনতলায় মস্ত বড়ো ছাদ, দু-দিকে দুটো ঘর।

ভূত তো নেই-ই, ডাকাতদেরও কোনো পাত্তা নেই। হয়তো দিনেরবেলায় তারা এখানে থাকে না। রাত্তিরেই বা থাকবে কেন? রাত্তির বেলাতেই তো তাদের কাজকারবার হয়।

তবে ছাদের ঘর দু-খানা দেখে মনে হল, এখানে মানুষজন এসে থাকে। লুঙ্গি, জামা ঝুলছে তারে। কিছু কিছু খাবারদাবারও রয়েছে। এমনও হতে পারে, যারা এখানে ছিল, দূর থেকে এদের নৌকোটা দেখতে পেয়ে তারা বাড়ির পেছন দিকে কোনো নৌকোয় চড়ে পালিয়ে গেছে।

পালাবে কেন? ডাকাতরা কী এত ভীতু হয়?

ডাকাতরা যদি এই গ্রামেরই মানুষ হয়, তা হলে সুদীপ্তরা তো তাদের দেখেই চিনে ফেলবে। বিশু চৌধুরী সবাইকেই চেনেন।

তিনি এবার মুচকি হেসে বললেন, ডাকাতরা এই গ্রামেরই লোক হলে আমাদের পক্ষে ভালোই। ডাকাতরা কখনো নিজেদের গ্রামে ডাকাতি করে না। দূরে দূরে যায়। সুতরাং, এ গ্রামে কখনো ডাকাতি হবে না।

খানিকবাদে সবাই ফিরে এল। বিশু চৌধুরী সদর্পে খেলার মাঠে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, এ বাড়িতে ভূত-প্রেত, ডাকাত-ফাকাত যা ছিল, সবাইকে তিনি রাইফেলের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এই রটনার উত্তরেই যেন পরদিনই সন্ধের পর সেই জমিদার বাড়ির ছাদে দেখা গেল আলোর নাচ। শুধু তাই নয়, তার মধ্যেই দেখা গেল একজন মানুষের মুখ। তার মুখখানা এমনই জ্বলজ্বল করছে যে দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

...ছাদের ঘর দু-খানা দেখে মনে হল,এখানে মানুষজন এসে থাকে...

সাধারণ মানুষের মুখ তো এরকম হতে পারে না। তা হলে তো ডাকাতও না। ডাকাতের মুখ অমন জ্বলজ্বল করবে কেন? তবে নিশ্চয়ই ভূত।

আকাশ সুনন্দকে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝলি তো?

সুনন্দ বলল, বুঝব না কেন? যে-কোনো মানুষের মুখেই ফসফরাস মাখালে ওরকম জ্বলজ্বল করতে পারে। যে-কোনো সমুদ্রেই তো রাত্তির বেলা এরকম ফসফরাসের আলো দেখা যায়।

সুনন্দদের এই কথা অন্য কেউ বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞান-চেতনার ছেলেরা ছাড়া আর সবাই এটাকে ভূতের ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছে।

কেউ কেউ আবার গল্প বার করেছে যে, ওই জমিদার বাড়িতে এক সময় এক জমিদার আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন। এখন তাঁকেই দেখা যাচ্ছে এভাবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আকাশ সুনন্দকে বলল, চল না। একদিন রাত্তিরেই ওই জায়গাটা আমরা দেখে আসি। ডাকাতের বদলে যদি ভূত হয়, তবে তো কোনো সমস্যাই নেই। ডাকাতরা তবু গুলি ফুলি চালাতে পারে। ভূতেদের তো সে ক্ষমতা নেই। আর ভূতেরা অশরীরী, তারা যতই ভয় দেখাবার চেষ্টা করুক, মানুষকে তারা ছুঁতেই পারে না।

কিন্তু এবারে মা-বাবার ঘোর আপত্তি। কিছুতেই তারা রাত্তিরে যেতে দেবেন না।

বিজ্ঞান-চেতনার ছেলেদেরও রাজি করানো গেল না। সন্ধ্যের পর তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত থাকে বাড়িতে। একজন বলল, সন্ধ্যের পর নৌকোও পাওয়া যাবে না।

আকাশ পাশের গ্রামের থানায় গিয়ে বলল, আপনারা ব্যাপারটা একটু খোঁজখবর নেবেন না?

পুলিশের দারোগা বললেন আপনাদের গ্রামে চুরি ডাকাতি কিছু হয়েছে? চোর-ডাকাত ধরা আমাদের কাজ। ভূত নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে না। ওসব আপনাদের ব্যাপার।

আগুনের পাশাপাশি মানুষের জ্বলজ্বলে মুখ দেখার ব্যাপারটা আরও তিন-চারদিন চলল।

তারপর আর একটা অদ্ভুত কান্ড হল।

ঠিক রাত্তির এগারোটার সময় জমিদার বাড়ির ছাদে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, তারপর দেখা যায় একজন মানুষের মুখ। এরকম চলে মিনিট পনেরো। তারপর আস্তে আস্তে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু থাকে অন্ধকার।

গ্রাম সুদ্ধু লোক এই দৃশ্য নিজেদের বাড়ির ছাদে উঠে দেখে। কেউই আর তারপর বাইরে বেরোয় না।

এদিনও যথারীতি আগুন জ্বলল, সেই মুখটাও দেখা গেল। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিট। তারপরেই একটা বিকট আর্তনাদ শোনা গেল। যেন কেউ মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। তখনই নিভে গেল সেই আগুন। মিলিয়ে গেল সেই মুখটা। তারপর সব নি:শব্দ।

কী যে ব্যাপারটা হল ওখানে, তা বোঝা গেল না। বোঝার তো কোনো উপায় নেই।

পরদিন সকালে শোনা গেল, পরমেশ্বর পাল নামে এক ডাক্তারের বাড়ির সামনে একটা লোক এসে অস্বাভাবিক কান্ড করছে, দলে-দলে লোক ছুটে যাচ্ছে সেখানে। ওই লোকটাকে নাকি ভূতে পেয়েছে।

আকাশ আর সুনন্দও তখন চায়ের টেবিলে বসেছিল। কিন্তু খবর শুনে কৌতূহল সামলাতে পারল না। গায়ে জামা চড়িয়ে তারাও চলে এল সেই ডাক্তারের বাড়িতে।

পরমেশ্বর পাল এ গ্রামের একমাত্র পাস-করা ডাক্তার। তাঁর বাড়িতেই চেম্বার। সেখানে তিনি রুগি দেখেন। অত সকালে চেম্বার খোলেনি, একটা লোক এসে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চিৎকার করে বলছে, ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান। কে এসেছিল, কে এসেছিল, ওরে বাবা রে, বাঁচান, বাঁচান।

সুনন্দ আর আকাশ এসে দেখল, লোকটা তখনও মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এখন শুধু বলে যাচ্ছে, কে, কে, কে, কে, কে?

সুনন্দ তাকে দেখেই বলল, আরে একে তো চিনি। বাজারে মাছ বিক্রি করে। এর নাম মুকুন্দ।

আকাশ বলল, এর যে এত বড়ো চেহারা আর ইয়া গালপাট্টা গোঁফ, তা দেখে মনে হয়, এ পার্ট টাইম ডাকাতিও করতে পারে।

ডাক্তার পরমেশ্বর পাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এই মাত্র। লোকটিকে একটুক্ষণ ওই অবস্থায় দেখে কাছে এসে ধমক দিয়ে বললেন, এই মুকুন্দ ওঠ। ভেতরে চল, তারপর তোর সবকথা শুনব।

মুকুন্দ তখনও চোখ লাল করে বলল, কে, কে, কে, কে, কে?

তার পাশের একজন লোক বলল, স্যার, ও সারারাত এইরকম করে যাচ্ছে।

ডাক্তার পাল একটু ঝুঁকে মুকুন্দের গালে বেশ জোরে একটা চড় কষিয়ে বললেন, ওঠ। মাথা ঠাণ্ডা করে সবকিছু খুলে বল। নইলে তোর কী অসুখ, তা বুঝব কী করে?

সে তখনও ওই একই কথা বলে চলল।

ডাক্তার পাল তাকে আরও দু-খানা চড় কষালেন বেশ জোরে।

মুকুন্দ এবার খানিকটা ধাতস্থ হল। উঠে বসে ঘোলাটে চোখে চারদিকে তাকিয়ে বলল, আমি কোথায়? আমাকে এখানে কে এনেছে।

ডাক্তার বললেন, যেই আনুক না। তাতে কিছু আসে যায় না। তোর কী হয়েছে, তুই মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিস কেন?

মুকুন্দ বলল, ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান। ওখানে কে এসেছিল? আমি কাল অনেকবার রক্তবমি করেছি।

ডাক্তারবাবু বললেন, রক্তবমির ওষুধ আছে। সেরে যাবে। তার আগে বল, ওখানে মানে কোথায়? কোথায় কে এসেছিল?

মুকুন্দ এবার আস্তে আস্তে থেমে থেমে যা বলল তা এরকম:

মুকুন্দ প্রায় তার দলবলের সঙ্গে রাত্তিরে ওই ডুবে-যাওয়া জমিদার বাড়িতে রাত কাটায়। মাঝে মাঝে সে নিজে ছাদে আগুন জ্বালে। আর নিজের মুখে কেমিক্যাল পাউডার মেখে লোককে ভয় দেখায়।

ডাক্তারবাবু বললেন, তোদের যা আসল জীবিকা, তা তো বুঝতেই পারছি। ডাকাতি। তার সঙ্গে এইসব ব্যাপারের সম্পর্ক কী?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মুকুন্দ বলল, ঠিক কোনো সম্পর্ক নেই ডাক্তারবাবু। মানুষকে ভয় দেখালে আমার বেশ আনন্দ হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, বুঝলাম। এবার বাকিটা বল। কাল কী হল?

মুকুন্দ ভাঙা ভাঙা ভাবে, মাঝে মাঝে থেমে থেমে বলতে লাগল, কাল আমার শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। জ্বর-জ্বর ভাব। ঘুমও আসছিল। তাই ভাবলাম, আজ আর ওই খেলা খেলব না। আমার সঙ্গীসাথিরা কেউ নেই, তারা গেছে অন্য একটা গ্রামে। আমার শরীর খারাপ ছিল বলে তাদের সঙ্গে যাইনি। সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম ছাদের একটা ঘরে। ঘুমও এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখি, ছাদে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে একটা মুখও দেখা যাচ্ছে। আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তবে কে আগুন জ্বালল? ওটা কার মুখ? একবার সেই মুখটা আমার দিকে ফিরে তাকাল। ওরে বাবারে, সে কী ভয়ংকর তার চাহনি। ডাক্তারবাবু, ও কে? ও কে? কে? আমি একটা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর আমি অনেকবার বমি করেছি, আমার বুকটা ধড়ফড় ধড়ফড় করছে। দোহাই ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান। এমনি করলে আমি এক্ষুনি মরে যাব।

মুকুন্দ আবার সেই রকম চ্যাঁচামেচি শুরু করতেই ডাক্তারবাবু তাকে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

এবার আর কারুর সন্দেহ রইল না যে ও বাড়িতে ভূত আছে। মুকুন্দ যে খেলা দেখাত, আসল ভূত এসে তার চেয়েও ভালো খেলা দেখিয়ে দিল।

মুকুন্দকে ডাক্তারবাবু সুস্থ করে তুললেন। তারপর সে বিশু চৌধুরী, আর অন্যান্যদের সামনে কান মুলে ঘোষণা করল, সে ডাকাতদের দলে ছিল ঠিকই, কিন্তু জীবনে আর সে কখনো ওই দলে যাবে না। ডাকাতি ছেড়ে সে আবার শুধু মাছ ধরবে।

ডাকাত দলের অন্যদের কী হল কে জানে। তারাও আর ভূতের ভয়ে কেউ ও বাড়িতে যায় না।

ছুটি ফুরোতে আকাশ চলে এল কলকাতা। সুনন্দও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে খড়্গপুরে এসে ভরতি হল।

কিন্তু তার মনে একটা খটকা রয়ে গেল। কিন্তু ভূতের ব্যাপারটা তাদের গ্রামের মানুষ মেনে নিলেও সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না।

এমনকী হতে পারে যে মুকুন্দ সবটাই বানিয়ে বলেছে? সে নিজে ভূত সাজার খেলা দেখাত। সেটা এমন কিছু ভয়ের ছিল না। কিন্তু এই গল্পটাই বেশি ভয়ের, এটাই আসল ভূতের গল্প। হয়তো ডাকাতি করা ছেড়ে দেবে বলেই মুকুন্দ ওই গল্প বানিয়েছে, যাতে অন্য ডাকাতরাও তাকে অবিশ্বাস না করে।

https://boierhut.com/fb

মোট কথা এরপর থেকে সেই জমিদার বাড়িতে আর কোনো রাতেই ছাদে আগুন জ্বলেনি, কোনো মুখও দেখা যায় না। সুনন্দদের গ্রামে ডাকাতিও হয় না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেবার আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম কাশীতে, আমার ছোটোমাসির বাড়িতে। আমার ছোটোমেসোর বদলির চাকরি, সেইজন্য আমার খুব মজা হয়েছিল। ছোটোমেসো এক-একটা নতুন জায়গায় বদলি হয়ে যান, আর আমি অমনি সেখানে বেড়াতে যাই। এইভাবে আমার মুসৌরি, দেরাদুন, পুনে, তেজপুর, বিশাখাপত্তনম—এই সব ভালো ভালো জায়গা দেখা হয়ে গিয়েছিল।

আমার ছোটোমেসোকে আসলে বলা উচিত বিরাট মেসো। কারণ তাঁর চেহারাটা ভীমের মতন। তেমনি বাজখাঁই গলার আওয়াজ আর সাহস সাংঘাতিক। কেউ ভয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার শেকহ্যাণ্ড করে না। তিনি এমন বজ্রমুষ্টিতে হাত চেপে ধরেন যে তারপর তিন দিন ব্যথা থাকে। আমার ছোটোমাসি আবার তেমন ভীতু। টিকটিকি, আরশোলা কিংবা মাকড়সা দেখলেই ছোটোমাসি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশ্য আমার সেই বিরাট মেসোও যে পৃথিবীতে একটা জিনিসকে খুব ভয় পান, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম সেবার কাশীতে।

ছোটোমাসিরা বাড়ি নিয়েছিলেন বেনারস স্টেশনের উলটো দিকে একটা নতুন পাড়ায়। পাড়াটা সবে তৈরি হচ্ছে। মাঠের মধ্যে উঠছে নতুন বাড়ি। মাঠগুলো ঝোপঝাড়ে ভরা। খুব বড়ো বড়ো ইঁদুর আছে সেই সব মাঠে। এক-একটা ইঁদুরের অন্তত দু-কিলো তিন কিলো ওজন হবে।

কাশীতে বড্ড ফেরিওয়ালার উৎপাত। সারা দিনে কতরকম ফেরিওয়ালা যে আসে, তার ঠিক নেই। কাচের চুড়ি, ছাগলের দুধ, লুধিয়ানার কম্বল, পুরোনো ঘি, কাঠের পুতুল, আচার এসব নানারকম জিনিস বিক্রি করতে ফেরিওয়ালা আসে। এ ছাড়া বাঁদরের নাচ, ভাল্লুকের নাচ দেখাবার লোক আসে।

একদিন এল একটি মেয়ে সাপুড়ে। এর আগে আমি কখনো মেয়ে সাপুড়ে দেখিনি। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মাঝবয়সি একজন মেয়ে, সঙ্গে গেরুয়া রঙের কাপড়ে মোড়া তিনটে সাপ ভরতি ঝোলা, আর সেই মাঝখানটা বেলুনের মতন ফোলানো বাঁশি। সেই বাঁশি সে অনেকক্ষণ ধরে বাজাল আমাদের বাড়ির সামনে। তারপর বলল, 'সাপ খেলা দেখবে গো! এই বাঙালি মাইজি!'

আমরা যে বাঙালি, সে-কথা কী করে বুঝল কে জানে! বোধ হয় চিংড়ি মাছ রান্নার গন্ধ পেয়েছিল।

ছোটোমাসি বারান্দায় বেরিয়ে এসে মুখঝামটা দিয়ে বললেন, 'না, দেখব না। পরশুই তো একজন সাপুড়ে এসে খেলা দেখিয়ে গেল। আমরা কি রোজ বাঁদরের নাচ, ভাল্লুকের নাচ, আর সাপের নাচ দেখব নাকি।'

মেয়ে সাপুড়েটি অনেক কাকুতিমিনতি করল, কিন্তু মন গলল না ছোটোমাসির।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তখন সাপুড়ানি বলল, 'বড়ো পিয়াস লেগেছে, এক বর্তন পানি দেবে মাইজি?'

কেউ জল চাইলে না বলা যায় না! ছোটোমাসি জল আনতে গেলেন আর সাপুড়ানিটি তার ঝাঁপিগুলো নামিয়ে আমাদের বারান্দায় এসে বসল।

ছোটোমাসি এক জগ জল এনে দিলেন। সাপুড়ানি জগটা মুখের কাছে উঁচু করে ঢক ঢক করে প্রায় অর্ধেকটা জল খেয়ে নিল। তারপর ঝাঁপিগুলোর মুখ খুলে সাপগুলোর গায়ে ছিটিয়ে দিল খানিকটা। অমনি একটা হলদে-কালো ডোরাকাটা সরু সাপ সুড়ুত করে বেরিয়ে এসে মেঝের ওপর কিলবিল করতে লাগল। ছোটোমাসি ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'শিগগির ওকে বিদায় করো।'

সত্যি কথা বলতে কী, অত কাছে একটা সাপ দেখে আমারও একটু একটু ভয় করছিল। একমাত্র ভয় পেল না ছোটোমাসির দেড় বছরের ছেলে বাবলু। সে খলখল করে হেসে বলতে লাগল, 'সাপ ধরব!' 'সাপ ধরব!'

বাজারের মাছওয়ালারা যেমনভাবে সিঙিমাছ ধরে, সাপুড়ানি সেইরকম অবহেলার সঙ্গে সাপটার মাথা চেপে সেটাকে আবার ঝাঁপিতে ভরে দিল। তারপর উটেরা যেমনভাবে গন্ধ শোঁকে সেইরকমভাবে ঠোঁট আর নাক কুঁচকে রেখে বলল, 'মাইজি তুমহার কোঠির পাশে সাঁপ আছে, পাঁচঠো রুপিয়া দো, সাঁপ ধরে দেব।'

ছোটোমাসি খিলখিল করে হেসে উঠলেন। আমিও হাসলাম। এ বাড়ির চাকর শুকদেও হাসল। কারণ, ঠিক দু-দিন আগেই আমাদের উলটোদিকের বাড়িতে সাপ খেলা দেখাতে এসে একজন সাপুড়ে ঠিক এই কথা বলেছিল। আর মাত্র দু-টাকা নিয়ে সে বাড়ির সিঁড়ির তলা থেকে দুটো সাপ ধরে দিয়েছিল। সব সাপুড়েরা মনুমেন্টের মাথা থেকেও যখন-তখন সাপ ধরে দিতে পারে। উলটো দিকের বারান্দা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখেছিলাম, সাপুড়েটার আলখাল্লার নীচে কোমরে জড়ানো ছিল দুটো সাপ, সেই দুটোই খুব কায়দা করে বার করলে, ম্যাজিশিয়ানরা যেভাবে টুপির ভেতর থেকে খরগোশ বার করে।

আমাদের সকলের একসঙ্গে হাসি শুনে সাপুড়ানিটি একটু ঘাবড়ে গেল বোধ হয়। আর বেশি উচ্চবাচ্য করল না। ঝাঁপিগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। ছোটোমাসি বারান্দাটা ফিনাইল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেললেন।

খানিকটা দূরে বেশ কিছুক্ষণ পেট-ফোলানো বাঁশিটার আওয়াজ শোনা গেল। বোধ হয় সাপুড়ানি আর কোনো বাড়িতে খেলা দেখাবার সুযোগ পেয়েছে।

পরের রবিবারে ছোটোমেসো আমাদের সারনাথ ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। তারপর ছোটোমাসির শোবার ঘরে বসে আমরা চা খাচ্ছি, রেকর্ড প্লেয়ারে ওস্তাদ গুলাম আলি

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

খাঁর গান বাজছে, এমন সময় হঠাৎ আলো নিবে গেল, আর গুলাম আলির গলাটা বিশ্রী মোটা হয়ে থেমে গেল।

আমরা কলকাতার ছেলেরা যখন তখন আলো নিবে গেলে অবাক হই না। ছোটোমাসি বললেন, 'দূর ছাই!' ছোটোমেসো বললেন, 'এই শুরু হল জ্বালাতন।'

কারুরই অবশ্য মোমবাতি খোঁজবার উৎসাহ হল না। সেদিন পাতলা জ্যোৎস্না ছিল। জানলা দিয়ে তার একটু আলো এসে পড়েছে। আমরা সেই আবছা অন্ধকারেই বসে বসে চা খেতে লাগলাম। অন্ধকারে আর যাই অন্য অসুবিধে হোক, খাবার খেতে কোনো অসুবিধে হয় না। হাতের বিস্কুটটা ঠিক মুখেই চলে আসে, সেটা আমরা ভুল করে কানে গুঁজে দিই না।

তিন জনে মিলে নানানরকম গল্প করছিলাম। একসময় আমার চোখে পড়ল মেঝেতে কী যেন চকচক করছে। মনে হল খানিকটা জল পড়ে আছে, তার ওপর এসে পড়েছে চাঁদের আলো। এখানে জল এল কী করে? তারপর মনে হল, জলটা যেন নড়ছে। তারপর আর কিছুই মনে হল না, আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'সাপ!'

আমি ছোটোমাসিকে ভয় দেখাবার জন্য অনেক সময় মিছিমিছি বলি, 'ছোটোমাসি, তোমার পায়ের কাছে একটা আরশোলা।' ছোটোমাসি সেরকমই কিছু একটা ভেবে চেয়ারেই বসে রইলেন। ছোটোমেসো স্প্রিংয়ের মতন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাপ? কোথায়?'

'ওই যে সামনেই।'

এ-কথা বলেই আমি ছোটোমাসির হাত ধরে ঝটকা টান মেরে ছুটলাম। আমি আর ছোটোমাসি চলে এলাম বসবার ঘরে। আর শোবার ঘরের পেছনে একটা ছোটো ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ছোটোমেসো। দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা। ততক্ষণে আমরা সাপটার দু-বার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ পেয়েছি।

দারুণ ভয় পেয়ে ছোটোমাসি ধপাস করে সোফার ওপর বসে পড়তে যাচ্ছিলেন, বোধ হয় অজ্ঞান হয়েই যেতেন, কিন্তু তক্ষুণি আবার উঠে চিৎকার করে বললেন, 'বাবলু! বাবলু রয়েছে যে ঘরের মধ্যে!'

সত্যিই তো। সারনাথ থেকে ফেরবার পথেই বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে কোলে করে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল খাটে। বাবলু তো সেখানেই ঘুমিয়ে রয়েছে।

এরপর দেখবার, ছোটোমাসি আর ছোটোমেসোর একদম উলটো ব্যবহার। দারুণ সাহসী ছোটোমেসো ঘরের দরজা আর খুললেনই না, ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'কী হল? সাপটা গেছে? কত বড়ো সাপ?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর যে ছোটোমাসি আরশোলা দেখলেই মূর্ছা যান, তিনি তক্ষুণি ছুটে আবার সেই সাপের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। আমি ছোটোমাসির হাত চেপে ধরলাম। বিছানার ওপর ঘুমিয়ে থাকা বাবলুকে হয়তো না কামড়াতেও পারে, কিন্তু ছোটোমাসি ঘরের মধ্যে ঢুকলে নির্ঘাত কামড়াবে।

আমাদের চিৎকার শুনে শুকদেও ছুটে এল আর চট করে একটা টর্চ জোগাড় করে ফেলল। টর্চের আলোটা যাতে সে সাপটার মুখের ওপর না ফেলে তাই আমি টর্চটা হাত থেকে নিয়ে নিলাম। যতদূর জানি সাপ কানে শুনতে পায় না—তাই আমাদের চিৎকার সে গ্রাহ্য করতে নাও পারে, কিন্তু চোখে আলো ফেললে নিশ্চয়ই রেগে যাবে। আলোটা একটু তেরছাভাবে ফেলে দেখলাম, সাপটা একটা বিরাট ফণা তুলে লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এদিক-ওদিক মুখ ঘোরাচ্ছে। সাপটা অন্তত চার হাত লম্বা, মাঝে মাঝে জিভ বার করছে চিরিক চিরিক করে। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

ছোটোমাসি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সুনীল, শিগগির সাপটাকে মার।'

কিন্তু বললেই কী আর অতবড়ো সাপটাকে মারা যায়? কাছে এগোলেই যদি লাফিয়ে এসে কামড়ায়? সত্যি কথা বলতে কী, ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। আমি বাঘ, ভাল্লুক, ভূতের চেয়ে সাপকে বেশি ভয় পাই। তবু ঘরের মধ্যে বাবলু রয়েছে, একটা কিছু করতেই হবে।

আমি বললাম, 'শুকদেও, লাঠি কোথায়, লাঠি?'

শুকদেও দৌড়ে গিয়ে একটা ডাণ্ডা নিয়ে এল।

সাপটা কী করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জানি না। কিন্তু এখন সে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মনে হয়। সাপেরা সিমেন্টের মেঝে পছন্দ করে না। ফণা তোলা অবস্থায় একটুখানি চলতে গিয়েই চটাং চটাং করে পড়ে যাচ্ছে। তাতে রেগে উঠে আরও বড়ো ফণা তুলছে।

সাপটাকে তক্ষুনি মারবার বদলে ওটা যদি কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত তাহলে আমরা বাঁচতুম। কিন্তু সাপটা একটা উলটো কাজ করল। সেটা আমাদের দিকেই খানিকটা এসে একটা দরজার পাশে লুকিয়ে পড়ল। চৌকাঠের সঙ্গে লেগে থাকা তার খানিকটা লেজ তখনও দেখতে পাচ্ছি। সর্বনাশ! এবার তো আমরা ঘরেও ঢুকতে পারব না। বাবলু যদি ঘুম ভেঙে হঠাৎ খাট থেকে নেমে আসে।

ওপাশের বন্ধ ঘর থেকে ছোটোমেসো আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল, সাপটা গেছে?'

ছোটোমাসি বললেন, 'না! তুমি বেরিয়ো না একদম।'

ছোটোমাসি তারপর আরও সব অসীম সাহসিক কাজ করতে লাগলেন। রান্নাঘর থেকে কেরোসিনের টিনটা এনে প্রায় দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত অনেকখানি কেরোসিন ছিটিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে। তারপর একগাদা খবরের কাগজ পাকিয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে রান্নাঘরের উনুনে ছুঁইয়ে আগুন জ্বেলে আনলেন। তারপর সেই খবরের কাগজের মশালটা ছুড়ে দিলেন সাপটার গায়ে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আগুন লাগতেই সাপটা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে আবার ফণা তুলল আর সেই আগুনে ঘরের মধ্যে কেরোসিনও জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

ছোটোমাসির উপস্থিত বুদ্ধি সাংঘাতিক বলতে হবে। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে বলে সাপটা আর ঘরের মধ্যে গেল না। চৌকাঠের সামনে কিলবিল করতে লাগল।

এই সময় হট্টগোল বাবলু জেগে উঠল। ডেকে উঠল, 'মা—'

ছোটোমাসি প্রায় পাগলের মতন হয়ে গিয়ে কেঁদে চিৎকার করে বললেন, 'বাবলু, বাবলু খাট থেকে নামিস না—'

ঠিক সেই সময় শুকদেও সাপটার গায়ে একটা ডাণ্ডা কষাল।

কিন্তু লাঠি দিয়ে সাপ মারা খুব সোজা কথা নয়। মারটা খেয়ে সাপটার বিশেষ কিছু হল না, সে চৌকাঠ ছাড়িয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। সাপ দারুণ জোরে ছুটতে পারে এক-এক সময়, কিংবা লাফাতেও পারে। সেই মুহূর্তে সাপটা আমাদের একজনকে ছোবল মারতে পারত। কিন্তু শুকদেও তক্ষুনি ডাণ্ডা দিয়ে সাপটাকে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল।

তখন দেখলাম শুকদেওর কী দারুণ সাহস আর গায়ের জোর। সিমেন্টের মেঝেতে একটা সাপকে চেপে ধরে থাকা কী সোজা কথা? সাপের গাটাই তো তেলতেলে!

আমি এক লাফে তিন পা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। আবার এগিয়ে এলাম। সাপটা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ভীষণভাবে ছটফট করছে। শূকদেও চেপে ধরে আছে ঘাড়ের কাছটা। আর সাপটার লেজটা একটা চাবুকের মতন ছটাস ছটাস করে পড়ছে মেঝেতে। এক-একবার চেষ্টা করছে লাঠিটাকে পাকিয়ে ধরবার জন্য।

শুকদেও চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদাবাবু, আভি উসকো মারিয়ে।'

দেখলাম শুকদেওর মুখে ঘাম জমে গেছে, দাঁতে দাঁত চেপে আছে। সাপটার নিশ্চয়ই খুব গায়ের জোর। শুকদেও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। ছোটোমাসি সবটা কেরোসিন ছড়িয়ে দিলেন মেঝেতে, আবার কাগজ জ্বেলে ছুড়ে দিলেন সেখানে। এখন সাপটার সব দিকেই আগুন তবু কিন্তু মরছে না সহজে, ছটফট করে যাচ্ছে সমানে।

আমি কী দিয়ে সাপটাকে মারব? হাতের কাছে কোনো জিনিস নেই। একটা চেয়ার ছুড়ে মারলে কী কোনো লাভ হবে। কিছুই ঠিক করতে পারছি না। যদি শুকদেওর হাত পিছলে যায়, যদি সাপটা আগুন পেরিয়ে আসে!

ছোটোমাসি বললেন, 'সুনীল, শিল-নোড়াটা নিয়ে আয়—'

কিন্তু তার আগেই সাপটা শুকদেওর লাঠির তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে এল। তারপর আগুনের শিখা ছাড়িয়ে ফণাটা তুলে আমাদের দিকে তাকাল। শুকদেও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের গতিতে ডাণ্ডাটা দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মারল সেই ফণাটার ওপর। তাতেই ফণা ছাতু হয়ে গেল, সাপটা নেতিয়ে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পড়ল আগুনের ওপর। শুকদেও তখনও দমাদম করে পেটাতে লাগল এক জায়গায়। সাপটা আর নড়ল না।

ছোটোমাসি আগুন ডিঙিয়ে গিয়ে বাবলুকে কোলে তুলে নিলেন।

আমি আর শুকদেও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম মাটিতে। সারা ঘরে সাপ পোড়ার বিশ্রী গন্ধ। বমি এসে যাচ্ছে প্রায়। শুকদেও আবার আগুন থেকে লাঠি দিয়ে বার করে আনল সাপটাকে। আগুনে ঝলসে সাপটা যেন হঠাৎ মোটা হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে বেরোলেন ছোটোমেসো। তিনি সাপটাকে দেখে বললেন, 'বাবা, এত বড়ো সাপ? সাপকে বিশ্বাস নেই, ওরা অনেক সময় মটকা মেরে থাকে।'

তিনি শুকদেওর হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে সেই মরা সাপকেই মারলেন কয়েক ঘা। ছোটোমাসি বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে! এবার ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসো।'

ছোটোমেসো বললেন, 'রাস্তায় ফেলবে কী? বৃষ্টির জল লাগলে সাপ আবার বেঁচে যায়।'

সে আর কী করা যাবে, শুকদেও আর আমি গিয়ে অনেকটা দূরে সাপটাকে ফেলে দিলাম মাঠের মধ্যে। নিশ্চিত হবার জন্য দুটো থান ইট দিয়ে আরও কয়েকবার ঠুকে দিলাম ওর মাথা। না:, সাপটা মরে গেছে নিশ্চিত।

সেদিন আর সারারাত প্রায় ঘুমই হল না বলতে গেলে। ছোটোমাসির ধারণা হল সাপটার বিষ নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে পড়েছে। দুটো ঘরে একবার ফিনাইল একবার ডেটল ছড়িয়ে খুব করে ধোয়া-মোছা হল। তারপর বহুক্ষণ জেগে আমরা অনবরত ওই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। সত্যি, খুব জোর একটা ফাঁড়া গেছে। ছোটোমাসি বার বার ছোটোমেসোকে ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন, 'তুমি কী দরের বীরপুরুষ বোঝা গেছে! আমরা তিন জন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাপটা মারলাম। আর তুমি দরজা বন্ধ করে বসে রইলে।'

ছোটোমেসো বললেন, 'আহা, তোমরাই তো আমাকে বেরোতে বারণ করলে।'

ছোটোমাসি বললেন, 'থাক থাক। সব বোঝা হয়ে গেছে। তোমার তখন গলা কাঁপছিল। এ বাড়িতে আর থাকব না। তুমি অন্য বাড়ি খোঁজো।'

সাপটা মারার ব্যাপারে আমি যদিও বিশেষ কিছুই করিনি, তবু ছোটোমাসি যে আমাকে কৃতিত্বের খানিকটা ভাগ দিলেন, তাতে আমি খুশিই হলাম।

পরদিন সকালে উঠে দেখে এলাম যে, মাঠের মধ্যে মরা সাপটা একই জায়গায় পড়ে আছে, বেঁচে উঠে পালায়নি।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। আমাদের সাপ মারার কাহিনিটি পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। অনেকে এ পাড়ায় সাপের কথা শুনে দারুণ অবাক হল। অনেকে আমাদের সাহসের

https://boierhut.com/fb

প্রশংসা করল, আর অনেকে আমাদের ভয়ও দেখাল খুব। প্রত্যেক সাপেরই একটা করে জুটি থাকে। একটাকে মারলে অন্যটা এসে প্রতিশোধ নেয়।

এরকম একটা কথা আমরা শুনে আসছি বটে, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। আমরা তো মরা সাপটা ফেলে এসেছি বেশ খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে। ওই সাপটার যদি একটা জুটি থাকেও তবু সে বাড়ি খুঁজে খুঁজে আসতে পারবে? সাপের কী এত বুদ্ধি থাকে? সাপের বুদ্ধির তো তেমন গল্প শুনিনি, বরং সাপ সম্পর্কে এমন অনেক কিছু শোনা যায়, যেগুলি আসলে বাজে কথা। যেমন লোকে বলে দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা! কিন্তু সাপ আসলে দুধ খায় না, কলাও খায় না।

তবু উলটো দিকের বাড়ির দারোয়ান বলল, 'খুব সাবধান বাবুজি। আমাদের গাঁওতে এই জন্য কেউ সাপ মারে না। একটা সাপকে মারলেই অন্য সাপ এসে বদলা নিয়ে যায়। আমার এক চাচাতো ভাইকে সাপে কেটেছিল...'

আমরা তার কথা অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিলাম। তবু ভিতরে ভিতরে একটু ভয় রয়ে গেল। ভয় খানিকটা একবার মনের মধ্যে ঢুকলে আর সহজে যায় না। আমরা বলতে গেলে প্রায়ই খাটের তলা কিংবা ঘরের কোণগুলি খুঁজে দেখি ভালো করে। সন্ধ্যের পর সব জানলা বন্ধ থাকে।

এদিকে ছোটোমাসি পরদিন সবজিমণ্ডি থেকে ঘুরে এসে চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'ত্রিবেদীজির বউ কী বলল জানিস? আমার মুখে সাপ মারার কথা শুনে বললেন, মরা সাপের লেজ দিয়ে নাকি তীব্র গন্ধ বেরোয়। অন্য সাপ সেই গন্ধ শুঁকে বোঝে কোন জায়গায় ওই সাপটাকে মারা হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'কোনো বইতে তো এরকম কথা লেখা নেই!'

ছোটোমাসি ঝংকার দিয়ে বললেন, 'যারা বই লেখে, তারা বুঝি সব জানে। মানুষের থেকে জন্তুজানোয়ারেরা অনেক কিছু বেশি বোঝে। তুই বলতে পারিস, কোথাও ভূমিকম্প হবার দু-দিন আগে সেখানকার মুরগিগুলো বেশি ছটফট করে কেন?

আমি বললাম, 'তা বলে বেনারস শহরে কী সাপ কিলবিল করছে না কি?'

ছোটোমাসি বললেন, 'সেদিন দেখলি তো অত বড়ো সাপটা! একটা থাকলে দুটো থাকতে পারে না? যাইহোক, এ বাড়িতে আর আমি থাকছি না। যদি পারি, কাল-পরশুর মধ্যে উঠে যাব।'

ছোটোমাসি খুব তাড়া দিতে লাগলেন ছোটোমেসোকে বাড়ি খোঁজার জন্য। তিনি অন্তত তিনতলার ফ্ল্যাট চান।

ঠিক চার দিনের দিন সত্যিই এল দ্বিতীয় সাপটা। একদম দিনের বেলা। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ছোটোমাসি আর আমি বসে গল্প করছি। খাটের ওপর খেলা করতে করতে একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবলু। একটু বাদেই ছোটোমাসির চোখে ঘুম চলে আসবে, তখন আমি আমার ঘরে চলে যাব বই পড়তে, তার আগেই দেখতে পেলাম সাপটাকে। ঘরের বাইরের দেওয়ালের পাশে যে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হাসনুহানা গাছটা রয়েছে, সেটা থেকে একটা সাপ জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াল। একদম আমাদের চোখের সামনে!

ছোটোমাসি আর আমি এত অবাক হয়ে গেছি যে, প্রথমে একটাও কথা বলতে পারলাম না। সাপটা জানলার শিকে লেজ পাকিয়ে দু-এক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে চেয়ে রইল, তারপর দেওয়াল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পারল না, ছপাৎ করে পড়ে গেল ঘরের মধ্যে।

'ওরে বাবা,' বলেই ছোটোমাসি আর আমি এক দৌড়ে পালালাম। তারপরই আবার দুজনে ফিরে এলাম দরজার কাছে! ঠিক আগের দিনের মতন অবস্থা। ঘরের মধ্যে সাপ, খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে বাবলু। সাপটাও ঠিক একরকম, হাত-চারেক লম্বা, মাথার উপরে একটা পায়ের ছাপের মতন।

আজ ছোটোমেসো বাড়িতে নেই, শুকদেও একটু আগে বেরিয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সে একটু ঘুরে আসতে যায় রোজ।

একইরকম বিপদ থেকে কী পরপর দু-বার বাঁচা যায়! ছোটোমাসি সেদিনকার মতন আর সাহস দেখাতে পারলেন না, একেবারে যেন ভেঙে পড়লেন। 'ওরে বাবা গো!' 'ওরে বাবা গো!' হাঁপাতে হাঁপাতে আর কাঁদতে কাঁদতে এই কথাই বলতে লাগলেন বার বার! আমি ছোটোমাসিকেই শক্ত করে ধরে আছি—হঠাৎ ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেই সাংঘাতিক কান্ড হবে।

সাপটা খাটের একটা পায়ার সঙ্গে লেজ জড়িয়ে মাথাটা ঘোরাচ্ছে এদিক-ওদিক। মাঝে মাঝে ফণাটা সামান্য উঁচু করে আমাদের দেখছে। ওকে দেখেই আমার গা যে কাঁপছে। শুনেছিলাম মানুষ যেমন সাপকে ভয় পায়, তেমনি সাপও ভয় পায় মানুষকে। সহজে মানুষের কাছে আসে না। কিন্তু এই সাপটার একটুও ভয় পাবার লক্ষণ নেই! ঠিক যেন খেলা করছে।

মেল ট্রেনের চেয়েও তাড়াতাড়ি চিন্তা করে যাচ্ছি, কী করে সাপটাকে মারব। সেদিনকার মতন কেরোসিন ছড়িয়ে পুড়িয়ে মারার উপায় নেই। সাপটা ইচ্ছে করলেই খাটের নীচে লুকোতে পারে। শুকদেওর মতন ডাণ্ডা হাতে নিয়ে ওর কাছে যেতেও সাহস পাচ্ছি না। যদি একবার ফসকায়? তারই মধ্যে একবার ভেবে নিলাম, সাপটা যখন প্রতিশোধ নিতে এসেছে তখন কাকে কামড়াবে? ছোটোমাসিকে না শুকদেওকে? আমাকে কামড়ানো উচিত নয়। কারণ আমি তো আগের সাপটাকে মারিনি। পরের মুহূর্তেই ভাবলুম, ছি:, আমি কী স্বার্থপর!

ছোটোমাসির চিৎকারে বাবলু জেগে গিয়ে খাটের ওপর উঠে বসল। আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, 'বাবলু, নামিসনি। সাপ! সাপ! নামিসনি!'

বাবলু বলল, 'কোথায় সাপ?'

'খাটের নীচে! নড়িস না, একটুও নড়িস না।'

বাবলু খাটের পাশে ঝুঁকে সাপটাকে দেখল। সাপটাও দেখল বাবলুকে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সাপটা এত বড়ো যে অনায়াসেই অতটা ফণা উঁচু করে ছোবল মারতে পারত বাবলুকে। আমরা শিউরে উঠে বললাম, 'সরে যা বাবলু, সরে যা!'

বাবলু ওইটুকুনি ছোটো ছেলে, সে চেঁচানিতে ঘাবড়ে গেল। প্রথমে সে কেঁদে উঠল 'অ্যাঁ-অ্যাঁ' করে! তারপর হঠাৎ পা ঝুলিয়ে খাট থেকে নেমে পড়তে গেল।

চরম বিপদের সময় মানুষের মাথায় ঠিক একটা বুদ্ধি এসে যায়। আমি এতক্ষণ যা ভাবিনি তাই করে ফেললাম। ছোটোমাসিকে পেছন দিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলাম। একটানে আমার গা থেকে জামাটা খুলে ছুড়ে দিলাম সাপটার দিকে। সাপটা রাগ করে জামাটার ওপরে ছোবল মারতে গিয়ে তার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেল। তার রাগী ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যেতে লাগল শুধু। আমি এক হাতে বাবলুকে ধরে ফেলে চেঁচিয়ে বললাম, 'ছোটোমাসি, লাঠি আনো! শিগগির, লাঠিটা—'

কিন্তু আনতে হল না। তক্ষুনি রাস্তায় শুনতে পেলাম প্যাঁ প্যাঁ বাঁশির আওয়াজ। সাপ খেলানো বাঁশি। আমি এবার আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, 'ছোটোমাসি'—তার আগেই ছোটোমাসি ছুটে গেলেন রাস্তার দিকে।

সেই মেয়ে সাপুড়ানিটি আসছিল। ছোটোমাসি গিয়ে তার হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলেন, 'শিগগির আও, কামরামে একঠো সাপ...তুম পাকড়ো, তুমকো দশ টাকা বিশ টাকা দেগা'...

কাঁধের ঝাঁপি নামিয়ে ছুটে এল সাপুড়ানি। জামাটার কাছে গিয়ে বসে পড়ে বাজাতে লাগল তার বাঁশিটা। একটু বাদেই জামার ভেতর থেকে ফস করে যেই সাপটা ফণা উঁচু করল অমনি সাপুড়ানিটি দারুণ রেগে গিয়ে বলল, 'আরে কালুয়া!'

সাপুড়ানিটি বাঁশিটি ডানদিকে বাঁদিকে নাড়তে লাগল আর সাপটাও মাথা দোলাতে লাগল সেই সঙ্গে। তারপর সে এক ফাঁকে ঝপ করে ধরে ফেলল সাপটার মাথা। বকুনি দিয়ে বলল, 'আরে কালুয়া। বদমাশকা বাচ্চা।'

আমরা অবাক।

সাপুড়ানিটি সাপটাকে ধরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কালসে হামি ঢুঁড়ছি এই সাপটাকে। বদমাশটা যে কখন ভেগে গেল।'

ছোটোমাসি বললেন, 'অ্যাঁ?'

বাবলুও কান্না থামিয়ে চোখ গোল করে তাকাল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...জামাটার কাছে গিয়ে বসে পড়ে বাজাতে লাগল তাঁর বাঁশিটা...

সাপুড়ানিটি একগাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ মাইজি, কাল এই রাস্তার উধারে এক কোঠিতে খেলা দেখালাম, তার মধ্যে কখন এই বদমাশটা ভেগে গেল।'

সাপুড়ানিটি এইমাত্র উপকার করল, সেটা ভুলে গিয়ে দারুণ রেগে গেলেন ছোটোমাসি, চোখ পাকিয়ে বললেন, 'অ্যাঁ? তুই সাপ ছেড়ে দিয়েছিস এ পাড়ায়? আর একটু হলে আমার ছেলেকে কামড়াত। তোকে আমি পুলিশে দেব।'

সাপুড়ানিটি বলল, 'ইসকো তো বিষ নেই আছে! এই দেখিয়ে না।'

সে একটা হাতে মুঠো পাকিয়ে সাপটার মুখে মারতে লাগল বারবার। সাপটা কামড়াল না, মুখটা ফিরিয়ে নিতে লাগল। শুধু তাই-ই নয়, বাইরে এসে সাপুড়ানিটি সাপটাকে মাটিতে ছেড়ে দিতেই সে সরসরিয়ে ঢুকে গেল একটা ঝাঁপির মধ্যে। তখন আর সন্দেহ রইল না যে সেটা সত্যিই পোষা সাপ।

ছোটোমাসি তবু বললেন, 'তোকে এক পয়সাও বখশিশ দেব না। তোর সাপ কেন আমার ঘরে ঢুকবে? আর একটু হলে আমি হার্টফেল করেছিলাম। উঃ, এখনও বুক ধড়াস ধড়াস করছে।'

কিন্তু আমার একটা খটকা লাগল। একই রকম সাপ কয়েক দিনের মধ্যে ওই একই ঘরে ঢুকে পড়ল? দ্বিতীয়টা তাহলে প্রতিশোধ নিতে আসেনি? আমি সাপুড়ানিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ক-টা সাপ পালিয়ে গিয়েছিল?'

সে অবাক হয়ে বলল, 'কাঁহে বাবু? এই একঠো।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি বললাম, 'তোমার দুটো সাপ হারায়নি? ঠিক বলছ? তাহলে কয়েক দিন আগে আমাদের বাড়িতে আর একটা সাপ এসেছিল কী করে, ঠিক এইরকম সাপ?'

সাপুড়ানিটি চোখ কপালে তুলে বলল যে, সে কথা তো সে জানে না! সে কসম খেয়ে বলছে, তার এই একটা মাত্র সাপই হারিয়েছিল। তাও কাল সন্ধেবেলা। চার দিন আগে তো সে বেনারসে ছিলই না। সে চলে গিয়েছিল রামনগর। তা ছাড়া এরকম আর একটা সাপ আসবে কী করে—এ তো পাহাড়ি জাতের সাপ, এ তো এখানে পাওয়া যাবে না। তাকে যতই বলি যে ঠিক ওইরকম একটা সাপ আমরা সত্যিই মেরেছি, সে অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা দোলায়। এর মধ্যে শুকদেও এসে পড়েছে। আমি বললাম, 'শুকদেও, মাঠের মধ্যে ওকে সেই মরা সাপটা দেখিয়ে দাও তো।'

শুকদেও সাপুড়ানিকে নিয়ে গেল মাঠের মধ্যে। সাপটা সেখানে নেই। না থাকতেই পারে, চার দিন কেটে গেছে, এর মধ্যে কাক, চিল, শকুনি খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাপুড়ানিটি হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগল। আমরা মাত্র পাঁচ টাকা বখশিশ দিয়ে বিদায় করে দিলাম।

ব্যাপারটা একটু রহস্যময় রয়ে গেল।

সন্ধেবেলা ছোটোমেসো বাড়ি ফেরার পর সবিস্তারে সব বলা হল তাঁকে। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে চান না। পরপর দুটো সাপ এক ঘরে? যাক, তিনি নতুন বাড়ি দেখে এসেছেন, সামনের রবিবারই সেখানে চলে যাওয়া হবে।

ছোটোমাসি বললেন, 'দুপুরে তখন কেউ ছিল না। তবু ভাগ্যিস সুনীলটা ছিল, ওই তো সাহস করে জামাটা ছুড়ে দিয়েছিল, নইলে কী যে হত? আমার তো মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে।'

ছোটোমেসো হেসে বললেন, 'হুঁ, একে তো পোষা সাপ, তার ওপর বিষ নেই—তার সামনে যাওয়া এমন কী? আমি থাকলে ওটাকে খপ করে ধরে ফেলতাম।'

ছোটোমাসি বললেন, 'তখন কী আমরা জানতাম যে ওটার বিষ নেই কিংবা পোষা।'

ছোটোমেসো বললেন, 'ও দেখলেই বোঝা যায়। তোমরা তো সাপ চেনো না, আমি চিনি, জীবনে কত সাপ দেখেছি!'

কিছু না বুঝে বাবলু হাসতে লাগল!

https://boierhut.com/fb

তারপর বাঘটা আমার বুকের ওপর দুটো থাবা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার মুখের ঠিক সামনেই বাঘের বিশাল মুখখানা, রয়াল গুলির মতন চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে...

আমি যদি এরকম লিখি, কেউ বিশ্বাস করবে? সবাই বলবে, ধুত, গাঁজাখুরি গল্প। কিংবা যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি বেঁচে আছ কী করে? বাঘ তোমার বুকের ওপর থাবা তুলে দাঁড়াল, অথচ তোমাকে কামড়াল না, এ আবার হয় নাকি? সেই বাঘটা কী মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য?

কিন্তু এটা গল্পও নয়, মিথ্যে কথাও নয়। খাঁটি সত্যি। এবং আমি যে বেঁচে আছি, সে-কথাও ঠিক। ভূত হয়ে তো আর এসব লিখছি না। আমার গায়ে চিমটি কাটলে ব্যথা লাগে, হোঁচট খেলে উঃ করি, খুব অন্ধকারের মধ্যে বেশিক্ষণ একা থাকলে গা ছমছম করে, সুতরাং আমি মানুষ হয়েই বেঁচে আছি।

খাঁচার বাঘ কিংবা সার্কাসের বাঘ নয়, আমি বেশ কয়েকবার জঙ্গলের বাঘ দেখেছি। সুন্দরবনে, উত্তরবঙ্গের গোরুমারা ফরেস্টে, মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায়। আফ্রিকায় দেখেছি সিংহ আর গন্ডার, সেখানে বাঘ নেই। অবশ্য সবই দেখেছি কিছুটা দূর থেকে। শুধু একবারই বাঘ এসেছিল খুব কাছাকাছি, একেবারে আমার বুকের ওপর থাবা তুলে দিয়েছিল। আমি আমার গল্পের কাকাবাবুর মতন শক্তিশালী বা ভাগ্যবানও নই, তবু বেঁচে গেলাম কী করে?

তাহলে গোড়া থেকে সব খুলে বলতে হয়।

আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে প্রায় এখানে-সেখানে বেড়াতে যাই। আগে থেকে কিছু ঠিক থাকে না, হঠাৎ ঝোঁক উঠল আর বেরিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে যেন জঙ্গল কিংবা পাহাড় আমাকে ডাকে। শহরের এত ভিড় আর ধুলো-ধোঁয়া আর কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে হঠাৎ এক-এক সময় চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। ঘন বনের মধ্যে তরতরিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা চঞ্চলা নদী, বড়ো পাথরের চাঁই, অসংখ্য প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে... সেই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মনে হয় এক্ষুনি ওরকম জায়গায় ছুটে যেতে হবে।

সেবারে আমরা গিয়েছিলাম ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রাম বেশ সুন্দর জায়গা, তবে এমন কিছু দূর নয়। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে বসে আড্ডা দিতে দিতে ঠিক হল, সিমলিপাল জঙ্গলে ঘুরে এলে বেশ হয়।

একটা গাড়ি জোগাড় করে বেরিয়ে পড়া হল। সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং একজন বড়ো সরকারি অফিসার ও কবি পার্থসারথি চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন। আমাদের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যাওয়ার সময় কোনো তাড়াহুড়ো থাকে না, রাস্তার ধারে কোনো আকর্ষক জায়গা দেখলে নেমে পড়ি। হোটেল-রেস্তরাঁয় না খেয়ে, কিছু খাবারদাবার কিনে নিয়ে কোনো জঙ্গলে ঢুকে পিকনিক করি। সেবারে আদিবাসীদের একটা চমৎকার হাটে আমরা অনেক সময় কাটালাম।

সন্ধের একটু পরে আমরা পৌঁছলাম যোশিপুর ডাকবাংলোয়। এই বাংলোটা পাহাড়ের নীচের দিকে, এরপর থেকেই জঙ্গলের শুরু।

আমার যে-গাড়িতে এসেছি, সে-গাড়িটা পাহাড়ে ওঠার পক্ষে খুব সুবিধের নয়। যোশিপুর বাংলোতে জিপগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের গাড়িটা ওখানে রেখে জিপ নিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে। আমরা ঠিক করলাম, রাত্তিরটা ওই বাংলোয় কাটিয়ে খুব ভোর-ভোর যাত্রা করব পাহাড়ের দিকে। ভোরের সময় জঙ্গলের পথে অনেক হরিণ, হাতি, এমনকী বাঘও দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

যোশিপুর বাংলোটি বেশ সুন্দর। গেট দিয়ে ঢোকার পর অনেকখানি বাগান মতন, তারপর বাংলো বাড়িটির সামনের দিকে একটা বেশ বড়ো গোলমতন ঢাকা বারান্দা, সেখানে একসঙ্গে অনেক লোক বসতে পারে। ওখানকার জেলার ফরেস্ট অফিসার, যাঁদের বলে ডি এফ ও, তাঁর নাম সরোজ চৌধুরী, তিনি এই বাংলোতেই থাকেন।

আমাদের দলের পার্থ চৌধুরী আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওই সরোজবাবুর আগে থেকেই খানিকটা আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি আমাদের খাতির করে বসালেন। আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা হল।

সবেমাত্র চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিয়েছি, এমন সময় একটা বাঘের হুংকার শুনতে পেলাম।

চমকে তাকিয়ে দেখি, বেশ কাছেই, বাগানে একটা বাঘ শুয়ে আছে। ছোটোখাটো বাঘ নয়, মস্ত বড়ো বাঘ, এত বড়ো বাঘ জঙ্গলেও সচরাচর দেখা যায় না।

আমাদের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাঘটা এখানে ঢুকে পড়েছে নাকি?

সরোজবাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না, ও আমার পোষা বাঘ!'

শক্তি চোখ বড়ো-বড়ো করে বলল, 'ওরে বাবা, সেটা এত বড়ো হয়ে গেছে নাকি?'

পার্থ বলল, 'এই বাঘটার কথা আগে শুনেছি, এটা এখানে খোলা থাকে নাকি? খাঁচায় থাকে না?'

এই বাঘটার অনেক ইতিহাস-ভূগোল আছে।

এই অঞ্চলে খৈরি নামে আছে একটা ছোট্ট নদী। সরোজবাবু একদিন বনের পথে যেতে যেতে নদীর ধারে দেখতে পান একটি বাঘের বাচ্চা খেলা করছে একা একা। বাচ্চা বাঘকে ফুটফুটে বেড়ালের মতনই সুন্দর দেখায়। কাছাকাছি মা-বাঘিনী কিংবা বাবা-বাঘ নেই দেখে সরোজবাবু সেই

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে এলেন। তিনি ঠিক করলেন পুষবেন ওই বাচ্চাটাকে। নদীর নামে ওরও নাম দেওয়া হল খৈরি।

কিন্তু বাঘ তো কুকুর-বেড়ালের মতন পোষ মানে না। কুকুরের মতন বাঘের গলায় চেন বেঁধে রাখলে কিছুদিন পরে সে মরে যায়। খাঁচায় বন্দি করে রাখলেও কীরকম করুণ হয়ে যায় তাদের চেহারা। সার্কাসে যেসব বাঘ খেলা দেখায়, তাদের আফিং খাইয়ে-খাইয়ে নির্জীব করে ফেলা হয় আর ইলেকট্রিকের চাবুক মেরে-মেরে খেলা দেখাতে বাধ্য করা হয় তাদের।

সরোজবাবু বাঘটাকে পোষ মানানোর একটা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি খৈরি নামের সেই বাচ্চা বাঘটাকে চেন দিয়ে না বেঁধে কিংবা খাঁচায় বন্দি না করে খোলা রেখে দিলেন। প্রত্যেকদিন তাকে দশ কেজি করে দুধ আর মাংস খাওয়ানো হয়। বনের বাঘকে অনেক পরিশ্রম, অনেক দৌড়োদৌড়ি করে শিকার করে খেতে হয়। আর এই বাঘটা বসে বসে খাচ্ছে, তাই দু-তিন বছরের মধ্যেই সে বিরাট মোটাসোটা আর থলথলে হয়ে গেছে, সেইজন্যই বনের বাঘের চেয়েও তাকে বড়ো দেখায়।

এসব ইতিহাস-ভূগোল শুনেও আমাদের ভয় ভয় করতে লাগল, এত কাছ থেকে একটা বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা তো আমাদের নেই। খুব বড়ো চেহারার কুকুর দেখলেও আমার ভয় হয়, সে পোষা হোক আর যাই হোক!

আমরা চা খেতে খেতে গল্প করছি আর বার বার তাকাচ্ছি বাঘটার দিকে। নীহার নামে একজন মহিলা বাঘটাকে মাংস খাইয়ে দিচ্ছে, আর পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে একজন রক্ষী। বাঘটা মাঝে মাঝে হুঁ-উ-ম, হুঁ-উ-ম শব্দ করছে। মনে হচ্ছে, যেন রোজ রোজ ওই দুধে ডোবানো মাংস খাওয়া তার পছন্দ নয়।

একসময় বাঘটা চলে এল বারান্দায়।

সরোজবাবু বললেন, 'ও মানুষজন খুব ভালোবাসে, ঠিক যেন আড্ডা দিতে চায়!'

বাঘটা মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমাদের সবাইকে দেখল। তার লেজটা একটু একটু নড়ছে। চাপা গ-র-র গ-র-র শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

আমাদের এক বন্ধুর নাম নিমাই, সে বসে ছিল বারান্দাটার দরজার কাছে। বাঘটা কেন যেন নিমাইকে পছন্দ করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নিমাই কাঁপাকাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এ কী, এ কী, আমার কাছে আসছে কেন?'

সরোজবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'ভয় পাবেন না, ভয়ের কিছু নেই!'

যাদের বাড়িতে বিরাট বিরাট পোষা কুকুর থাকে, তারাও এই কথা বলে।

বাঘটা এবার মস্ত বড়ো হাঁ করে নিমাইয়ের একটা কনুই মুখে ভরে ফেলল!

নিমাই আঁ-আঁ করে আর্তনাদ করে উঠল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একসময় বাঘটা চলে এল বারান্দায়।

সরোজবাবু বললেন, 'অত বড়ো চেহারা হলে কী হয়, ও তো আসলে বাচ্চা। তাই খেলা করছে।'

আমার মনে হল, দুধে-ডোবানো মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে বলেই বাঘটা আজ বুঝি টাটকা মাংস খেতে চাইছে। চোয়ালের একটু চাপ দিলেই নিমাইয়ের একখানা হাত শেষ হয়ে যাবে!

নিমাইয়ের মুখখানা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো সব খাড়া। ভয় পেলে মানুষের মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়, এ-কথা আগে শুনেছি। এই প্রথম স্বচক্ষে দেখলাম। সত্যিই, তাহলে এরকম হয়!

বাঘটা শেষপর্যন্ত নিমাইকে কামড়াল না।

ওকে ছেড়ে দিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল সবার সামনে দিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে থামল আমার সামনে। কেন সে আমাকে পছন্দ করল, তা কে জানে!

এরপর সে একটা অদ্ভুত কান্ড করতে লাগল। আমাকে কামড়াল না বটে, কিন্তু মুখটা তুলে আমার এক বগলের কাছে ঢুঁসো মারল দু-বার।

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'এ কী! এ কী!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সরোজবাবু বললেন, 'ও কিচ্ছু হবে না। ও ঘামের গন্ধ ভালোবাসে। আপনারা গরমের মধ্যে খুব ঘেমে এসেছেন তো!'

আমার সারা শরীর দিয়ে তখন গলগল করে আরও ঘাম বেরোচ্ছে। যদিও জানি পোষা বাঘ, তাহলেও ভয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

বাঘটা আর-একবার ঢুঁসো মারতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম!

সরোজবাবু বলে উঠলেন, 'দাঁড়াবেন না, দাঁড়াবেন না, দৌড়বেন না, তাহলে খুব খারাপ হবে।'

কিন্তু ততক্ষণে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি।

আর বাঘটাও দাঁড়িয়ে আমার বুকে দুই থাবা চেপে ধরেছে। আমার ঠিক মুখের সামনে ওর মুখ!

সরোজবাবু বললেন, 'নড়বেন না সুনীলবাবু, আপনি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিন!'

সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। আমি তখন এত ভয় পেয়ে গেছি যে, হাত তোলারও ক্ষমতা নেই। সারা শরীর কাঁপছে। নিমাইয়ের মতন আমারও মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল কি না কে জানে!

একটা কথাই তখন আমার মনে হচ্ছে। আমি যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, তাহলে বাঘটাও আমার ওপর পড়বে। ও যদি আমাকে নাও কামড়ায়, ওর অত বড়ো শরীরের চাপেই আমি মরে যেতে পারি।

কত মুহূর্ত কাটল জানি না! আর একটুক্ষণ থাকলে আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতাম। বাঘটার চোখের দিকে আমার চোখ। সরোজবাবু আরও কত কী বলে যাচ্ছেন, আমার কানে যাচ্ছে না।

এবারে সেই বাঘ হঠাৎ ফ-র-র শব্দ করল। আর অমনই একরাশ বাঘের থুতু এসে লাগল আমার মুখে আর জামায়।

বাঘটা এবার আমাকে ছেড়ে গদাইলশকরি চালে দুলতে দুলতে চলে গেল বাগানে।

আমি ধপাস করে বসে পড়লাম চেয়ারে। তাকিয়ে দেখি, শক্তি, পার্থ এবং অন্য বন্ধুরা কেউ সেখানে নেই। সবাই সরে পড়েছে। আমার যেন জীবনীশক্তি আর একটুও বাকি নেই, নড়তে-চড়তে পারছি না, গলা শুকিয়ে কাঠ!

সরোজবাবু বললেন, 'আপনাদের থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোনো অসুবিধে হবে না। তবে রাত্তিরে ঘরের দরজা বন্ধ করবেন না। খৈরি তো সারারাত এখানে ঘুরে বেড়ায়। কোনো ঘরের দরজা বন্ধ দেখলে ধাক্কা মারে। আমরা তো দরজা খুলে শুই। ও বড়োজোর দু-একবার ভেতরে ঢুকে গায়ের গন্ধ শুঁকে চলে যায়।'

আমি আবার তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। মাথা খারাপ! এই বাংলোয় কেউ আর রাত্তিরে থাকে? রাত্তির বেলা বাঘ এসে ঢুঁসো মারবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি গুটিগুটি পায়ে চলে এলাম গেটের বাইরে। দেখি যে, অন্য বন্ধুরাও সেখানে সবাই জড়ো হয়েছে। সবাই বলল, 'রাস্তার ধারে কোথাও শুয়ে থাকব সেও ভালো, কিন্তু এই বাংলোতে রাত কাটাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না!'

সেই রাতেই আমরা উঠে গেলাম পাহাড়ের দিকে।

তাহলে, আমার বুকে যে একটা মস্ত কেঁদো বাঘের থাবার ছাপ আছে, এ-কথাটা মিথ্যে নয়!

এই ঘটনা ঘটেছিল বেশ কিছু বছর আগে।

সেই খৈরি কিন্তু এখন আর বেঁচে নেই। খুব কম বয়সেই সে মারা গেছে। বাঘ নয়, সে ছিল একটা বাঘিনী। আমাদের সে কামড়ায়নি বটে, কিন্তু এর পরে দু-একজন মানুষকে জখম করেছে। বোঝা যাচ্ছিল যে, তাকে ওইভাবে পোষ মানিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা।

তখন তাকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছিল কয়েকবার।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, প্রত্যেকবারই সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে এসেছে। মানুষের কাছাকাছি থাকার জন্য তার গায়ে বোধ হয় অন্যরকম গন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই বনের বাঘরা তাকে সহ্য করতে পারত না। অমন একটা মোটাসোটা সুন্দরী বাঘিনী, তবু কোনো বনের বাঘ তাকে পছন্দ করেনি! বারবার অন্য বাঘেরা তাকে আঁচড়ে-কামড়ে, মেরে জঙ্গলের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে। একবার সেই ক্ষত থেকে সেপটিক হয়ে যায়। তাতেই সে মারা যায়।

বেচারি মানুষের সঙ্গেও থাকতে পারেনি, আবার জঙ্গলেও ঠাঁই পেল না। নদীর ধার থেকে ওকে কোলে করে নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছিল। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'—এই কথাটা কত সত্যি!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভরত দাশের গন্ডার

মেদিনীপুরের মঙ্গলহাটা গ্রামের শ্রীযুক্ত ভরতকুমার দাশ দু-টি গন্ডার পুষেছেন বাড়িতে। এই খবর সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। সেই খবরের চারদিকে কালো রুল দিয়ে বক্স আইটেম।

খবরটা পড়তেই শিশুপাল টেবিল চাপড়ে বলল, 'দেখ এবার মেদিনীপুর সব ব্যাপারে টেক্কা দিয়েছে! আর কিছু বলতে পারবি? এখন থেকে মেদিনীপুরের পা-ধোওয়া জল খাবি, বুঝলি?'

কালনেমি লম্বা খাতায় হিসেব মেলাচ্ছিল, 'উঁহু, উঁহু, এখন বিরক্ত করিস না। ভুল হয়ে যাবে!'

কিন্তু শিশুপাল তা শুনবে কেন? এত বড়ো একটা অস্ত্র পাওয়া গেছে কালনেমিকে ঘায়েল করার, এ কখনো ছাড়া যায়? এসব খবর ঠাণ্ডা হতে দিতে নেই!

সে খবরের কাগজটা কালনেমির খাতার ওপর মেলে ধরে বলল, 'ওসব হিসেব পরে হবে, আগে এটা পড়ে দেখ।'

কালনেমি হতাশভাবে দু-হাত ছড়িয়ে বলল, 'এখনও টিফিনের সময় আসেনি, এর মধ্যেই তুই কাগজ পড়তে শুরু করে দিলি? মালিক দেখতে পেলে...'

শিশুপাল বলল, 'এত বড়ো খবর বেরিয়েছে। আজ অফিস ছুটি দেওয়া উচিত! মেদিনীপুর হুররে। থ্রি চিয়ার্স ফর মেদিনীপুর, হিপ হিপ...'

আশেপাশের অন্য টেবিল থেকেও অনেকে মুখ তুলে তাকাল। বটুকবাবু বলল, 'আবার দুজনে লেগেছে। তোমরা নিজেরা কাজ করবে না, আমাদেরও কাজ করতে দেবে না!'

একটা ছোটো বেসরকারি অফিস। দু-টি মাত্র ঘরে মোট চোদ্দো জন কর্মচারী বসে। জায়গার এত টানাটানি যে, দুজনকে এক টেবিলে বসতে হয়। কালনেমি আর শিশুপাল মুখোমুখি।

দু-জনেরই তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, দুজনেই গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু দুজনেরই কোনো ব্যাপারেই মতের মিল হয় না। শিশুপাল বসুর বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, আর কালনেমি মিত্রর বাড়ি চব্বিশ পরগনার ডায়মণ্ড হারবারের কাছে। প্রথম দিন আলাপেই কালনেমি অবজ্ঞার সুরে শিশুপালকে বলেছিল, 'ও, মেদিনীপুরিয়া?' এর উত্তরে শিশুপাল বলেছিল, 'ডায়মণ্ডহারবার মানে দোখনো? ওখানকার লোকেরা খুব মামলাবাজ হয়!'

সেই থেকেই তর্কের শুরু!

কালনেমি একবার ট্রেনে করে যাওয়ার সময় খড়্গপুর স্টেশনে জল খেতে নেমেছিল। কলের সামনে লম্বা লাইন, কালনেমি সবেমাত্র জলের তলায় হাত পেতেছে, এমন সময় ট্রেনের হুইসেল

https://boierhut.com/fb

বেজে উঠল। জল খাওয়াও হল না আর ছুটতে গিয়ে তার একপাটি চটি ছিঁড়ে গেল। সেই থেকে মেদিনীপুরের ওপর কালনেমির খুব রাগ।

আর শিশুপালের এক মাসির বিয়ে হয়েছে কাকদ্বীপে। মাসি প্রায়ই বলেন, 'ওই গুষ্টির কথা বলিস না। হাড়-মাস একবোরে ভাজা ভাজা করে খেল। তোদের যে একটু ডাকব একদিন, মাছ-দুধ খাওয়াব, তার উপায় নেই। সবসময়ই তো লাঠালাঠি আর মামলা চলছে! সেইজন্য শিশুপাল চব্বিশ পরগনার লোকদের বড়ো হেয় মনে করে।

কাজের মাঝখানে যদি কোনোক্রমে একবার চব্বিশ পরগনা কিংবা মেদিনীপুরের কোনো জায়গার নাম ওঠে, অমনি কাজ বন্ধ করে তর্ক শুরু করে দেয় দুজনে।

মজা দেখবার জন্য সহকর্মীরাও কেউ কেউ হঠাৎ বলে ওঠে, 'যাই বলো, মেদিনীপুরের মতন জায়গা হয় না। এই তো দিঘায় বেড়াতে গেলাম, কী ভালো কাটল, সস্তায় কত মাছ খেলাম!'

কালনেমি অমনি ফোঁস করে উঠে বলল, 'দিঘার মাছ? আরে ছ্যা ছ্যা! ওই মাছের কোনো স্বাদ আছে নাকি? ইলিশ মাছ খেতে হলে যেতে হবে ডায়মণ্ডহারবার। চিংড়ির জন্য বসিরহাট। পারশে খেতে হলে কাকদ্বীপ। সব মাছের ভেড়িই তো চব্বিশ পরগনায়!'

শিশুপাল অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, 'মেদিনীপুরের মাছের জন্য ভেড়ি লাগে না। যে-কোনো গ্রামের রাস্তা দিয়ে কই মাছ হেঁটে বেড়ায়। আর মুরগি? দশ টাকায় এক জোড়া মুরগি আর কোথাও পাওয়া যায়?'

এইরকম প্রায় রোজই চলে।

গত সপ্তাহে খবরের কাগজে একটা ছোটো খবর বেরিয়েছিল। টিফিনের সময় সেই খবরটা পড়তে পড়তে ওদের সহকর্মী রমেশবাবু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাঁকড়াঝোড় জায়গাটা কোথায়?'

শিশুপাল অমনি বলে উঠেছিল, 'মেদিনীপুরে। ওখানে দুর্দান্ত সুন্দর একটা জঙ্গল আছে।'

রমেশ বলেছিল, 'আমি তো আগে নাম শুনিনি সেই জঙ্গলের। সেখানে আবার বাঘও আছে। এই দেখুন কাগজে বেরিয়েছে। দুটো বাঘ আদিবাসীদের গ্রামে এসে ছাগল ধরে নিয়ে গেছে!'

সেই শুনে কালনেমি অট্টহাসি করে বলেছিল, 'কাঁকড়াঝোড় আবার একটা জঙ্গল, সেখানে আবার বাঘ! দেখো গিয়ে, বাঘ নয় বনবিড়াল! কার সামনে জঙ্গলের কথা বলছে! আমার বাড়ির পাশে সুন্দরবন, সেখানকার রয়েল বেঙ্গল টাইগাররা ছাগল-টাগল ছুঁয়েও দেখে না, মানুষ ধরে ধরে ডিনার করে!'

সব সহকর্মীই অবশ্য কাঁকড়াঝোড়ের তুলনায় সুন্দরবনকে সমর্থন করে। শিশুপাল মিনমিন করে বলার চেষ্টা করেছিল, 'ওই কাঁকড়াঝোড়ে মাঝে মাঝে হাতিও দেখা যায়। সুন্দরবনে তো হাতি নেই।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু কাঁকড়াঝোড়ে সত্যিই হাতি আছে কী না সে-কথা কাগজে ছাপা হয়নি, সুতরাং কোনো প্রমাণ নেই। সেইজন্য শিশুপালের দাবি অন্যরা মেনে নিতে রাজি হয় না।

শিশুপাল সেইজন্য একটু মনমরা হয়েছিল, আজ আবার সে খবর পেয়ে গেছে! মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভান্ডার! এই সেই গন্ডার!

শিশুপালের চেঁচামেচি শুনে বটুকবাবু-রমেশবাবুরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজটার ওপর। সত্যিই তো জবর খবর। মেদিনীপুরে গন্ডার! একটা নয়, দুটো। তাও আবার পোষা। কে এই ভরতকুমার দাশ।

কালনেমি মিনমিন করে বলল, 'ভুল লিখেছে। খবরের কাগজে অনেক ভুল খবর বেরোয়!'

শিশুপাল বলল, 'আরে তোদের ওই সুন্দরবনের অসভ্য বাঘগুলোর খবরও তো কাগজেই ছাপা হয়। নইলে, সেসব বাঘ কী কেউ চোখে দেখেছে? আমাদের মেদিনীপুরের মানুষ গন্ডারকেও পোষ মানাতে পারে। যে কেউ ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পারে!'

কালনেমি বলল, 'হুঁ! গন্ডার আবার কখনো পোষ মানে? তাহলে গিনেস বুক অফ রেকর্ডে ছাপা হয়ে যেত! তোদের ওই বাংলা কাগজের খবর আমি বিশ্বাস করি না। আমরা বাড়িতে ইংলিশ নিউজপেপার পড়ি। বাড়িতে গিয়ে মিলিয়ে দেখব।'

বটুকবাবু সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বয়কে ডেকে বলল, 'ওরে বংশী, পাশের অফিস থেকে ইংরেজি কাগজখানা একটু ধার চেয়ে আন তো!'

সেই কাগজ আনা হল। হ্যাঁ, ইংরেজি কাগজে বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে! দু-খানা রাইনোসেরাস, পাশে আবার ব্র্যাকেট দিয়ে লেখা ডমেস্টিকেটেড।

শিশুপাল টেবিল চাপড়ে বলল, 'এবার! চব্বিশ পরগনার থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল তো!'

রমেশবাবু একটু সন্দেহ সৃষ্টির জন্য বলল, 'অবশ্য ছাপার ভুল হতে পারে। মঙ্গলহাটা গ্রামটা যদি জলপাইগুড়িতে হয়, তাহলে আর অবিশ্বাসের কিছু নেই। ওখানে তো গন্ডার আছেই!'

শিশুপাল চোখ গরম করে বলল, 'দু-দুটো কাগজে ভুল ছাপা হবে? তা ছাড়া, জলপাইগুড়িতে কেউ কোনোদিন গন্ডার পুষেছে? ওরকম হিম্মত মেদিনীপুরের লোক ছাড়া আর কারুর হয় না।'

বটুকবাবু বলল, 'যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই বাচ্চা গন্ডার!'

শিশুপাল বলল, 'চলুন, এই শনিবার আমার সঙ্গে চলুন মেদিনীপুর, আমি খরচা দেব, নিজের চোখে দেখে আসবেন, বাচ্চা না বড়ো!'

টিফিনের সময় কালনেমিকে দেখা গেল খবরের কাগজের অফিসে টেলিফোন করতে। ইংরেজি কাগজের লোকদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে বলে সে ফোন করল বাংলা কাগজের অফিসে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু প্রথম কথাতেই তাকে ধাক্কা খেতে হল। যে প্রথম টেলিফোন ধরল সে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, বলুন, কী চাই?'

কালনেমি বলল, 'দেখুন, আজকের একটা খবর সম্পর্কে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই...'

ওপাশের লোকটি বলল, 'কী খবর? কার খবর? কোথাকার খবর? লোকাল না ফরেন? রিপোর্টিং না এজেন্সি ম্যাটার? বলুন, বলুন!'

ঘাবড়ে গিয়ে কালনেমি ফোন রেখে দিল।

শিশুপাল বলল, 'আরে আরে, এ দেখছি ফোনও করতে পারে না। দেখ আমি করছি।'

সে ডায়াল ঘুরিয়ে কানেকশন পাওয়ার পর নিজেই প্রথম জিজ্ঞেস করল, 'ও মশাই, গন্ডারের ব্যাপারটার একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলুম...'

অন্য দিক থেকে বলল, 'গন্ডার! এটা কী চিড়িয়াখানা ভেবেছেন নাকি? আজকাল যা হয়েছে টেলিফোনের ব্যাপার, সবসময় রং নাম্বার!'

সেই লোকটি লাইন কেটে দিল।

বটুকবাবু বলল, 'দাও দাও, আমার কাকার এক শালা ওই কাগজে কাজ করে। তার কাছ থেকে একেবারে ভেতরের খবর জেনে দিচ্ছি!'

অপারটরকে অনেক বুঝিয়ে বটুকবাবুর কাকার শালার সন্ধান পাওয়া গেল। সব শুনে তিনি বললেন, 'গন্ডার? সেরকম কোনো খবর পেয়েছিলে বুঝি? কে বলল?'

বটুক বলল, 'আপনাদের আজকের কাগজেই তো প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল, দেখেননি?'

কাকার শালা বলল, 'ওসব তো নিউজের ব্যাপার। আমরা তো কিছু জানি না! তবে দাঁড়াও, তোমাকে আর একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। তুমি ধরে থাকো।'

বটুকবাবুকে অনেকক্ষণ ধরে থাকতে হল। টিফিনের সময় ফুরোতে আর দেরি নেই। নিউজ-পেপারের লোক নিউজের খবর রাখে না, শুনে সবাই অবাক। কাগজের লোক নিজেদের কাগজ পড়ে না।

একটু বাদে আর একজন লোক ধরে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, বলুন, গন্ডার সম্পর্কে কোনো খবর দেবেন? কলকাতার রাস্তায় গন্ডার বেরিয়েছে?'

বটুকবাবু বলল, 'আজ্ঞে, না না, আমি সেকথা বলিনি। বলছিলুম কী, আজকের কাগজে মেদিনীপুরে গন্ডারের যা খবর বেরিয়েছে, সেটা কি সত্যি?'

লোকটি চটে গিয়ে বলল, 'সত্যি না কি আমরা মিথ্যে খবর ছাপব? আপনি কে মশাই, শুধু সময় নষ্ট করছেন?'

'না, না, সেকথা বলছি না। আমরা যদি ওই গন্ডার দেখতে যাই, দেখতে পাব তো?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আপনারা গন্ডার দেখতে পাবেন কী পাবেন না, তা আমরা কী জানি, লোককে গন্ডার দেখানো কী আমাদের দায়িত্ব। গন্ডার যদি দেখার অত গরজ থাকে, তাহলে অতদূরে মেদিনীপুরে যেতে হবে কেন, আলিপুরে চলে যান!'

'ওই গন্ডারের খবর যিনি লিখেছেন, তিনি নিজের চোখে দেখেননি?'

'আরে মশাই, সব কিছু নিজের চোখে দেখে লিখতে গেলে তো আমাদের এক হাজারটা চোখ থাকা দরকার। তবে ওই খবরটা আমরা অনেক চেক করে তারপর ছেপেছি। দু-তিন জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে, সব জায়গাতেই মিলেছে। লাইভ স্টক সেনসাস হচ্ছে তো, লাইভ স্টক সেনসাস কাকে বলে জানেন আশা করি, গৃহপালিত পশু, যেমন গোরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া এইসব গোনাগুনতি হচ্ছে, তার মধ্যে ওই দু-টি পোষা গন্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে! আশ্চর্য ব্যাপার, এদেশে কিন্তু কেউ জলহস্তী পোষে না।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে বটুকবাবু যেই বলল খবরের কাগজের লোক নিজের চোখে দেখে লেখেনি, অমনি কালনেমি লাফিয়ে উঠল, 'গাঁজাখুরি! গাঁজাখুরি! ওদের নামে মামলা আনা যায়!'

শিশুপাল আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলেন দোখনোর কান্ডটা। এই যে লিখেছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, মহকুমা হাকিম বলেন—এসব কখনো মিথ্যে হতে পারে? ঠিক আছে, এই শনিবার কে কে যাবে মেদিনীপুর? আমি খরচা দেব! নিজের চোখে দেখিয়ে দেব!'

এরকম সুযোগ ক-জন ছাড়ে। রমেশবাবু আর বটুকবাবু দুজনেই রাজি হয়ে গেল ওদের সঙ্গে যেতে। বাজি ধরা হল গন্ডার নিয়ে, যে পক্ষই জিতুক, একশো টাকা খাওয়াবে।

হাওড়া স্টেশনে এসে কালনেমি একসময় আপত্তি জানাল, সে খড়্গপুর হয়ে যাবে না। কিন্তু তার আপত্তি টিকল না। খড়্গপুরকে বাদ দিয়ে কি মেদিনীপুর যাওয়া যায়? শিশুপাল চেঁচিয়ে বলল, 'ভীতু! ভীতু!'

মঙ্গলহাটা গ্রামে পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গেল। ভরতকুমার দাশের নাম জিজ্ঞেস করতেই সবাই চিনতে পারল এক বাক্যে। কয়েকজন এগিয়ে এসে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে যান, এই রাস্তার একেবারে শেষ বাড়িটা। মস্ত বড়ো বাগান আর পুকুর আছে দেখবেন।'

তাদের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

বটুকবাবু ফিসফিস করে শিশুপালকে জিজ্ঞেস করল, 'এদের কাছে জানতে চাইব নাকি?'

শিশুপাল বলল, 'কিছু দরকার নেই। এতদূর এসে পড়েছি, একটু পরেই তো চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।'

রমেশবাবু বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওই ভরত দাশ লোকটা কি পোষা গন্ডারদের ছেড়ে রাখে না খাঁচায় রাখে? আমার বড্ড কুকুরের ভয়।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শিশুপাল প্রায় তেড়ে উঠে বলল, 'আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক। গন্ডারের সঙ্গে কুকুরের তুলনা করছেন? গন্ডার কি কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে?'

রমেশবাবু বলল, 'গন্ডার কীভাবে ডাকে তা আমি জানিই না। তবে আমি আপনাদের পেছনে থাকব!'

ভরত দাশের বাড়িটি বেশ বড়ো। সামনে অনেকখানি বাগান, তাতে আবার গেট। ভেতরে চৌকো চত্বরের চারদিকে চারখানা ঘর। তার মধ্যে দু-খানা পাকা, দু-খানা খড়ের চালার। বাড়ির পেছন দিকেও অনেক গাছপালা। বেশ অবস্থাপন্ন লোক। এইরকম লোকেরই গন্ডার পোষা মানায়।

চৌকো চত্বরটায় মোড়ায় বসে একজন মাঝবয়েসি খালি গায়ের মানুষ হুঁকো টানছে। এই দলটি ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ভরতকুমার দাশ আছেন নাকি?'

হুঁকো টানা থামিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

বটুকবাবু বলল, 'কলকাতা থেকে।'

শুনেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বিগলিতভাবে বলল, 'ও কলকাতা থেকে? আসুন, আসুন। এই কে আছিস রে, চেয়ারটা নিয়ে আয়। চায়ের জল বসা। লক্ষ্মীকে দেখতে এসেছে! লক্ষ্মীকে সাজাতে বল।'

বটুকবাবুরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক ওদের জন্য চেয়ার বয়ে আনল। দু-তিনজন মহিলাও উঁকি মারলেন।

হুঁকো হাতে লোকটি বলল, 'বসুন, বসুন, আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো? আমি ভেবেছিলুম, আগামীকাল আসবেন। খবর দিলে আমি স্টেশনে লোক পাঠাতুম।'

শিশুপাল বলল, 'আজ্ঞে আমাদের পরিচয় দিয়ে নিই। আমি শিশুপাল বসু, ইনি বটুকেশ্বর দত্ত, উনি রমেশচন্দ্র নাগ আর ওই একজন হচ্ছে কালনেমি মিত্তির। আমরা এসেছি ভরতকুমার দাশের সঙ্গে দেখা করতে।'

লোকটি বলল, 'আমিই সেই অধম। আমার মেয়ের নামই লক্ষ্মী। একটু বসুন। লক্ষ্মীকে সাজিয়েগুজিয়ে নিয়ে আসছি।'

বটুকবাবু বলল, 'লক্ষ্মী... মানে.... আমরা তো আপনার মেয়েকে দেখতে আসিনি!'

'আমার মেয়েকে দেখতে আসেননি! তাহলে আপনারা...'

'আমরা...মানে....আপনার বাড়ির গন্ডার দুটো দেখতে এসেছি, মানে দূর থেকে এক ঝলক দেখলেই চলবে, একটা বাজি হয়েছে কিনা।'

ভরতকুমার প্রথমে চোখ গোল করে বলল, 'আপনারা বরদা সাঁতরার কাছ থেকে আসেননি? আমার মেয়েকে দেখতে আসেননি? আপনারা গন্ডার দেখতে... ওঃ হো-হো-হো-হো...'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...প্যাঁক প্যাঁক ডাকতে ডাকতে দুটো বেশ বড়ো রাজহাঁস চলে এল উঠোনে!

ভরতকুমার এমন হাসি শুরু করল যে সারাপাড়া যেন কেঁপে গেল একেবারে। হাসির চোটে হাত থেকে পড়ে গেল হুঁকো। প্রথমে সে বসে পড়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তারপর হাসতে হাসতে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি!

এরা চার জন একেবারে হতভম্ব। ভরতকুমার দাশের হাসি আর থামছেই না। লোকের যেমন কাশির রোগ থাকে, এর বোধ হয় তেমন হাসির রোগ। বটুকবাবু বলল, 'চলো কেটে পড়ি। রমেশবাবু বলল, বাজির কিছু ফয়সালা হল না যে।' শিশুপাল বলল, 'ওই কালনেমি ব্যাটাই হেরেছে।'

কালনেমি মাটিতে বসে পড়ে ভরতকুমারের হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগল, 'ও দাদা, ও দাদা, শুনুন। আমিও রামায়ণের ক্যারেকটার, আপনিও রামায়ণের ক্যারেকটার। আমরা দু-জনে এক দলের। ওই শিশুপালটা মহাভারত আরও বড়ো বইয়ের ক্যারেকটার বলে গর্ব করে। কিন্তু ওর যে মুন্ডু উড়ে গিয়েছিল, সেটা মনে রাখে না। আপনি শুধু একবার বলে দিন তো, আপনার বাড়িতে গন্ডার নেই। ওর মুন্ডটা আবার হেঁট হয়ে যাক।'

শিশুপালও অন্যদিকে বসে পড়ে বলল, ও ভরতদাদা, ও ভরতদাদা, আপনিও মেদিনীপুর, আমিও মেদিনীপুর। আমরা হলুম গে আত্মীয়, কী বলুন? একবার চট করে গন্ডার দুটো দেখিয়ে দিন তো। একটা দেখালেও চলবে।'

https://boierhut.com/fb

ভরতকুমার এবারে হাসি থামিয়ে উঠে বসল। মুখ মুছল গামছা দিয়ে। তারপর বলল, 'দেখবেন, দেখবেন, দেখুন তাহলে।'

সুর করে সে ডাকল, 'আয় তো রে আমার কার্তিক। আয় তো রে আমার গণেশ। আয় আয় আয়।'

অমনি গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক ডাকতে ডাকতে দুটো বেশ বড়ো রাজহাঁস চলে এল উঠোনে!

ভরতকুমার বললেন, 'আমি মিছে কথা বলি না। এখনকার ছেলেছোকরারা ইংরেজি জানে না, আমি কী করব, বলুন? থানা থেকে লোক এল আমার বাড়ির গোরু-ছাগল গুনতে। আমি সব শেষে বললুম, আই হ্যাভ ডু গ্যাণ্ডারস। আমি কি কিছু ভুল বলেছি? তারা যদি মানে না-বুঝে গন্ডার লিখে নেয়...'

কালনেমি লাফাতে লাফাতে বলল, 'নেই, নেই, গন্ডার নেই, নেই!'

শিশুপাল তার ঘাড় চেপে ধরে বলল, 'ওরে ভালো করে চেয়ে দেখ। গন্ডার না হল তো কী হয়েছে? এমন রাজহাঁস জন্মে দেখেছিস? তোদের সুন্দরবনে তো সব পাতিহাঁস!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বর্ধমান স্টেশনে দুটো বেশ বড়ো ট্রেন এখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। যদিও দুটো ট্রেন যাবে উলটোদিকে, কিন্তু ইঞ্জিন দুটো কাছাকাছি দুটো লাইনে। এক্ষুনি ছাড়বে, তাই ফোঁস ফোঁস করছে।

এরই মধ্যে একটা ইঞ্জিন অন্য ইঞ্জিনটাকে জিগ্যেস করল, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?

সেই ইঞ্জিনটা বলল, আমি তো আসছি দিল্লি থেকে, যাব কলকাতায়। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

এই ইঞ্জিনটা বলল, আমি কলকাতা থেকে আসছি। যাব মুম্বাই।

ট্রেনের ড্রাইভাররা তো একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলেই। ইঞ্জিনরাও কথা বলে। তা অন্য কেউ বুঝতে পারে না।

একটা ট্রেনের নাম গীতাঞ্জলি আর একটা ট্রেনের নাম রাজধানী।

গীতাঞ্জলি আবার জিগ্যেস করল রাজধানীকে, কলকাতায় পৌঁছে তারপর তুই কী করবি?

রাজধানী বলল, কী আবার করব? আবার রওনা দেব দিল্লির দিকে। সেখান থেকে আবার পরের দিন কলকাতায়। আবার দিল্লি। এইরকমই তো চলবে।

গীতাঞ্জলি বলল, দিনের পর দিন একই পথে যাওয়া-আসা করতে তোর একঘেয়ে লাগে না?

রাজধানী হেসে উঠে বলল, তুই কী পাগল হয়েছিস নাকি? হে-হে-হে-হে...

এই সময় গার্ডের হুইসল বেজে উঠল। দুটো ট্রেনই স্টার্ট দিয়ে চলতে লাগল দু-দিকে।

বিকেল সবে মাত্র শেষ হয়ে আসছে। আকাশ এখনও অনেকটা লাল। খুব সুন্দর হাওয়া বইছে। লাইনের ধারে ধারে তারের উপর বসে থাকা নানারকম পাখি। তারা শিস দিয়ে ডাকছে একজন আর একজনকে।

খুব জোরে ছুটতে ছুটতে গীতাঞ্জলি ট্রেনটা হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল। সেখানে লাইনের ধারেকাছে কোনো বাড়িঘর নেই। দু-পাশেই ধু-ধু করা মাঠ। ফসল কাটা হয়ে গেছে, তাই মাঠ একবারে খালি।

একটুখানি থেমে থাকার পর গীতাঞ্জলি ট্রেনটা লাইন ছেড়ে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে।

ইঞ্জিনের ড্রাইভারের একটু ঝিমুনি এসেছিল। চমকে জেগে উঠে সে চেঁচিয়ে বলল, আরে, আরে, এ কী হচ্ছে! অ্যাক্সিডেন্ট নাকি?

সে প্রাণপণে ব্রেক কষে ইঞ্জিনটা থামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই সেটা থামল না।

সে আবার ভয়ে বলে উঠল, এ কী ভূতুড়ে ব্যাপার হচ্ছে!

তখন গীতাঞ্জলির ইঞ্জিন বলল, ভয় পাবার কিছু নেই। আজ আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ড্রাইভার বলল, বেড়াতে যাচ্ছি মানে? ট্রেন আবার লাইন ছাড়া চলতে পারে নাকি? অসম্ভব!

ইঞ্জিন বলল, কিছুই অসম্ভব নয়। খুব জোর ইচ্ছে থাকলে সবই পারা যায়। আজ একটা অন্যরকম দিন।

ট্রেন সত্যিই আস্তে আস্তে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে।

ট্রেনের সব যাত্রীরা এর মধ্যে ভয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করেছে। কাঁদতেও শুরু করেছে কেউ কেউ। সবাই ভাবছে, যেকোনো মুহূর্তে নিশ্চয়ই ধপাস করে এক পাশে পড়ে যাবে!

কয়েকজন টপাটপ লাফিয়ে নেমে পড়তে লাগল। অন্যরাও নামতে শুরু করল সেইভাবে! বাচ্চা আর বুড়ো-বুড়িদের ধরে ধরে নামানো হল।

একটুক্ষণের মধ্যেই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল ট্রেন।

শুধু ড্রাইভার তখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে ইঞ্জিনটা থামাতে। পারছে না কিছুতেই। তখন সে কাঁদো-কাঁদো গলায় ইঞ্জিনকে বলল, এখনও সময় থাকতে লাইনে ফিরে চলো। নইলে, তুমিও বাঁচবে না, আমিও মরব!

ইঞ্জিন বলল, ওসব কিছু হবে না! তুমি চুপ করে বসে থাকো।

কিন্তু ড্রাইভার কী চুপ করে বসে থাকতে পারে? তারও তো প্রাণের ভয় আছে!সে-ও আবার লাফিয়ে পড়ল বাইরে।

এর মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ট্রেনটা যাচ্ছে একটা নদীর পাশ দিয়ে। ড্রাইভার লাফ দিয়ে পড়ল সেই নদীর জলে। ভাগ্যিস সে সাঁতার জানে। তাই ডুবল না। সাঁতরে নদী পার হয়ে ওপারে উঠে আবার সে ছুটতে লাগল।

আরও খানিকটা যাবার পর গীতাঞ্জলি এসে থামল একটা বনের ধারে।

এর মধ্যে চাঁদ উঠে গেছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে বড়ো বড়ো গাছের মাথায়।

বনে যেসব জন্তুজানোয়ার আছে, তারা খুব অবাক! বনের ধারে এত বড়ো একটা ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে আছে! এরকম তো আগে কোনোদিন হয়নি। পাখিদের এখন ঘুমোবার সময়, তারাও জেগে উঠে ডাকাডাকি শুর করেছে। গাছেরাও নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ফিসফিসিয়ে।

একটু বাদে একটা আট-ন-বছরের বাচ্চা ছেলে এসে দাঁড়াল ট্রেনটার কাছে। সে ফিচিং ফিচিং করে একটু একটু কাঁদছে।

গীতাঞ্জলি ট্রেন তাকে জিগ্যেস করল, এই খোকা, তুমি কাঁদছ কেন?

ট্রেন কথা বললে বড়ো বয়েসের মানুষরা ভয় পায় কিন্তু অবিশ্বাস করে। বাচ্চারা কিন্তু ভয়ও পায় না, অবিশ্বাসও করে না।

সে কান্না থামিয়ে বলল, আমি বাবার সঙ্গে মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোথায় বাবা হারিয়ে. গেল!

https://boierhut.com/fb

ট্রেন বলল, বাবা হারিয়ে যায়নি। তুমি হারিয়ে গেছ। তাতে কী হয়েছে, তুমি বাবাকে আবার খুঁজে পাবে ঠিক।

বাচ্চা ছেলেটি ট্রেনের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ওগো ট্রেন, বাবাকে যদি খুঁজে না-পাই, তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে?

ট্রেন বলল, তা তো দিতেই পারি। তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার নাম কী?

ছেলেটি বলল, আমার নাম সুগন্ধকুমার কর্মকার। আমাদের বাড়ি মণিকোঠা গ্রামে, সেখানে অনেক বাতাবিলেবুর গাছ আছে।

ট্রেন বলল, বা:, গ্রামের নাম জানো, আর সেখানে অনেক বাতাবিলেবুর গাছ, তবে তো খুঁজে পাওয়ার কোনো অসুবিধেই নেই। ঠিক পৌঁছে দেব। এখন একটু বসো। দেখো না, আকাশে আজ কত তারা দেখা যাচ্ছে। আর চাঁদটা যেন ফিক ফিক করে হাসছে। আর অনেকগুলো জোনাকি এমনভাবে উড়ছে, যেন হাওয়াতে তারা কিছু একটা লিখছে। কী লিখছে, তুমি পড়তে পারো?

সুগন্ধ বলল, না। আমি শুধু বাংলা পড়তে পারি। আর একটু একটু ইংরেজি। জোনাকিরা কী কথা বলে, এখনও শেখা হয়নি।

ট্রেন জিগ্যেস করল, তুমি গান গাইতে পারো? একটা গান শোনাও না।

সুগন্ধ বলল, আমি তো গান জানি না।

ট্রেন বলল, তুমি নাচতে পারো? একটু নাচো।

সুগন্ধ লজ্জা পেয়ে বলল, ভ্যাট। আমি নাচতেও জানি না।

ট্রেন জিগ্যেস করল, তাহলে তুমি কী জানো?

সুগন্ধ বলল, আমি একটু একটু মাউথ অর্গান বাজাতে পারি। কিন্তু সেটা তো সঙ্গে আনিনি। আমার দাদা মাঝে মাঝেই সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেয়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গীতাঞ্জলি ট্রেন তাকে জিগ্যেস করল,এই খোকা,তুমি কাঁদছ কেন?

ট্রেন বলল, তাহলে তুমি চুপটি করে বসো আমার কাছে। হাওয়া খাও। আমি ঠিক তোমাদের গ্রামে পৌঁছে দেব। তোমাকে টিকিট কাটতেও হবে না!

এই সময় দুটো গাছ থেকে দুটো কোকিল ডেকে উঠল। আর একটাও কী পাখি ডাকল, সেটা ঠিক চেনা গেল না।

এই জঙ্গলে থাকে দুটো খুব বড়ো ভাল্লুক। তারা এমনই হিংস্র আর এত বড়ো চেহারা যে বাঘও তাদের ভয় পায়। শেয়াল-টেয়াল তো কাছেই ঘেঁষে না।

একটা ঝোপের আড়ালে বসে তারা বাচ্চাছেলেটিকে আগে থেকেই তাক করছিল। এখন ভাল্লুকটা তার বউকে বলল, এই, যা তো, ওই বাচ্চা ছেলেটার ঘাড় কামড়ে টেনে নিয়ে আয়। অনেকদিন বাচ্চা মানুষের রক্ত খাইনি।

ভাল্লুকিটা বলল, বাচ্চা ছেলের রক্ত, গরম গরম, কী ভালো খেতে। চলো, একসঙ্গেই যাই।

খানিকটা এগিয়েই ভাল্লুকিটা হঠাৎ থেমে গেল।

ভাল্লুক জিগ্যেস করল, কী হল, থামলি কেন?

ভাল্লুকি বলল, কেমন কেমন যেন লাগছে। আর সব দিন তো মানুষ দেখলেই তেড়ে যাই। আজ একটা অত বড়ো ট্রেন এসেছে আমাদের বাড়ির কাছে। রাত্তিরবেলা কোকিল ডাকছে। হাওয়াতেও কেমন ফিসফিসানি। আজকের দিনটা অন্যরকম। আজ আর ওকে মারতে ইচ্ছে করছে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাল্লুক ধমক দিয়ে বলল, তাহলে কি আজ খালি পেটে থাকব নাকি? আর তো খাওয়ার মতন কিছু দেখছি না।

তারপরই সে গলার আওয়াজ নরম করে বলল, তুই ঠিকই বলেছিস।

গা-টা কেমন যেন শিরশির করছে। এমনি এমনিই ভালো লাগছে। আজ সত্যিই অন্যরকম দিন।

থপথপিয়ে তারা দুজন চলে এল সুগন্ধের কাছে।

সুগন্ধ কিন্তু ভাল্লুকদের দেখে একটুও ভয় পেল না।

সে ইঞ্জিনকে বলল, এই তো ওরা এসে গেছে। ওরা নাচ দেখাবে। ভাল্লুকরা খুব ভালো নাচ জানে।

ইঞ্জিন বলল, ভাল্লুক দাদা আর ভাল্লুক বউদি, একটু নাচ দেখাও না। আমি কোনোদিন দেখিনি।

ভাল্লুকি বলল, এমন সুন্দর রাত, নাচতে তো ইচ্ছে করছেই। কিন্তু কোন নাচটা দেখাব বলো তো? কথাকলি না মণিপুরী?

ইঞ্জিন বলল, আমি তো অতশত বুঝি না। তোমাদের যেটা ইচ্ছে হয়, সেটাই দেখাও!

এর মধ্যে হয়েছে কী, ইঞ্জিনের অন্য দিক দিয়ে একটা লম্বা সাপ উঠে এসেছে।

কিছু কিছু সাপ আছে, বেশ ভদ্র। তারা মানুষকে কামড়ায় না। এই সাপটা কেউটে, বড্ড বদরাগী, মানুষ দেখলেই কামড়াতে যায়। সে সুগন্ধকে ছোবল মারার জন্য ফণা তুলল।

সুগন্ধ ভাল্লুক দেখে ভয় না-পেলেও সাপকে খুব ভয় পায়। সে ভয়ে কেঁপে উঠল।

তখন পাশের একটা বটগাছ গম্ভীরভাবে ধমক দিয়ে বলল, এই কেউটে, তোর লজ্জা করে না? আজ এমন একটা অন্যরকম রাত, আজকেও তোর হিংসে না-করলে চলে না? একটা থাপ্পড় খাবি?

কেউটে সাপটা তখন আর ছোবল মারল না বটে, কিন্তু ফণাটা দোলাতে লাগল।

সুগন্ধ দৌড়ে নেমে গিয়ে ভাল্লুকিকে জড়িয়ে ধরল।

ভাল্লুকি বলল, ভয় নেই, ভয় নেই, আমরা তো আছি। তুমি আমাদের পেছনে দাঁড়াও, আমরা এবার নাচ শুরু করি। প্রথমে মণিপুরী ড্যান্স!

কিন্তু নাচ শুরু করা গেল না।

একটু দূরে শোনা গেল একটা গাড়ির শব্দ।

এখানে জঙ্গলে ঢোকার কোনো রাস্তা নেই, বড়ো বড়ো গাছ আর ঝোপঝাড়। জঙ্গলে ঢোকার রাস্তা আছে দু-কিলোমিটার দূরে, ভাগ্যবান গেটে। তাই এদিকে কখনো গাড়ি আসে না।

একটু পরেই জোরালো সার্চ লাইট জ্বেলে সেখানে এসে গেল জিপ গাড়ি। সেটা থেকে টপাটপ নেমে পড়ল ছ-জন পুলিশ। তাদের হাতে রাইফেল আর রিভলভার।

তাদের একজন চেঁচিয়ে হুকুম দিল, গো, গো। সার্চ, সার্চ!

সঙ্গে সঙ্গে তারা অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে ছুটে ট্রেনের প্রত্যেকটা কামরায় কী যেন খুঁজতে লাগল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পুলিশ দেখে ভাল্লুক দুটো আর সুগন্ধ চট করে লুকিয়ে পড়েছে একটা বড়ো ঝোপের আড়ালে। সাপটা কিন্তু এখনও ইঞ্জিনের মধ্যে একইরকমভাবে ফণা তুলে আছে।

পুলিশরা ট্রেনটির সব কামরায় উঠে ভালো করে তল্লাশি করল। তারপর সবাই নেমে পড়ে বলল, না:, কিছু নেই। কেউ নেই।

পুলিশের মধ্যে যে হেড সে বলল, খবর পেয়েছিলাম, ক-জন লোক মিলে ট্রেনটাকে হাইজ্যাক করে এখানে নিয়ে এসেছে। তারা এর মধ্যে কোথায় পালাল? জঙ্গলের ভেতরটাও খুঁজে দেখতে হবে।

এবার সে জিপ থেকে আর একজন লোককে টেনে নামাল। এই লোকটির দু-হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার জামা-প্যান্ট জবজবে ভেজা। চাঁদের আলোতে চেনা যায়, এ সেই ইঞ্জিনের ড্রাইভার, যে ইঞ্জিন থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে নদীতে পড়েছিল।

পুলিশের হেড তাকে জিগ্যেস করল, পঞ্চু, যারা এই ট্রেনটা হাইজ্যাক করেছিল, তাদের দলে ক-জন ছিল?

ড্রাইভার বলল, স্যার, আমার নাম পঞ্চু নয়, আমার নাম ভোম্বল...

হেড তাকে ধমক দিয়ে বলল, তোর নাম যাই-ই হোক...

অন্য একজন পুলিশ টিপ্পনী কাটল, পঞ্চুর থেকে ভোম্বল বুঝি বেশি ভালো?

হেড আবার বলল, তোর নাম যাই-ই হোক, আমি তোকে পঞ্চু বলেই ডাকব। যা জিগ্যেস করছি, তার উত্তর দে। ক-জন ছিল?

ভোম্বল বলল, একজনও ছিল না স্যার। ট্রেন কেউ হাইজ্যাক করেনি।

হেড বলল, কেউ হাইজ্যাক করেনি? তা হলে ট্রেনটা লাইন ছেড়ে এখানে এল কী করে? তুই এনেছিস? সত্যি কথা বল, নইলে, নইলে, এক্ষুনি গুলি করে তোকে শেষ করে দেব।

ভোম্বল কাঁচুমাচুভাবে বলল, একদম তিন সত্যি করে বলছি স্যার, আমি আনিনি, আমি তো অনেক আগেই নেমে পড়েছি।

হেড বলল, আবার মিথ্যে কথা? তুই আনিসনি, তাহলে ট্রেনটা এখানে এল কী করে?

ভোম্বল বলল, ইঞ্জিনটা নিজে নিজে এসেছে!

তা শুনে সব ক-টা পুলিশ হো হো করে হেসে উঠল। এমন মজার কথা তারা জীবনে শোনেনি। ইঞ্জিনটা নিজে নিজে এসেছে! হা-হা-হি-হি-হো-হো। তাদের হাসি থামতেই চায় না।

হেড হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ভোম্বলকে জিগ্যেস করল, ইঞ্জিনটা নিজে নিজে লাইন ছেড়ে এখানে এল কেন?

ভোম্বল এবার সরলভাবে বলল, আজ যে একটা অন্যরকম দিন!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হেড আরও রেগে গিয়ে বলল, অন্যরকম দিন? কেন অন্যরকম দিন? কীসের অন্যরকম দিন? যত্ত সব বাজে কথা। এবার দেখাচ্ছি মজা! পঞ্চু, ওঠ, ইঞ্জিনের ওপরে ওঠ!

ভোম্বলের হাতের দড়ি খুলে দেওয়া হল। তাকে ঠেলতে ঠেলতে তোলা হল ইঞ্জিনে। অন্য সব পুলিশও ওপরে উঠে এল।

হেড ভোম্বলকে হুকুম দিল, এবার চালাও ইঞ্জিন। আগে ব্যাক করো।

ভোম্বল খুব ভয় পাওয়া গলায় বলল, আমি পারব না স্যার।

হেড বলল, কেন পারবি না? আমার হুকুম না-শুনলে শাস্তি হবে জানিস না?

সে তার রিভলভারটা ভোম্বলের মাথার পেছনে ঠেকাল।

ভোম্বল তবু বলল, ইঞ্জিন আমার কথা শুনছে না।

আবার অন্য পুলিশরা হেসে উঠল।

হেড কড়া গলায় বলল, ইঞ্জিন তোর কথা শুনছে না? ইঞ্জিন কী মানুষ নাকি? ইঞ্জিন তো একটা যন্ত্র। মানুষ যেমনভাবে চালাবে, যন্ত্র সেইভাবে চলবে।

ভোম্বল বলল, না স্যার। এক-একদিন যন্ত্ররাও মানুষের কথা শোনে না। নিজেদের ইচ্ছে মতন চলে। আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।

হেড বলল, তুই চালা বলছি। কেমন না-চলে আমি দেখছি। চালা, চালা!

ভোম্বল অনেকগুলো প্লাগ টেপাটেপি করল। কিছুই হল না। তারপর পেছন ফিরে বলল, দেখলেন তো স্যার, এখন আমাকে মারতে চান তো মারুন। তাতে কোনো লাভ হবে না। ইঞ্জিনকে তো আর আপনি গুলি করে মারার ভয় দেখাতে পারবেন না।

এই সময় হঠাৎ খুব জোরে ট্রেনের সিটি বেজে উঠল। যেন রাত্তিরের অন্ধকারের কালো পর্দাটা ছিন্নভিন্ন করে দিল সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

সবাই চমকে গেল একেবারে।

সিটি কে বাজাল? যে বোতামটা টিপলে বাজানো যায়, সেটায় তো কেউ হাত দেয়নি। তাহলে?

এই রহস্যের সমাধান করার আগেই একজন পুলিশ চেঁচিয়ে উঠল, সাপ! সাপ!

সেই কেউটে সাপটা পুলিশের হেডের একেবারে পায়ের কাছে ফণা তুলে আছে। যেকোনো মুহূর্তে ছোবল মারতে পারত, কিন্তু এখনও মারেনি।

হেড এক লাফে পেছিয়ে গেল খানিকটা। তারপর সাপটাকে মারবার জন্য রিভলভারটা সেটার দিকে তাক করে টিপ করতে লাগল।

কিন্তু হেডের গুলি করা আর হল না। তার চোখ বুজে এল, হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ে গেল নীচে।

অন্য পুলিশরা ভাবল, কী হল? কী হল?

https://boierhut.com/fb

একজন বুড়ো মতন পুলিশ বলল, এই রে! সাপের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে নেই। সাপ হিপনোটাইজ করতে পারে! আমি আমার রাইফেলটা দিয়ে ওটাকে পিটিয়ে মারতে পারি। তাতে অবশ্য আমাকে চোখ বুজে থাকতে হবে। ওকে যদি দেখতে না-পাই, মারব কী করে?

এই সময় দু-বার কোকিল ডেকে উঠল। আর সেই অন্য পাখিটা...

হেড চোখ খুলে বলল, কোকিল ডাকল? রাত্তিরবেলা কোকিলের ডাক তো আগে কখনও শুনিনি। অন্য পাখিটাই বা কী?

ভোম্বল বলল, আজ স্যার সত্যিই একটা অন্যরকম দিন। অন্যরকম রাত।

সাপের কথাটা আর মনেই রইল না। হেড বলল, একটা সরসর শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

বুড়ো মতন পুলিশটি বলল, হ্যাঁ, স্যার, গাছের পাতায় হাওয়ার শব্দ। গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

হেড বলল, গাছ বুঝি কথা বলতে পারে? ধ্যাত!

বুড়ো মতন পুলিশটি বলল, মাঝে মাঝে বলে স্যার। আমি ওদের কথা একটু একটু বুঝতেও পারি।

হেড বলল, তুমি গাছের কথা বুঝতে পারো? চালাকি হচ্ছে আমার সঙ্গে? কী কথা বলছে ওরা?

বুড়ো মতন পুলিশটি বলল, ওরা স্যার গান গাইছে। সেই গানটা হচ্ছে, আজ একটা অন্যরকম দিন। আজ একটা অন্যরকম রাত। আপনি কান পেতে শুনুন, আপনিও বুঝতে পারবেন।

হেড কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল।

তখনই বাইরে থেকে একটা ছোটো ছেলের গলা শোনা গেল, আমার যে খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার যে খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বুড়ো মতন পুলিশটি বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল, একটি ছোটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছলছল করছে তার চোখ।

সেই পুলিশটি জিগ্যেস করল, অ্যাই, তুই কে? তোর কীসের দেরি হয়ে যাবে?

ছেলেটি বলল, আমার নাম সুগন্ধ। আমার বাবা হারিয়ে গেছে। না, না, আমিই হারিয়ে গেছি। এই ট্রেন দাদা বলেছে, আমাকে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

হেড পুলিশ বলল, ট্রেন তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে? তোকে নিজের মুখে বলেছে?

সুগন্ধ বলল, হ্যাঁ, বলেছে তো। কখন যাব?

ট্রেন আবার একবার জোরে সিটি বাজাল।

এদিকে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাল্লুক আর ভাল্লুকি এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ভাল্লুকি বলল, তখন থেকে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই আর হচ্ছে না। যত সব ঝামেলা! এখন আমি নাচবই নাচব!

https://boierhut.com/fb

ভাল্লুক বলল, ঠিক আছে, নাচ শুরু কর না। আমিও আছি তোর সঙ্গে।

তখন তারা নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

ভাল্লুকের ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ শুনে পুলিশরা সব সেদিকে তাকাল। দু-দুটো অত বড়ো বড়ো ভাল্লুককে দেখে তারা রাইফেল আর রিভলভার বাগিয়ে ধরল।

বুড়ো পুলিশটি হেড পুলিশকে বলল, স্যার, স্যার, গুলি ছুড়বেন না। যে ভাল্লুক নাচে, তারা কি কামড়ায়?

হেড বলল, তাও তো বটে। না:, এরা কামড়াবার পার্টি নয়। চলো, তাহলে আমরা ওদের নাচ দেখি।

ভাল্লুক আর ভাল্লুকি বেশ নাচতে নাচতে এগিয়ে এল অনেক কাছে। তবে তারা মণিপুরী না কথাকলি নাচছে, তা অবশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সুগন্ধও নাচতে লাগল ওদের সঙ্গে। কোথা থেকে কয়েকটা খরগোশ আর কাঠবিড়াল এসে নাচ জুড়ে দিল। কোকিল দুটো আর সেই অজানা পাখিটা ডাকতে লাগল। নাচতে লাগল সব গাছের পাতা। দোল খেতে লাগল আকাশের চাঁদ। বেশি ঝিকঝিক করতে লাগল অনেক তারা।

পুলিশটিও ওদের সবার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে গাইতে লাগল। আজ একটা অন্যরকম দিন/আজ আমরা নাচব সবাই তা ধিন, তা ধিন, তা ধিন।

গীতাঞ্জলি ট্রেনটারও একটু একটু নাচতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু এতবড়ো দেহটা নিয়ে সে নাচলে অন্যরা কী ভাববে! তাই সে লজ্জা পাচ্ছিল। একটু বাদে সে আর থাকতে পারল না। সেও নেচে নেচে গাইতে লাগল, তা ধিন, তা ধিন, তা ধিন!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিশুর কান্ড

খুব ছেলেবেলায় আমরা একবার নরসিংহপুর বলে একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা খুব দূরে নয়, কলকাতা থেকে গাড়ি করেই যাওয়া যায়, কিন্তু ভীষণ গ্রাম গ্রাম মতন। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হয় দু-মাইল, সেই রাস্তাটা এত সরু যে সেখান দিয়ে গোরুর গাড়িও চলে না। রাস্তার দু-পাশে কত রকম গাছপালা, খুব সবুজ, আর সেখানে কী সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। এরকম গন্ধ আমরা কলকাতায় পাই না। মাঝে মাঝে বাঁশ- ঝোপ আর তাতে কঁ-ড়-ড়-ড় কঁ-ড়-ড়-ড় শব্দ।

সেই জঙ্গল পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে আমাদের বড়ো মামার বাড়ি। বড়ো মামা আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। বড়ো মামার দোতলা বাড়ির পাশেই তিনটে বড়ো বড়ো ধানের গোলা, আর একটু দূরেই মস্ত বড়ো একটা পুকুর। সেই পুকুরের ওপাশে জঙ্গল। সন্ধেবেলা সেখানে শেয়াল ডাকে।

দু-দিন পরেই রাত্তিরবেলা সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা বিকট শব্দ শোনা গেল। তখন আমরা খেতে বসেছি। ওখানে তো ইলেকট্রিকের আলো নেই, হ্যারিকেন, তাতে একটুখানি জায়গা মোটে আলো হয়, দরজার বাইরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। খেতে বসে আমরা সবাই গল্প করছি, এমন সময় সেই বিকট শব্দটা উঠল। শব্দটা এমনই বিচ্ছিরি আর এত জোরে যে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। বাবা ঠিক সেই সময় মাছের মুড়ো চিবুচ্ছিলেন। চমকে ওঠার জন্য তাঁর গলায় কাঁটা ফুটে গেল।

মা বলল ওমা ওটা কী ডেকে উঠল?

বড়ো মামা ভুরু কুঁচকে বসে আছেন। বাবা কথা বলতে পারছেন না, শুধু মুখ দিয়ে আঁ আঁ করে শব্দ করলেন। বাবার গলায় যে কাঁটা ফুটে গেছে, সেটা অন্য কেউ লক্ষই করল না, কেননা, পুকুরের ধার থেকে আবার সেই রকম শব্দ উঠল।

মা ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ওমা, বাঘ ডাকছে নাকি?

বড়ো মামা বললেন, বাঘ? বাঘ এখানে কোথা থেকে আসবে! নিশ্চয় বিশুর কান্ড। বিশু! এই বিশু!

বিশু বড়ো মামার বড়ো ছেলে। আমার চেয়ে তিন-চার বছরের বড়ো। তখন ক্লাস সেভেন পড়ে। ভীষণ দুরন্ত। সন্ধেবেলা পুকুরে সাঁতার কেটে তার একটু জ্বর মতন হয়েছে বলে সে দুধ-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

https://boierhut.com/fb

বড়ো মামিমা বললেন, দেখেছ, এই জ্বর-গা নিয়ে ছেলেটা আবার রাত্তিরবেলা বেরিয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম শব্দ বার করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

বাবা আবার বললেন, আঁ আঁ!

কিন্তু আমরা বাবার কথার মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বড়ো মামা বিশুকে ডাকতে ঘরের বাইরে গেলেন, অমনি বারান্দা থেকে বিশু সাড়া দিল। পুকুরধার থেকে এত তাড়াতাড়ি তো সে চলে আসতে পারবে না!

ততক্ষণে বাবার গলা থেকে কাঁটা বেরিয়ে গেছে। বাবা বললেন, আমি তখন থেকে বলছি, ওটা বাঘ।

মা বলল, কই, তুমি আগে কিছু বলোনি তো!

অমনি আবার সেই শব্দটা শোনা গেল।

মা আর বড়ো মামিমা ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন, আমার বুক একবারে কেঁপে উঠল। কার যেন পায়ের ধাক্কা লেগে উলটে গেল হ্যারিকেনটা। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল দরজা বন্ধ করে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও।

বড়ো মামা খুব সাহসী। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন বারান্দায়। গম্ভীরভাবে বললেন, বিশু, আমার টর্চটা নিয়ে আয় তো!

বড়ো মামা টর্চ নিয়ে পুকুরপারে দেখতে যাচ্ছিলেন, সবাই মিলে জোর করে তাঁকে ধরে রাখা হল। চিড়িয়াখানায় যেমন বাঘের ডাক শুনেছি, ঠিক সেই রকম হুম-আঁ হুম-আঁ আওয়াজ হল আরও কয়েকবার, তারপর সেটা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

পরদিন সকালে নরসিংহপুর গ্রামে দারুণ হইচই! অনেকেই সেই বাঘের ডাক শুনেছে। কিন্তু কেউ ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এদিকে তো কোনোদিন বাঘ আসেনি। এখান থেকে সুন্দরবন অনেক দূরে। মাঝখানে একটা বড়ো নদী আছে। সেই নদী পেরিয়ে বাঘ আসবে কী করে? কেউ কেউ বললেন, হয়তো কোনো সার্কাস পার্টির বাঘ পালিয়ে এসেছে।

মা ভয় পেয়ে সেই দিনই নরসিংহপুর থেকে চলে আসতে চাইছিলেন। বাবা ধমক দিয়ে বললেন, ছি: তোমার এত ভয়? তোমার ভাই থাকেন এখানে, আর তুমি পালিয়ে যেতে চাইছ?

আমি রাত্তিরবেলা বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু দিনের বেলা বেশ মজা লাগছিল। সত্যিকারের একটা বনের বাঘ আমাদের মামার বাড়ির এত কাছে এসেছিল, এটা একটা দারুণ ব্যাপার না?

সেদিন রাতে আর বাঘটার ডাক শোনা গেল না। সবাই ভাবল বাঘটা চলে গেছে। কেউ কেউ বলল, বাঘ মোটেই আসেনি, ওটা অন্য কিছুর ডাক। হয়তো হুতুম প্যাঁচার। কিন্তু কেউ যে জঙ্গলের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মধ্যে গিয়ে দেখবে, সে সাহস নেই। সে গ্রামের কারুর বন্দুকই নেই যে! পাশের গ্রামে এক শিকারি থাকেন, তাঁকে খবর দেওয়ার কথা বলেছিল দু-একজন।

তার পরদিন খালধারে সাঁকোর কাছে একটা মরা মোষ পাওয়া গেল। তলপেটের কাছে মাংস খুবলে কে যেন খেয়ে নিয়েছে। নিশ্চয়ই বাঘের কান্ড। তাহলে বাঘটা যায়নি!

সন্ধের পর কেউ আর ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না। বিকেলবেলা বড়ো মামা পাশের গ্রামে চলে গেলেন, সেই শিকারিকে ডেকে আনতে।

কিন্তু তার আগেই বিশু একটা কান্ড করে বসল। সন্ধেবেলা আমরা ঘরের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। অপেক্ষা করছি। কখন বাঘের ডাক শুনতে পাব। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, আমাদের মধ্যে বিশু নেই। বিশু কোথায় গেল? খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! কিন্তু সারাবাড়ি খুঁজেও বিশুকে পাওয়া গেল না।

বড়ো মামিমা ভয় পেয়ে বললেন, এই রে, বিশুটা একলা একলা জঙ্গলে বাঘ দেখতে যায়নি তো?

বাড়িতে তিনজন লোক কাজ করে, তারা এই বাড়িতেই ঘুমোয়। বড়ো মামিমা বললেন, তোরা একটু খুঁজে দেখ না বিশু পুকুরধারে গেছে কিনা!

ওরা ভয়ে যেতে চায় না। বলল, খালি হাতে কি কেউ বাঘের কাছে যায়, মা ঠাকরুন?

বড়ো মামিমা কাঁদতে লাগলেন। তখন সেই তিনজন লোক আর আমার বাবা একটা মশাল জ্বেলে আস্তে আস্তে এগোলেন পুকুরের দিকে আর চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, বিশু, বিশু!

একটু বাদে সেই ডাকের উত্তর এল ভয়ংকর গলায় হুম-অঁ, হুম-অঁ! অমনি সবাই দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ফিরে এসে দরজায় খিল দিল। বড়ো মামিমা ভাবলেন বিশুকে বুঝি বাঘে খেয়েই ফেলেছে। তিনি কাঁদতে লাগলেন খুব জোরে জোরে। বাঘের হাঁকটা ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। আমরা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

এরপর যা হল, আর খানিকটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, খানিকটা কানে শোনা।

বিশুর তো দারুণ সাহস! সে সত্যিই একলা একলা বনের মধ্যে ঢুকেছিল বাঘ দেখবার জন্য। ওর বুদ্ধি আছে, পাছে ও বাঘটার মুখোমুখি পড়ে যায়, তাই একটা মস্তবড়ো জারুল গাছে উঠে বসেছিল। বাঘটা সেদিন সন্ধের পরই এসে বসে আছে পুকুরধারের জঙ্গলে। আর এমনই কান্ড, এক সময় বাঘটা এসে সেই জারুল গাছটাতেই গা ঘষতে লাগল। অত বড়ো বাঘের গা ঘষায় কাঁপতে লাগল গাছটা। আর নীচে সত্যিকারের বাঘ দেখে বিশুরও গা-হাত-পা কাঁপছিল। একসময় সে হাত-পা ছেড়ে ধপাস করে পড়ে গেল নীচে, একেবারে বাঘের পিঠের ওপর। বাঘ হুম-আঁ করে ডেকে উঠল। এর আগে কেউ তো বাঘের পিঠে চাপেনি, তাই বাঘ প্রথমটায় বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। টেনে ছুট দিল। আর বিশুও ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরল বাঘের গলা! বাঘ বিরক্ত হয়ে জোরে ডাকতে ডাকতে ছুটল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ক্রমশ বাঘ চলে এল পুকুরের এ-পার। আমরা তখন ভাবছি, বাঘ বুঝি আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে। হুড়মুড় করে আমরা উঠে গেলাম দোতলায়। সিঁড়িতে লোহার গেট। বাবা বললেন, বাঘ কিছুতেই সে গেট ভেঙে ওপরে উঠতে পারবে না।

দোতলা থেকে আমরা দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে গেল বাঘ, আর তার পিঠের ওপর গলা জড়িয়ে শুয়ে আছে বিশু। আমরা প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু সত্যিই আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বাঘের পিঠে চেপে চলে গেল বিশু। বড়ো মামা দেওয়ালে কপাল ঠুকতে লাগলেন, আমার মাও কাঁদতে লাগলেন।

...তার পিঠের উপর গলা জড়িয়ে শুয়ে আছে বিশু...

বিশু কিন্তু বাঘের পেটে যায়নি। ফিরে এসেছিল সম্পূর্ণ সুস্থভাবে। সে এক মজার ব্যাপার। বিশু বাঘের পিঠে চেপেই বুঝতে পেরেছিল, একবার সে মাটিতে পড়ে গেলেই বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। পিঠের ওপর থেকে তো বাঘ তাকে খেতে পারবে না! তাই সে খুব জোরে ধরে ছিল বাঘের গলা।

এদিকে ওই বাঘটা সত্যি একটা সার্কাস থেকে পালিয়েছিল। দুষ্টুমি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক-দিন। পিঠের ওপর একটা মানুষ বসে পড়ায় সেও ভয় পেয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতে সোজা হাজির হল কুড়ি মাইল দূরে সেই সার্কাসের তাঁবুতে। সেখানকার লোকজন ওদের দেখতে পেয়ে বিশুকে নামিয়ে নেয়। বাঘটা তখন পোষা বিড়ালের মতন ল্যাজ নাড়তে থাকে।

https://boierhut.com/fb

বিশু অবশ্য বলে, ওটা মোটেই সার্কাসের বাঘ ছিল না। ওটা ছিল খাঁটি সুন্দরবনের বাঘ। একসময় বিশুকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দীন কুটির

আমার তখন তেরো বছর বয়েস, ক্লাস নাইনে পড়ি। সেবার শীতকালে পুরো আড়াই মাস আমরা ছিলাম মধুপুরে। আমার বাবার খুব অসুখ ছিল, সবাই বলেছিল, মধুপুরের জল-হাওয়ায় শরীর ভালো হয়ে যায়।

আমরা একটা মস্ত বড়ো বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। মধুপুরে তখন অনেক বাড়িই সারা-বছর খালি পড়ে থাকত, খুব কম টাকায় অনেক বড়ো বড়ো বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত।

আমাদের সেই বাড়িটার নাম ছিল 'দীন কুটির'। দোতলা বাড়িটাতে অন্তত দশখানি ঘর, সামনে আর পেছনে বিরাট বাগান, তাতে অন্তত একশোটা আম আর পেয়ারা আর আতা গাছ। আমরা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তাম, পেয়ারাগুলির ভেতরটা টুকটুকে গোলাপি রঙের। এমন একটা চমৎকার বিশাল বাড়ির নাম 'দীন কুটির' ছিল বলে আমরা খুব মজা পেতাম।

ঘুম ভেঙে যেত খুব ভোরবেলা। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো কাচের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ত চোখে, আর কতরকম পাখির ডাক! কলকাতায় তো এত রকম পাখির ডাক শোনা যায় না।

ঘুম থেকে উঠেই আমি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ছুটে চলে আসতাম বাগানে। যদিও খুব শীত, তবু ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে খুব আরাম লাগত। এক জায়গায় ছিল দশ-বারোটা গোলাপ ফুলের গাছ। সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের ওপর টলটল করে শিশির। ফুল না ছিঁড়ে, আমি মুখটা নীচু করে এনে একটা চোখ চেপে ধরতাম সেই গোলাপ ফুলের ওপর। কী দারুণ সুন্দর যে সেই স্পর্শ! তা ছাড়া সেই ভোরের শিশির লাগালে চোখ ভালো হয়।

একদিন ভোরবেলা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমি একটা সাংঘাতিক দৃশ্য দেখতে পেলাম।

আমাদের বাড়িটার পেছন দিকের বাগানের পাঁচিল এক জায়গায় খানিকটা ভাঙা। পাঁচিলের ওপাশেই ধু-ধু করা মাঠ, দিগন্তের কাছে কয়েকটা ছোটো ছোটো পাহাড়। মাঠের মধ্যিখানে একটা সরু নদীও আছে।

আমি দেখলাম, আমাদের বাগানের মধ্যে, ভাঙা পাঁচিলের কাছেই একটা লোক পড়ে রয়েছে। লোকটার সারাগায়ে রক্ত মাখা। একটা খালি ফুল প্যান্ট আর শার্ট পরা, সেগুলিতেও চাপ চাপ রক্ত। মাটিতে শুয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে। চোখ দুটো বোজা।

দেখেই আমার বুক কাঁপতে লাগল। বইতে অনেক মারামারির গল্প পড়েছি। কিন্তু চোখের সামনে এরকম একটা মরা লোক আমি দেখিনি কখনো। ভয়ে আমি চিৎকারও করতে পারলাম না, সোজা ছুট দিলাম বাড়ির দিকে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তখন মা শুধু ঘুম থেকে উঠেছিলেন। মা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পাখিদের ছোলা খাওয়ান। আমাদের বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোলা ছিটিয়ে দিলেই কোথা থেকে একঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসে।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'মা, মা, একটা লোক মরে পড়ে আছে... আমাদের বাগানে...'

মা আঁতকে উঠে বললেন, 'সে কিরে? বলিস কী! কী সর্বনাশ!'

তক্ষুনি আমার ছোটোকাকাকে ডেকে তোলা হল। আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে মালিও ছুটে এল তার ঘর থেকে। মালি আর ছোটোকাকাকে আমি সেই জায়গাটায় নিয়ে এলাম।

কিন্তু সেখানে সেই মৃতদেহটি নেই।

ছোটোকাকা বললেন, 'কোথায় গেল? কিছু নেই তো! তুই চোখে ভুল দেখিসনি তো?'

আমি বললাম, 'না, ঠিক এই জায়গায় চিৎপাত হয়ে পড়ে ছিল। এই দেখো না, মাটিতে রক্ত লেগে আছে।'

সত্যিই মাটিতে খানিকটা রক্ত। তাহলে লোকটা গেল কোথায়? লোকটা তা হলে মরেনি?

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই দেখা গেল, একটা আতা গাছের নীচে বনতুলসীর ঝোপের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে একটা লোক। সেই খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা।

ছোটোকাকা বললেন, 'নিশ্চয়ই কোনো চোর কিংবা ডাকাত। সাবধান, কাছে যাসনি!'

ছোটোকাকা একটা বড়ো পাথর তুলে নিয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই, বেরিয়ে আয় শিগগির। নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব।'

ছোটোকাকা ব্যায়াম করেন, খুব গায়ের জোর। লোকটা কোনো সাড়াশব্দ করল না দেখে ছোটোকাকা পাথরটা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'এই মাথা ফাটিয়ে দিলাম কিন্তু, এখনও বেরিয়ে আয়।'

তখন লোকটা বলল, 'মারবেন না, আমি চোর নই। আমি বেরুচ্ছি।'

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল লোকটি।

ছোটোকাকা বললেন, 'আরে, এ তো দেখছি ভদ্দরলোক। তুমি... মানে... আপনি ওখানে কী করছিলেন?'

লোকটির রং খুব ফর্সা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মাথার বাঁদিকে চুলে চাপ বেঁধে আছে রক্ত।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...আমাদের বাগানের মধ্যে,ভাঙা পাঁচিলের কাছেই একটা লোক পড়ে রয়েছে...

লোকটি উঠে দাঁড়াল না, বসে-বসেই খানিকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি কাল রাত্তিরে মাঠের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম...তারপর কয়েকটা কুকুর আমাকে তাড়া করে... খুব জোর কামড়ে দিয়েছে... এই বাগানে আশ্রয় নিতে এসে... পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম...'

ছোটোকাকা বললেন, 'কুকুর? মাঠের মধ্যে কুকুর? খুব জোরে কামড়ে দিয়েছে? শেয়াল নয় তো? মালি, এখানে শেয়াল নেই?'

মালি বলল, 'হাঁ বহুত আছে।'

লোকটি বলল, 'আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি একটু বাদেই চলে যাব। একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।'

ছোটোকাকা বললেন, 'কেন, চলে যাবেন কেন? এই অবস্থায় যাবেন কী করে? চলুন, বাড়ির মধ্যে চলুন, ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি।'

লোকটি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ছোটোকাকা ধরে ফেললেন। তারপর মালি আর ছোটো কাকা দুজন মিলে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে এনে লোকটিকে শুইয়ে দিলেন আমাদের বাইরের ঘরে।

মা চোখের ইশারায় আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে রে? আমাদের বাগানে কী করে এল?'

আমি বললাম, 'তা জানি না! শেয়ালে কামড়েছে।'

মা বললেন, 'কী সাংঘাতিক কথা। কাদের ছেলে? রাত্তিরে মাঠে ঘুরছিল কেন?'

https://boierhut.com/fb

ছোটে কাকা লোকটিকে বললেন, 'দেখি আপনার পায়ের কোন জায়গায় শেয়ালে কামড়েছে। প্যান্টটা গোটান।'

লোকটি বলল, 'হাত দেবেন না, হাত দেবেন না! ভীষণ ব্যথা, এখন থাক।'

কিন্তু ছোটোকাকা সেকথা শুনলেন না। জোর করে রক্তমাখা প্যান্টটা গুটিয়ে ফেললেন। লোকটির পায়ে শেয়াল বা কুকুর কামড়াবার কোনো দাগ দেখা গেল না কিন্তু বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে দুটো বড়ো বড়ো কাচের টুকরো গেঁথে আছে। একটা টুকরো তো একেবারে ঢুকে গেছে ভেতরে। এখন রক্ত বেরুচ্ছে সেখান থেকে।

দরজার কাছ থেকে মা বললেন, 'ঈস!'

ছোটোকাকা বললেন, 'এ কাচ না বার করলে সেপটিক হয়ে যাবে। এক্ষুনি ডাক্তার দরকার।'

লোকটি বলল, 'না না, ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। আমি নিজেই ঠিক করে নেব।'

ছোটোকাকা বললেন, 'তা কখনো হয়! এই নীলু, মাধবী কুঞ্জ বাড়িতে একজন ডাক্তারবাবু থাকেন, তাঁকে নিয়ে আয়।'

আমি তক্ষুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনার জন্য যাচ্ছিলাম, লোকটি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, 'না, ডাক্তার দরকার নেই। একটু গরম জল পেলেই হবে।'

সেকথায় আমি থেমে গেলাম।

মা বললেন, 'গরম জল দিচ্ছি। কিন্তু তুমি মাঠের মধ্যে ঘুরছিলে কেন রাত্তিরে? তুমি কোথায় থাকো?'

লোকটি বলল, 'আমি...ইয়ে... জসিডিতে থাকি।'

মা বললেন, 'জসিডি? সে তো অনেক দূর। সেখান থেকে মধুপুরে এলে কী করে? হেঁটে আসছিলে?'

লোকটি বলল, 'না, আমি এক্সপ্রেস ট্রেনে এসেছি মাঝ রাত্রে। তারপর হেঁটে আসতে-আসতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম...'

ছোটোকাকা বললেন, 'দেখি, মাথার কাছে কতটা কেটেছে?'

লোকটির কপালে হাত দিয়েই ছোটোকাকা বললেন, 'ঈশ, আপনার যে সাংঘাতিক জ্বর এসেছে দেখছি! সেপটিক হয়ে গেলে এরকম জ্বর আসে...'

লোকটি বলল, 'না, আমার সেপটিক হয়নি। আপনারা ভাববেন না...'

'আপনার নাম কী?'

'বিজন গুপ্ত।'

অতবড় বাড়িটার সব ক-টা ঘর আমাদের কাজে লাগত না। আমরা থাকতাম দোতলায়, একতলার ঘরগুলি খালিই পড়ে থাকে। সেই রকম একটা ঘরে বিছানা পেতে দেওয়া হল। একটা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছুরি আগুনে গরম করে তারপর নিজেই সেটা পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে বিজন গুপ্ত কাচ দুটো বার করলেন। তাঁর ভীষণ ব্যথা লাগছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি একটুও চিৎকার করলেন না। গরম জলে রক্ত-টক্ত ধুয়ে পায়ে আর মাথায় দুটো ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন ছোটোকাকা। বিজন গুপ্তর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে, খুব জ্বর এসেছে বোঝা যায়।

আমাদের সকালের জলখাবার হয়েছিল লুচি আর হালুয়া। মা সেই এক প্লেট লুচি-হালুয়া আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'যা, ওই ছেলেটিকে দিয়ে আয়।'

আমি ওঁর ঘরে এসে দেখলাম, উনি ঘুমোচ্ছেন। দু-বার ডাকলাম, কোনো সাড়া নেই। তারপর গায়ে একটু ধাক্কা দিতেই উনি চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'কে? কে?'

আমি বললাম, 'আপনার খাবার।'

উনি বিরক্তভাবে বললেন, 'খাব না।' তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাবা দোতলা থেকে নীচে নামেন না। তবু একসময় তাঁর কানেও কথাটা পৌঁছে গেল। বাবার ঘরে তখন একটা মিটিং বসে গেল। মা, ছোটো কাকা, দিদি, ছোটোকাকিমা—সবাই উপস্থিত।

বাবা বললেন, 'জানা নেই শোনা নেই, একটা অচেনা লোককে তোমরা হুট করে বাড়িতে থাকতে দিলে?'

মা বললেন, 'অসুস্থ হয়ে এসে পড়েছে, তাকে কী তাড়িয়ে দেওয়া যায়?'

'যদি চোর-ডাকাত হয়?'

'না, না, ভদ্রলোকের ছেলে।'

'কী করে বুঝলে ভদ্রলোক?'

'তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

'ছাই বোঝা যায়। কত চোর-ডাকাত আজকাল ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়ায়! তা ছাড়া ভদ্দরলোকের ছেলেরা বুঝি চুরি-ডাকাতি করে না? প্রায়ই তো দেখি কাগজে—'

'তা বলে একটা লোক অসুস্থ হয়ে এসে পড়লে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়?'

'আমাদের বাগানে এল কী করে?'

'কুকুর না শেয়ালে যেন তাড়া করেছিল।'

'কিন্তু যাচ্ছিলটা কোথায়? কোন বাড়ির ছেলে, মধুপুরে চেনা কেউ আছে কিনা, সে খোঁজ নিয়েছ?'

এবার ছোটোকাকা বললেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করো না মেজদা। সে-সব খবর আমি বার করে নেব। কোনো বাজে মতলব থাকলে আমি ঠিক ঠাণ্ডা করে দেব ওকে।'

কিন্তু ছোটোকাকাও খুব বেশি খবর আদায় করতে পারলেন না। বিকেলবেলা বিজন গুপ্তর ঘুম ভেঙেছিল। ছোটোকাকা তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে নানারকম গল্প করতে লাগলেন। সেই সময় আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিজন গুপ্ত মধুপুরে কারুকে চেনেন না। তবে 'শিব নিবাস' নামে একটা খালি বাড়ির চাবি ওঁর কাছে আছে, উনি সেখানে যাচ্ছিলেন। 'শিব নিবাস' বাড়িটা যে কোথায় তা ছোটোকাকাও জানেন না, আমিও জানি না। জসিডিতে ওঁর বাড়ির লোকদেরও খবর দেবার দরকার নেই, তাঁরা কালই ফিরে গেছেন কলকাতায়।

ছোটোকাকা বললেন, 'কিন্তু আপনার এখনও জ্বর আছে। পা-টা বেশ ফুলে গেছে। ডাক্তার দেখানো উচিত। ডাক্তার ডেকে আনব?'

উনি বললেন, 'না না, কোনো দরকার নেই। আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। পা-টা একটু ঠিক হলেই আমি চলে যাব।'

বেরিয়ে এসে ছোটোকাকা মা-কে ফিসফিস করে বললেন, 'চোর-ডাকাত হোক আর যাই হোক, ওর এখন এক পা-ও নড়বার ক্ষমতা নেই। তাহলে আর ভয়ের কী আছে? একটু সেরে উঠুক, তারপর ওকে আমি আরও জেরা করব!'

আমার বুকের মধ্যে দারুণ কৌতূহল জমে রইল। কোথা থেকে এল এই রহস্যময় লোকটি? আমিই একে আবিষ্কার করেছি। সত্যিই চোর কিংবা ডাকাত? আমি কোনো জলজ্যান্ত চোর বা ডাকাত আগে দেখিনি। কথা শুনে তো একদম কিছু বোঝা যায় না। ওঁকে যদি শেয়াল বা কুকুরে কামড়ে দেয়, তবে তার দাগ নেই কেন? কেন উনি ডাক্তার দেখাতে চান না? কেন বাড়ির লোককে খবর দিতে চান না? পা খোঁড়া হয়ে, জ্বর গায়ে কেউ অন্য লোকের বাড়িতে শুয়ে থাকে? কিন্তু আমারও খুব ইচ্ছে হল, একদিন আমি একদম অচেনা কারুর বাড়িতে খুব অসুখ নিয়ে আশ্রয় চাইব। আমাকে তারা চোর কিংবা ডাকাত ভেবে যদি সন্দেহ করে, তাহলে খুব মজা হবে।

আমাদের উল্টো দিকের বাড়ি 'অনন্তধামে' রোজ সকাল বিকেলে খুব কীর্তন হয়। বিখ্যাত কীর্তন-গায়ক গোবর্ধন ভট্টাচার্য তাঁর দলবল নিয়ে ওই বাড়িতে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বাবার চেনা আছে বলে তিনি রোজ একবার করে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

সেদিন সন্ধেবেলা গোবর্ধন কাকা খড়ম ঠকঠকিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। গোবর্ধন কাকার গায়ে নামাবলি, মাথায় মস্তবড়ো টিকি। তাঁর ডান বাহুতে প্রায় একটা পানের ডিবের সাইজের রুপোর তাগা।

গোবর্ধন কাকা বাবার কাছে সব ঘটনা শুনে একেবারে আঁতকে উঠলেন। চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'করেছেন কী? আজকাল কেউ অচেনা-অজানা লোককে বাড়িতে ঢোকায়? জানাশুনো লোকেরাই কত রকম সর্বনাশ করে যায়। পায়ে চোট লেগেছে তো হাসপাতালে যাক।'

বাবা বললেন, 'মধুপুরে হাসপাতাল আছে?'

গোবর্ধন কাকা বললেন, 'তাহলে অন্তত থানায় খবর দেওয়া উচিত। জসিডিতে হাসপাতাল আছে, ট্রেনে চাপিয়ে দিলেই সেখানে চলে যেতে পারবে। আজকের কাগজ দেখেছেন?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কলকাতার খবরের কাগজ একদিন দেরি করে আসে বলে গোবর্ধন কাকা হিন্দি কাগজ পড়েন। হাতের সেই কাগজটার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে বললেন, 'এই দেখুন।'

বাবা প্রাণপণে হিন্দি বুঝবার চেষ্টা করলেন। তখন গোবর্ধন কাকা নিজেই বলে দিলেন, 'এই দেখুন; পরশু দেওঘরে এক বিরাট ডাকাতি হয়ে গেছে। সাত-আটজন লোক এক মাড়োয়ারির বাড়িতে জোর করে ঢুকে সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। এ ছেলে যে সেই ডাকাত দলের কেউ নয়, কী করে জানলেন!'

মা বললেন, 'এ তো পরশুর কথা। ছেলেটি তো কাল রাত্রে ট্রেনে চড়ে এখানে এসেছে।'

গোবর্ধন কাকা বললেন, 'সত্যি বলেছে না মিথ্যে বলছে তা কী করে বুঝলেন? কোথাও বোধ হয় ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল একটা দিন। নিশ্চয়ই ডাকাতি করার সময় পাঁচিল টপকাতে গিয়ে পায়ে কাচ ফুটেছে।'

মা বললেন, 'না না, কাচ ফুটেছে আজ। পরশু কাচ ফুটলে কী তার থেকে আজও রক্ত বেরোয়?'

গোবর্ধন কাকা বললেন, 'সে আপনারা বুঝে দেখুন!'

বাবা সব দোষ মায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন না, উনি লোকটার মুখ দেখেই বুঝে গেছেন যে, সে ভদ্দরলোক, সে কোনো দোষ করতে পারে না।'

মা বললেন, 'সে-যাই হোক, কেউ অসুস্থ হয়ে এলে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। ছেলেটা মাটিতে পা ফেলতেই পারছে না, যাবে কী করে?'

নীচে নেমে এসে গোবর্ধন কাকা চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কোথায়?'

আমরা ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। গোবর্ধন কাকা জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই ঠোঁট উলটে মুখটা এমন বিকৃত করলেন যেন তিনি একটা খুব বিচ্ছিরি খারাপ জিনিস দেখেছেন। তারপর বললেন, 'কোনো বিশ্বাস নেই।'

গোবর্ধন কাকাই পুলিশে খবর দিয়েছিলেন কিনা জানি না।

পরদিন ভোরবেলা তখন আমি ছাড়া আর কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। আমি বাগানে গিয়ে একটা পেয়ারা গাছে উঠব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের গেটের সামনে একটা পুলিশের গাড়ি থামল। গেট খুলে দেবার জন্য কারুকে ডাকলও না, দুজন পুলিশ টপ করে গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলতে এল।

আমি তক্ষুনি বুঝলাম, পুলিশ বিজন গুপ্তকেই ধরতে আসছে। আমাদের বাড়িতে আগে কোনোদিন পুলিশ আসেনি। তক্ষুনি তাঁকে সাবধান করে দেবার জন্য আমি বাড়ির মধ্যে দৌড়ে গেলাম।

কিন্তু বিজন গুপ্ত তাঁর ঘরে নেই। এত ভোরেই তিনি উঠে পড়েছেন! বাথরুমের দরজাও তো খোলা। তাহলে কোথায় গেলেন? আমি গোটা একতলাটা খুঁজে দেখলাম। কোথাও পেলাম না। দোতলায় সব ঘরের দরজা বন্ধ। তখন আমি উঠে এলাম ছাদে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছাদে পাঁচিলের এক কোণে বসে আছেন বিজন গুপ্ত! এই শীতের মধ্যেও কপালে ঘাম। হাঁপাচ্ছেন। একটা পা সাংঘাতিক ফুলে গেছে। নিশ্চয়ই খুব ব্যথা। তবু এই পা নিয়ে তিনি কী করে ছাদ পর্যন্ত উঠে এলেন, সেটাই আশ্চর্য!

উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'পুলিশ এসেছে।'

উনি বললেন, 'জানি!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পুলিশ আপনাকে ধরতে এসেছে কেন? আপনি কী করেছেন?'

উনি দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ ব্যথা সহ্য করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটুখানি দম নেবার পর বললেন, 'শোনো খোকা, আমি চোর কিংবা ডাকাত নই। আমি একজন বিপ্লবী। এই কথাটার মানে তুমি বড়ো হয়ে বুঝবে।'

আমার গা ঝিমঝিম করে উঠল। বিপ্লবী কথাটার মানে তো আমি তখনই জানি। বিপ্লবী মানে যাঁরা দেশের জন্য কাজ করেন। দেশের মানুষের ভালো করবার জন্য যাঁরা অনেক কিছু বদলে দিতে চান। ইনি সেই রকম একজন লোক! ইনি ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছেন!

তিনি ছাদের পাঁচিলের ওপর ওঠবার চেষ্টা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী করছেন?'

'আমি পালিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আপনি পড়ে যাবেন যে। আপনার পায়ে ব্যথা!'

'আমি পড়ে যাই কিংবা মরে যাই, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু বিপ্লবীরা কক্ষনো ইচ্ছে করে ধরা দেয় না।'

তারপর জলের পাইপ বেয়ে উনি সরসর করে নেমে গেলেন নীচে। আমি মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলাম, বাগানের মধ্য দিয়ে উনি এক পায়ে লাফিয়ে দৌড়োচ্ছেন। ভাঙা পাঁচিলটার কাছে পৌঁছোবার আগেই দু-জন পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করল। উনি এক লাফ দিয়ে পাঁচিলটা পার হয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

তারপর কী হল, আমি আর দেখতে পাইনি। পুলিশ ওঁকে ধরতে পেরেছিল কিনা আমি জানি না। আমার বাড়ির সব লোকের ধারণা, পুলিশ ওঁকে ঠিকই ধরে ফেলেছিল। কিন্তু আমি সেকথা বিশ্বাস করিনি।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। বিজন গুপ্তর আর কোনো খবর পাইনি। উনি কোথায় হারিয়ে গেছেন, কে জানে। আমার ছোটোকাকা এখান লোকজনের কাছে গল্প করেন, ওরে বাবা, সেবার মধুপুরে... একটা সাংঘাতিক ডাকাত... লুকিয়েছিল আমাদের বাড়িতে...।

কিন্তু আমি জানি উনি ডাকাত নন। ওরকম বেপরোয়া সাহসী লোক আমি আর কখনো দেখিনি। এখন তাঁর মুখটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। আর কানে ভেসে আসে ওঁর সেই শেষ

https://boierhut.com/fb

কথাটা—'আমি পড়ে যাই কিংবা মরে যাই, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু বিপ্লবীরা কক্ষনো ইচ্ছে করে ধরা দেয় না!' সেই সময় তাঁর গলার আওয়াজটা কী শান্ত আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কেন জানি না, এখন সেকথা মনে পড়লে আমার কান্না পেয়ে যায়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রথমে দুম করে একটা শব্দ হল। তারপর ঝনঝন, ঝনঝন, কাচ ভাঙার। আওয়াজটা হল বসবাস ঘরে।

আজকাল চতুর্দিকেই যখন তখন গোলমাল লাগে। এরকম আওয়াজ শুনলেই ভয় করে। কেউ কি বাড়ির দিকে বোমা-টোমা ছুড়ল নাকি?

নিপুর ঘরে, তার বিছানায় পাশে বসে বাবা একটা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন। নিপুর খুব অসুখ, সে বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। বইও পড়তে পারে না। নিপু কিন্তু পড়াশুনোয় ভালো, ক্লাস এইটের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। এই অসুখের জন্য সে এমনই দুর্বল হয়ে গেছে যে, শুয়ে শুয়ে পড়ার জন্য বই ধরে রাখতেও পারে না। হাত খুব কাঁপে।

মা এই সময় নিপুকে ওষুধ খাওয়াবার জন্য ঘরে ঢুকেছেন। ওই আওয়াজ শুনে ভয়ের চোটে বলে উঠলেন, ও মাগো! কী হল?

বইটা রেখে বাবা ছুটে এলেন বসবার ঘরে।

সারাঘরে কাচ ছড়ানো, রাস্তার দিকের একটা জানলার কাচ ভাঙা।

বোমা-টোমা কিছু নয় অবশ্য। তবে কি কেউ ইট মেরেছে? এদিক-ওদিক তাকিয়েও কোনো ইট বা পাথর-টাথর দেখা গেল না। তা হলে কে ভাঙল? বাইরেও দেখা গেল না কারুকে।

তাহলে কি ভূতুড়ে ব্যাপার?

আবার পুরো ঘরটায় চোখ বোলাতেই দেখা গেল, এক কোণে প্রায় লুকিয়ে আছে একটা ক্রিকেট বল।

এবার সব ব্যাপারটা বোঝা গেল।

পাশের মাঠে কিছু ছেলে বিকেলবেলা ক্রিকেট খেলে। তাদেরই কেউ ওভার বাউণ্ডারি মেরেছে, সেই বল উড়ে এসে ভেঙে দিয়েছে জানলার কাচ।

সেই ছেলেদের কারুকেই দেখা গেল না। ভয়ে পালিয়ে গেছে, না ঘাপটি মেরে কোথাও লুকিয়ে আছে?

কোনোরকমে পায়ে চটি গলিয়ে বাবা বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। শুধু গেঞ্জি পরা। মাঠটার এক পাশে রয়েছে মালির ঘর, সেখানে ছেলেরা লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখতে গেলেন বাবা।

না, সেখানে কেউ নেই। খেলার সরঞ্জামও কিছু পড়ে নেই। সব কিছু নিয়ে ওরা এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এরকমভাবে জানলা ভাঙলে কার না রাগ হয়? বাবা মনে মনে ঠিক করলেন, কাল-পরশু আবার ছেলেরা খেলতে আসবে নিশ্চয়ই। তখন তাদের ধরবেন। কিন্তু শাস্তি না দেওয়া গেলেও বকুনি তো অন্তত দেওয়া যাবে!

বলটা হাতে নিয়ে বাবা ফিরে এলেন বাড়ির মধ্যে।

নিপু জিগ্যেস করল, বাবা, তুমি ওই বলটা কোথায় পেলে? ওটা আমার সেই বলটা?

বাবা বললেন, না রে। পাশের মাঠে ছেলেরা খেলছিল, জানলা দিয়ে এই বলটা আমাদের বাড়িতে ঢুকে এসেছে।

নিপু বলল, তুমি ওদের বলটা ফেরত দিলে না? ওদের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে?

বাবা বললেন, আমি মাঠে দেখতে গেলাম। এর মধ্যেই সবাই চলে গেছে। কাল যদি আসে—

নিপু বলল, বলটা আমাকে একবার দাও তো—

বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন, নিপু সেটা ধরতে গিয়েও ধরতে পারল না। হাত থেকে পড়ে গড়িয়ে গেল খাটের নীচে।

নিপু হতাশভাবে বলল, যা:!

বাবা নীচু হয়ে দেখতে গেলেন, কিন্তু বলটা তাঁর চোখে পড়ল না। খাটের নীচে কয়েকটা বাক্স-টাক্স রাখা আছে, তার পেছনে দিকে চলে যেতে পারে। সেদিকটায় খানিকটা অন্ধকার অন্ধকার।

বাবার হাঁটুতে ব্যথা, খাটের তলায় তিনি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে পারবেন না।

তিনি বললেন, বিক্রম আসুক, সে বলটা বার করে দেবে।

নিপুর চোখে জল এসে গেছে। সে একটা বলও ধরে রাখতে পারে না। এত দুর্বল হয়ে গেছে!

সে বলল, বাবা, আমি কি আর সেরে উঠব না?

বাবা বললেন, ওমা, সে কি বলছিসরে? তোর ডাক্তারকাকু বললেন যে, নতুন ওষুধটা এলেই তুই সাতদিনের মধ্যে বিছানা ছেড়ে দৌড়াদৌড়ি করতে পারবি।

অসুখ হওয়ার আগে নিপুও ক্রিকেট খেলত তার কাকা বিক্রমের সঙ্গে। অনেকদিন খেলা হয় না। তার বলটাও হারিয়ে গেছে। এটা কিন্তু সে বলটা নয়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

...হাত থেকে পড়ে গড়িয়ে গেল খাটের নীচে।

বিক্রম ফিরল অনেক রাত করে। তখন আর খাটের তলা থেকে বলটা বার করার কথা তাকে বলা হল না। হাত-টাত ধুয়ে সে খেতে বসে গেল।

নিপু ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন সকালেই এলেন ডাক্তারকাকা। নিপুকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, চিন্তার কিছু নেই। এটা নার্ভের অসুখ, এর নতুন ওষুধ বেরিয়ে গেছে, আমাদের দেশে এখনও আসেনি। তবে বিলেত থেকে আনাবার ব্যবস্থা হয়েছে। লণ্ডনের একটা কোম্পানি সাতদিনের মধ্যে আমাকে সেই ওষুধ পৌঁছে দেবে বলে জানিয়েছে। তবে, নিপু, তুমি এর মধ্যে বিছানা ছেড়ে একা একা নামবার চেষ্টা করবে না। বেশি করে ঘুমাবে।

নিপু বলল, আমার দিনের বেলা ঘুম আসে না। বইও পড়তে পারি না, তাহলে কী করব?

ডাক্তারকাকু বললেন, আর কিছুদিন পরেই তুমি নিজে হাতে ধরে বই পড়তে পারবে। এখন বাবা আর মা তোমাকে গল্প শোনাবে, অনেক ভালো ভালো গল্প!

কাল ছুটি ছিল, আজ বাবার অফিস আছে। কাকাও বেরিয়ে গেল আগে আগে। বাড়িতে শুধু মা। বাড়িতে মায়ের অনেক কাজ থাকে, তবু মা নিপুর বিছানার পাশে বসে গল্প শোনান ছেলেকে। মহাভারতের গল্প। নিপু যদিও আগে 'ছোটোদের মহাভারত' বইখানা পড়েছে, কিন্তু মহাভারতের গল্প তো পুরোনো হয় না।

https://boierhut.com/fb

রান্নার একজন মাসি আছে, তার নাম করুণা। ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য আর একজন ছিল, সে অনেকদিন আসে না। মা-ই কাজটা চালিয়ে দেন।

বাবার ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। খেলার মাঠে এখন কেউ নেই, আজ ছেলেরা খেলতে এসেছিল কিনা বোঝা গেল না। কেউ বল চাইতেও আসেনি।

জানলার ভাঙা কাচ সারানো হয়নি এখনও। মিস্তিরি খুঁজে পাওয়া তো সহজ নয়।

একটু বাদে আকাশে বাজ ডেকে বৃষ্টি নামল। খুব জোর বৃষ্টি। অন্য সব জানলা বন্ধ করা গেলেও ভাঙা জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল বৃষ্টির ছাঁট। আগেকার দিনের মতন কাঠের পাল্লা তো নেই। বাইরে গ্রিল, ভেতরে কাচ।

বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে গেল ঘর। এখন আবার মুছতে হবে, কাজ বেড়ে গেল। আবার ছেলেগুলো ওপর রাগটা ফিরে এল বাবার। একটু সাবধান হয়ে খেলতে পারে না? অন্তত একবার ওদের এসে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ বাবা দেখতে পেলেন, ঘরের এক কোণে রয়েছে সেই বলটা। ঠিক কাল যে জায়গায় ছিল।

এখানে বলটা এল কী করে? নিপুর ঘরের খাটের তলা থেকে কে বার করল?

মাকে জিগ্যেস করলেন।

মা বললেন, কই, আমি তো খাটের নীচে ঢুকিনি!

তবে কি রান্নার মাসি?

না, রান্নার মাসি ঘর ঝাঁট দেয় না কোনোদিন।

তাহলে কি বিক্রম বার করেছে? বিক্রমকে তো বলটার কথা বলাই হয়নি।

এটা কি আর একটা বল?

বাবা বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। মনে তো হচ্ছে, সেই কালকের বলটাই! তবে অন্য বলও হতে পারে, সব তো একই রকম দেখতে।

বিক্রম ফিরতেই তাকে জানলার ভাঙা কাচ দেখিয়ে বলা হল সব ঘটনাটা।

বিক্রম খেলাধুলো করেছে একসময়, খুব মজবুত শরীর। সে সড়াৎ করে ঢুকে গেল নিপুর খাটের নীচে। বাক্স-টাক্স সব সরিয়ে সে দেখল ভালো করে।

বেরিয়ে এসে বললেন, না, খাটের তলায় কোনো বল নেই।

তাহলে এটাই কি সেই বলটা?

খাটের তলা থেকে নিজে নিজে বেরিয়ে চলে গেল বসবার ঘরে? তা তো আর হতে পারে না। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

মা বললেন, বলটার বোধ হয় খাটের নীচে অন্ধকারে থাকতে ইচ্ছে করছিল না, তাই নিজে নিজেই বেরিয়ে এসে গড়িয়ে চলে গেছে ওই ঘরে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাবা হেসে বললেন, বলে কি প্রাণ আছে? তারা কি নিজে নিজে কিছু করতে পারে?

মা বললেন, প্রাণ না-থাকলেও তবু পারে। আমার তেলের শিশির ঢাকনাটা, কিছুতেই শিশির মাথায় থাকতে চায় না, মাঝে মাঝেই টুকুস টুকুস করে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যায়।

বাবা বললেন, সে তো জামায় বোতাম লাগাতে গেলে একটা-না-একটা মাটিতে পড়বেই। এসব তো হয়ই। যাক গে, বলটা তুলে রেখে দাও। ওই ছেলেদের দেখতে পেলে ফেরত দিয়ে দেবে। জানলাটাও সারিয়ে ফেলতে হবে।

নিপুর খাটের পাশেই দেয়ালের মধ্যে দুটো তাক। একটায় থাকে নানান ওষুধপত্তরের শিশি আর অন্যটায় কিছু বই। সেই বইগুলির ফাঁকেই রাখা হল বলটাকে।

লণ্ডন থেকে সেই বিশেষ ওষুধ পরের দিনও পৌঁছোল না। ডাক্তারকাকা লণ্ডনে ফোন করলেন, সেই কোম্পানি থেকে জানানো হল, তারা পাঠিয়ে দিয়েছে। কোনো কারণে দেরি হচ্ছে তবে দু-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে।

নিপুর অবস্থা একই রকম। নিজে নিজে বাথরুম যেতে পারে না। নিজে চামচ ধরে কিছু খেতেও পারে না। তাকে খাইয়ে দিতে হয়। বাবা অফিস চলে গেলে মা কিছুক্ষণ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে গল্প পড়ে শোনান। গল্প শুনতে শুনতে নিপু একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে আছে নিপু, মা ছাদে গেছেন কাপড় মেলতে। সারাবাড়িতে যেন কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ একসময় মেঘ ডেকে উঠল।

তাতেই ঘুম ভেঙে গেল নিপুর। চোখ মেলে দেখল জানলা দিয়ে যতটা আকাশ দেখা যায়। সেখানে বিদ্যুৎঝলক। বৃষ্টি শুরু হয়নি, কিন্তু বেশ ফিনফিনে হাওয়া বইছে।

দুটি পাখি জানালার কাছে একটুক্ষণ ঝটপট করেই আবার উড়ে গেল।

ওপরের তাক থেকে বলটা নিজে নিজেই পড়ে গেল মাটিতে। কয়েকবার ড্রপ খেয়ে. গড়াতে লাগল সেটা।

নিপু তাকিয়ে দেখতে লাগল, বলটা কত দূর যায়।

বেশি দূর নয়। নিপুর খাটের পাশে এসেই থেমে গেল।

নিপু অমনি খাট থেকে নেমে কুড়িয়ে নিল বলটা। তারপর আবার ফিরে এল বিছানায়। বলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একবার সে বলটা ওপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে লুফে নিল ঠিকঠাক।

ঠিক তক্ষুনি ঘরে ঢুকলেন মা।

প্রথমে তিনি বললেন, জেগে উঠেছিস? এখন হরলিক্স খাবি?

তারপরেই তিনি চোখ বড়ো বড়ো করে দারুণ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, তোর হাতে বল? ওটা তুই পেলি কী করে?

https://boierhut.com/fb

নিপু বলল, তাক থেকে বলটা গড়িয়ে পড়ে গেল। আমি খাট থেকে নেমে তুলে নিলাম।

মা বললেন, অ্যাঁ?

নিপুর অমনি মনে পড়ে গেল। সে তো নিজে নিজে খাট থেকে নামতে পারে না। তবু সে নামল কী করে? বলটা তুলে নিতেও কোনো কষ্ট হয়নি।

এটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কাঁপতে লাগল। বলটা আর ধরে রাখতে পারল না। পড়ে গেল নীচে কিন্তু খাটের তলায় ঢুকে গেল না।

মা এতই অবাক হয়ে গেলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না।

নিপুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। সে ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরেই।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বটে, বৃষ্টি কিন্তু হল না। একটু বাদেই বাজের শব্দটব্দও থেমে গেল।

বিকেলের একটু আগেই বাড়ি ফিরে এল বিক্রম।

মা তাকে ফিসফিস করে দুপুরের ব্যাপারটা বলতেই সে একটুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল, নিপু নিজে নিজে খাট থেকে নেমেছিল? এই বলটা কি ম্যাজিকের বল নাকি? দেখতে হচ্ছে তো!

নিপুর ঘরে এসে সে দেখল, বলটা তখনও মেঝেতে পড়ে আছে।

সে বলটা তুলে নিয়ে বলল, এমনিতে তো মনে হয় সাধারণ একটা বল। যেমন সব ক্রিকেটের বল হয়।

সে বলটা আবার রেখে দিল ওপরের তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বলটা আবার গড়িয়ে এসে পড়ে গেল মেঝেতে।

বিক্রম বলল, বেশ মজার ব্যাপার তো!

সে বলটা তুলে মাটিতে ড্রপ খাওয়াতে লাগল।

এর মধ্যে নিপু আবার চোখ মেলে তাকিয়েছে।

সে বলল, কাকু, আমার ব্যাটটা কোথায়? তুমি একটু বল করবে, আমি ব্যাটিং প্রাকটিস করব?

বিক্রম একথা শুনে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও মুখে সে ভাব দেখাল না। সে বলল, হ্যাঁ। তুই খাট থেকে নেমে পড়!

আবার নিপু খুব সহজেই খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

মা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ও কী, ও কী, না না না? পড়ে যাবে, পড়ে যাবে।

বিক্রম বলল, বউদি, দেখোই না কী হয়!

তারপর সে নিপুকে বলল, হাঁটতে পারবি তো। চল আমার সঙ্গে।

মা নিপুর হাত ধরতে গেলে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দিব্যি হেঁটে গেল বিক্রমের সঙ্গে।

বাড়ির ঠিক সামনেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। রাস্তা হিসেবে সবাই ব্যবহার করে।

https://boierhut.com/fb

বিক্রম নিপুর হাতে একটা ব্যাট ধরিয়ে দিয়ে বলল, তুই এখানে দাঁড়া, আমি দূর থেকে বল করছি।

প্রথমে ব্যাটটা ধরতে গিয়ে নিপুর হাত কাঁপতে লাগল।

বিক্রম বলল, উঁহু, ওরকমভাবে ধরলে তো হবে না। শক্ত করে ব্যাট ধরতে হবে।

নিপুর কপালে একটু একটু ঘাম ফুটেছে. তবু সে বলল, হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে।

বিক্রম বলটা লুফতে লুফতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, রেডি?

নিপু বলল, হ্যাঁ, রেডি।

প্রথম বলটা নিপু লাগাতে পারল বটে, তবে খুব আস্তে।

এখন মায়ের দু-চোখ জলে ভরতি। যে ছেলে দারুণ অসুস্থ, কোনো ওষুধ কাজে লাগছে না, নিজে দাঁড়াতেই পারে না, সে খেলছে ক্রিকেট? এত আনন্দে তো চোখে জল আসবেই।

তিনি বাবাকে অফিসে ফোন করলেন, শিগগিরই বাড়িতে চলে আসার জন্য।

নিপু প্রত্যেকটা বল ঠিকঠাক মারছে। আগে সে বিক্রমের বলে বারবার এল বি ডবলু হত, এখন একবারও না।

একবার সে এত জোরে ব্যাট হাঁকাল যে বলটা উঠে গেল অনেক ওপরে, বিক্রম দৌড়োতে লাগল ক্যাচ ধরার জন্য।

ঠিক তখনই একটা গাড়ি এসে থামল একটু দূরে? তার থেকে নেমে দাঁড়ালেন ডাক্তারকাকু। বিলিতি ওষুধটা একটু আগেই এসে পৌঁচেছে, তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন।

নিপুর অত জোরে ব্যাট চালানো দেখে তিনি হাততালি দিয়ে উঠলেন। ওই ওষুধ আর কাজে লাগবে না।

ক্যাচটা ধরতে পারল না বিক্রম। বলটা যে কোথায় গেল, তা আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

যাক, পরে ভালো করে খুঁজে দেখলেই চলবে।

https://boierhut.com/fb